প্রথম প্রকাশ
১লা জুলাই : ১৯৫৭
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ
মহালয়া : ১৯৬০

প্রচ্ছদপট
শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
সি ২৯-:১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০ ০০৭

বিক্রয়কেন্দ্র
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

আন্দামান ও নিকোবর

॥ এক ॥

বাদল এসে হুড়মুড় করে ডাক্তার মৈত্রর চেম্বারে ঢুকল। বলল: সব ব্যবস্থা হয়ে গেল ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার মৈত্র রোগী দেখছিলেন। কথার উত্তর তখনই দিলেন না। পরীক্ষা শেষ করে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লেখবার আগে জিজ্ঞাসা করলেন: কী রকম?

বাদল জানে যে খানিকক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হবে। তাই একখানা চেয়ারে ধপাস করে বসে এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিল। এইবারে সোৎসাহে বলল: সব জায়গা থেকেই কন্‌ফার্মেশন পাওয়া গেছে।

সব জায়গা থেকে মানে?

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি নিকোবর ও আন্দামান অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেসন পোর্ট-ব্লেয়ার আর শিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া পোর্ট-ব্লেয়ার। ভগবানের দয়ায় যাত্রী তো আমরা কম নই' সবাই বাঙ্কে ছিয়াশি টাকার যাত্রী। আপনার জন্যে অবশ্য কেবিনের ব্যবস্থা হয়েছে। পোর্টব্লেয়ারের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নর্থ ডিভিসন আন্দামান—তাঁকেও লিখেছিলাম অ্যাকমোডেসনের জন্যে। আমরা দু নম্বর ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউসের ডর্মিটরিতে জায়গা পেয়েছি। আর আপনাকে দিয়েছে ট্যুরিস্ট বাংলোয়।

প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখতে লিখতেই ডাক্তার মৈত্র বললেন: আমার জন্যে আবার আলাদা ব্যবস্থা কেন?

বাদল বলল: আমাদের সঙ্গে নানান রকমের মানুষ ডাক্তারবাবু, আপনার পোষাবে না।

কেন?

এক একজন এক এক মূর্তি। ঝামেলা ফেলে দুদিনেই আপনি পালিয়ে আসবেন।

ডাক্তার মৈত্র বললেন: এঁদের ফেলে বেশি দিন তো থাকতেও পারব না! তোমাদের উৎসাহেই যাচ্ছি।

সে কি! আন্দামান দেখার শখ তো আপনারই সবচেয়ে বেশি!

আপনার আগ্রহেই সব ব্যবস্থা হল! আর আপনার নাম না থাকলে এখন তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থাও হত না!

বাদল কতকটা একই নিঃশ্বাসে বলল: স্ট্র্যান্ড রোডের ওপর শিপিং হাউস থেকে আজ টিকিট পাওয়া যাবে। জাহাজ ছাড়বে পরশু। জাহাজ ছাড়ার সময়টাও আপনাকে জানিয়ে যাব। কিন্তু খিদিরপুরে হাজির হতে হবে তিন ঘণ্টা আগে। জাহাজে উঠতে দেবার আগে ইণ্টারন্যাশনাল হেল্‌থ্ সার্টিফিকেট চেক করবে।

তারপরেই বলল: ভালো কথা, আপনার বইটা ভরে রেখেছেন তো?

কোন্ বইটা?

হেল্‌থ্ সার্টিফিকেটের বই, গভর্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার পাব্‌লিকেসন অফিস থেকে পনর পয়সায় যেখানা কিনে এনে দিয়েছিলাম—

ডাক্তার মৈত্র বললেন: সেখানা চাই নাকি?

বলে নিজের দেরাজ টেনে খুললেন।

বাদল বলল: টিকিট দেবার আগে অনেক সময় দেখতে চায় শুনেছি।

এই বই-এর সঙ্গে ডাক্তার মৈত্র কিছু টাকাও দিলেন। বললেন: ভাড়ার টাকাটাও নিয়ে যাও।

বাদল টাকা গুণে বলল: অনেক বেশি টাকা দিলেন দেখছি!

ডাক্তার মৈত্র বললেন: বেশি হলে তো ক্ষতি নেই! যা বাঁচবে ফেরত দিও, কিংবা যদি কোন ফাণ্ড করে থাকো তো তাতে জমা করে নিও।

বাদল আর কোন আপত্তি না করে তার ছোট ব্যাগটায় টাকা ভরে উঠে যাচ্ছিল, আর ডাক্তার মৈত্র আর একজন রোগীকে কাছে ডেকেছিলেন। বাদল হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল: এই যা, ভুলেই গিয়েছিলাম কথাটা।

ডাক্তার মৈত্র বললেন: কী কথা?

পরশু একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে আপনার অসুবিধা হবে না তো?

অসুবিধা কিসের!

মানে—

বাদল একটু ইতস্তত করে বলল: বাড়ি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যেতে হবে কিনা, তাই ভাবছিলাম—

ডাক্তার মৈত্র বললেন: বাড়ি অনেক দূরে বুঝি?

বাদল বলল: না না, এই পাড়াতেই বাড়ি!

বলে নিজের ব্যাগ থেকে একখানা কার্ড বার করে তাঁর হাতে দিল।

ডাক্তার মৈত্র নামটা পড়লেন। নির্মালিয়া মিশ্র, অ্যাডভোকেট হাইকোর্ট। নিচে বাড়ির ঠিকানাও আছে।

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ উকিল-মোক্তারও সঙ্গে নিচ্ছ বুঝি ?

বাদল সহাস্যে জবাব দিয়ে গেল ঃ কি জানি, যদি কোন মামলা মোকদ্দমায় ফেঁসে যাই !

যাত্রার আগেও বাদল ডাক্তার মৈত্রকে একবার টেলিফোন করল। বলল ঃ সব ঠিক আছে তো ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার মৈত্র হেসে বললেন ঃ তোমার কোন দুশ্চিন্তা নেই।

কাকে তুলে নিতে হবে মনে আছে ?

আছে।

ঠিকানা হারিয়ে ফেলেন নি তো ?

পাগল হয়েছ ! কথা যখন দিয়েছি, তখন দায়িত্বও নিয়েছি।

বাদল বলল ঃ তা জানি বলেই তো বলেছি। তা না হলে উনি বলেছিলেন, ট্যাক্সিতেই যাবেন। নিজে গাড়ি চালান কিনা, তাই অসুবিধে। আপনার মতো সবার তো আর ড্রাইভার নেই !

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ গোড়ার দিকে আমারও ড্রাইভার ছিল না। এখন দেখছি, ড্রাইভার থাকলে সময় অনেক বাঁচে।

বিকেল সাড়ে চারটের আগে জাহাজঘাটায় পেঁছিতে হবে। তাই ডাক্তার মৈত্র হাতে একটু সময় নিয়েই বেরোলেন। আর একজনকে তুলতে হবে, তারও জিনিসপত্র আছে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতেও হতে পারে। সকলের আবার সময়ের জ্ঞান সমান নয় !

কিন্তু নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে পেঁছে দেখলেন যে এক মহিলা বাইরেই অপেক্ষা করছেন। গাড়ি সামনে থামতেই তিনি এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন।

ডাক্তার মৈত্র গাড়ি থেকে নেমে নমস্কার করে বললেন ঃ কে যাবেন ?

আমি।

আপনি !

কেন, বাদল আপনাকে বলেনি !

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ নির্মালিয়া মিশ্র আপনার নাম !

নির্মালিয়া নয়, আমার নাম নির্মাল্য মিশ্র। কিন্তু অমন আশ্চর্য হচ্ছেন কেন ?

ডাক্তার মৈত্র ঠিক এ রকমটি ভাবেননি। অথচ বাদল কোন মিথ্যা কথাও বলেনি। শুধু নামের কার্ডটি তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। নাম দেখে ডাক্তার মৈত্র ভাবতে পারেননি যে এটি কোন মহিলার নাম। তা ছাড়া অ্যাড্ভোকেট বলে এ রকমের কোন সন্দেহও হয়নি। নিজেদের পাড়াতেই কোন মহিলা অ্যাড্ভোকেট আছে বলে তাঁর জানা ছিল না। অবশ্য এ মহিলার বয়স বেশি বলে মনে হচ্ছে না। হয়তো নতুন প্র্যাক্টিস শুরু করেছেন। সেই জন্যই নামটা জানেন না। একটি মুহূর্তের মধ্যে এত কথা ডাক্তার মৈত্রর মনের ওপর দিয়ে খেলে গেল। খানিকটা সামলেও নিলেন নিজেকে। তারপরে বললেন ঃ না, মানে বাদল আমাকে আপনার সম্বন্ধে কিছুই বলেনি। কিন্তু আপনি তো বাঙলা কথা বেশ পরিষ্কার বলছেন !

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ তা বলব না কেন ! বাঙালী মেয়ে, বাঙলায় জন্মেছি, পড়াশুনো করেছি বাঙলায়—আমি কেন অন্য ভাষায় কথা বলব !

ডাক্তার মৈত্র আরও আশ্চর্য হলেন। একটা নাম নিয়ে দুবার হোঁচট খেলেন তিনি। একটু অপ্রসন্ন হয়ে আম্তা আম্তা করে বললেন ঃ তা বটে।

একটা চাকর নির্মাল্য মিশ্রর বাক্স-বিছানা গাড়ির বুটে তুলে দিয়েছিল। ড্রাইভার বুট বন্ধ করে দিয়ে এসেছে দেখে ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ উঠে পড়ুন।

তারপরে নিজে উঠে তাঁর পাশে বসলেন।

খিদিরপুরের দিকে খানিকটা এগিয়ে ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ আমার নাম বোধহয় বাদলের কাছে আপনি শুনেছেন ! আমার নাম হল হিমাংশু মৈত্র।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ হ্যাঁ, আপনার নাম আমি জানি। আপনার চেম্বারও দেখেছি। ঐ পথেই আমি হাইকোর্টে যাই তো !

তারপরেই বললেন ঃ আমাকে কী বলে ডাকবেন, তাই ভাবছেন তো ! নির্মাল্য বলতে যদি অসুবিধা মনে করেন তো মিস্ মিশ্র বলতে পারেন।

ডাক্তার মৈত্র পাশে তাকিয়ে দেখলেন যে এই মহিলা কুমারীই বটে। মাথায় সিঁদুর নেই, হাতেও নেই লোহা বা শাঁখা। শুধু এক হাতে একটি রিস্টওয়াচ, কানে বা গলায় কোন গহনা নেই। গায়ের রঙটাও দেখলেন ফর্সা নয়, কিন্তু ময়লাও বলা যায় না। স্বাস্থ্য নিটোল, মুখ সজীবতায় উজ্জ্বল। ডাক্তার মৈত্র অনেক মহিলার চিকিৎসা করেছেন। কিন্তু এই-ভাবে কোন অপরিচিত মহিলাকে পাশে নিয়ে গাড়িতে বসেননি। বেশ একটু সংকোচবোধ হচ্ছিল তাঁর, আর রাগ হচ্ছিল বাদলের উপর।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র সহজভাবেই বললেন: অমন গোমড়া মুখে বসে আছেন কেন? কদিন ছুটি পাওয়া গেল, তার জন্যে আপনার আনন্দ হচ্ছে না?

ডাক্তার মৈত্র একবার নিজের বয়সের কথা ভাবলেন। কপালের চুল বেশ খানিকটা উঠে গেছে বয়সের জন্যই। এখনও সংসার করেন নি। অপরিচিত মহিলাদের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয়, ঠিক বুঝতে পারলেন না। তবু বললেন: তা একটু হচ্ছে বৈকি!

খিদিরপুর বাইশ নম্বর ডকের কাছাকাছি এসে ডাক্তার মৈত্র তাঁর ঘড়ি দেখলেন। চারটে বেজে দশ মিনিট হয়েছে। কুড়ি মিনিট আগেই তাঁরা এসে পড়েছেন। সাড়ে ছটার মধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষ হলে জাহাজে উঠতে দেবে। মনে মনে বিরক্ত হলেন ডাক্তার মৈত্র।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যে কেউ আপনাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার মৈত্র এবারে তাঁর বিরক্তির কথা প্রকাশ করে ফেললেন, বললেন: আপনিই বলুন, এতক্ষণ এখানে আমরা কী করব!

নির্মাল্য মিশ্রও তাঁর ঘড়ি দেখে বললেন: মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করতে হবে।

মিনিট কুড়ি!

তারপরেই তো শুরু হবে হেল্‌থ্‌ এক্‌জামিনেসন। তখন সময় কেটে যাবে। আর ছাড়া পেলেই তো জাহাজে গিয়ে উঠব!

ডাক্তার মৈত্র বললেন: সাড়ে ছ'টার আগে জাহাজে উঠতে দেবে না শুনেছি।

নির্মাল্য মিশ্র অনির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত। কোর্টে চিরকালই অপেক্ষা করতে হয়। জজ সাহেবের মর্জি মাফিক ডাক পড়ে।

তার জন্যেই অপেক্ষা। অপেক্ষা না করে উপায় নেই। তাই বললেন: সব ব্যাপারেই একটু ধৈর্যের দরকার।

কিন্তু ডাক্তার মৈত্রর এই ধৈর্যের অভাব। নিজের চেম্বারে একজনের পর আর একজন রোগী এগিয়ে আসে। রোগীর জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় না। রোগীর বাড়ি গেলে বাড়ির লোকই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। পেঁছেই তাঁকে রোগী দেখতে হয়। তাই তাঁর অপেক্ষা করার অভ্যাস নেই। বললেন: সময়ের মূল্য বলে কি কিছু নেই?

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন: কিছুদিনের জন্যে সময়ের মূল্য ভুলে যাব বলেই তো আমরা বেরিয়েছি!

ডকে এসে গাড়ি দাঁড়াতেই ডাক্তার মৈত্রর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে ডক। লাইন দিয়ে বসে আছে সবাই। তাঁদেরও কি এখন থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে বা বসতে হবে! ডাক্তার মৈত্র আরও কঠিন হয়ে উঠলেন। বললেন: এইজন্যেই প্লেনে যাবার কথা বলেছিলাম!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: সে আরও ঝকমারি হত।

কেন?

পাসপোর্ট করাতে হত। আর দরকার হত ইণ্টারন্যাশনাল হেল্‌থ্ সার্টিফিকেটের।

আন্দামানে যাবার জন্যে পাসপোর্ট!

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন: আপনি কি ভাবছেন, দমদম থেকে উড়েই আন্দামানে গিয়ে নামবেন! তা ভাববেন না। আপনাকে রেঙ্গুনে গিয়ে নামতে হবে। রেঙ্গুন থেকে আন্দামান।

বিরক্তভাবে ডাক্তার মৈত্র বললেন: এ কী রকমের আব্দার!

আব্দারই বটে। রেঙ্গুনে এখন ফুয়েলিং হয়। প্লেনে যাবার খবর নিলে জানতে পারতেন যে আন্দামানে যাবার ফ্লাইট সপ্তাহে দু দিন—সোম আর বিস্যুৎবার। ফেরার প্লেনও দু দিন—মঙ্গল ও শুক্রবার।

একটু থেমে নির্মাল্য মিশ্র বললেন: তবে আশার কথাও শুনতে পাচ্ছি। অদূর ভবিষ্যতে নাকি সরাসরি যাওয়া যাবে। তখন আর পাসপোর্টের দরকার হবে না।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে নিচে দাঁড়িয়েছিল আদেশের অপেক্ষায়। আর ডাক্তার মৈত্র চারিধারে চেয়ে কাউকে খুঁজছিলেন।

নির্মাল্য মিশ্র তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন: বসে রইলেন কেন?

কিন্তু ডাক্তার মৈত্র কিছু বলবার আগেই বাদল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। বলল : এসে গেছেন আপনারা!

বাদলকে দেখতে পেয়ে ডাক্তার মৈত্র যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। বললেন : না এসে আর করব কী!

বলেই নামতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাধা দিয়ে বাদল বলল : নামবেন না এখন।

কেন?

সব বন্ধ। কেউ এখনও আসেনি।

ডাক্তার মৈত্র বললেন : তবে এই হরিহর ছত্রের মেলা কেন?

বাদল বলল : এঁরা সবাই আমাদের সঙ্গী। এম. ডি. আন্দামানের যাত্রী।

সর্বনাশ! এত লোক জাহাজে উঠবে!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : জাহাজটাতো আপনার মোটর গাড়ি নয় যে দুজন চড়লেই দম বন্ধ হয়ে যাবে!

মনে মনে বাদল একটু ভয় পেয়ে গেল। ওঁদের কথাবার্তা যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়। পথে কোন গোলমাল হয়ে থাকতেও পারে। তাই সে তাড়াতাড়ি বলল : আপনারা এখন বসেই থাকুন। সময় মতো আমি আপনাদের ডেকে নিয়ে যাব।

কিন্তু ডাক্তার মৈত্র বললেন : এখন আর পরামর্শ দেবে কী! শাস্তির ব্যবস্থা যখন ভালোই করেছ, তখন তা পুরোপুরি ভোগ করতেই হবে।

বলে নেমে পড়লেন।

তাঁকে নামতে দেখে নির্মাল্য মিশ্রও নামলেন। লটবহর নামানো হল। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে তাঁরাও অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ডকের বাবুরা এল সাড়ে পাঁচটার পরে। এই ঘণ্টা দেড়েক সময়ে ডাক্তার মৈত্রর মেজাজ ক্রমে ক্রমে বেগড়ালো। কিন্তু তবু তিনি কোন রকমে তা সামলেই রইলেন। তারপরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার নামে যে প্রহসন দেখলেন, তাতে তাঁর মেজাজ চরমে পেঁছিল। দেখলেন যে তারা কিছুই করছে না, দেখছেও না বিশেষ কিছু। দু একটা কথা জেনে নিয়েই যাত্রী দর ছেড়ে দিচ্ছে।

ডাক্তার মৈত্র তাঁর রাগ খুব সাবধানে দাবিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। একজন বাবু বলেছিলেন : আপনি নিজে ডাক্তার হয়ে এঁদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন!

আর যায় কোথায়! ডাক্তার মৈত্র মুখ খিঁচিয়ে বললেন: তবে কি উড়ে গিয়ে জাহাজে উঠব!

বাদল নিজের দলের যাত্রীদের সামলে এই দিকেই ছুটে এসেছিল। সেই বাবুটি একটা কড়া উত্তর দেবার উদ্যোগ করছে দেখেই দুজনের মাঝখানে ঢুকে বলে উঠল: ঠিক আছে দাদা, আসতে দিন এঁদের। চুপচাপ চলে আসতে দিন।

বলেই ডাক্তার মৈত্র ও নির্মাল্য মিশ্রকে জাহাজে উঠবার পথের দিকে ঠেলে দিল।

॥ দুই ॥

জাহাজে উঠে ডাক্তার মৈত্র আর একটা হোঁচট খেলেন। নির্মাল্য মিশ্র ঠিক তাঁর পাশের কেবিনেই থাকবেন। এই ব্যবস্থা তাঁর একেবারেই মনঃপুত হল না। অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবে বললেন: বাদলরা গেল কোথায়!

প্রশ্নটা তিনি নিজেকেই করেছিলেন। তার কারণ আর কেউ তাঁর কাছে ছিল না। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র নিজের কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়তেই এই প্রশ্নটা শুনতে পেলেন। ডাক্তার মৈত্র তাঁকেই এই প্রশ্ন করেছেন ভেবে জবাব দিলেন: কেন, কেবিনটা কি আপনার পছন্দ হয়নি?

পছন্দর কথা নয়, কথাটা হল—

কিন্তু কী কথা, তা আর বলতে পারলেন না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: ওরা বোধহয় এখনও জাহাজে ওঠেনি। আর বাদল নিশ্চয়ই সবার পরে উঠবে। যে রকম ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে—

ডাক্তার মৈত্র গম্ভীরভাবে বললেন: দেখেছি।

মানে, এই প্রসঙ্গটার ওপরে একটা দাঁড়ি টেনে দিলেন, এইরকম ভাব দেখিয়ে পছন্দমতো একটা বসবার জায়গার অন্বেষণে এগিয়ে গেলেন।

নির্মাল্য মিশ্র তাঁকে অনুসরণ করে বললেন: আমার কিন্তু এই পরিবেশটি বেশ লাগছে!

ডাক্তার মৈত্র কোন উত্তর দিলেন না।

নির্মাল্য মিশ্র আবার বললেন: গঙ্গায় এতদিন দূর থেকেই জাহাজ দেখেছি। আজ প্রথম এই জাহাজে চড়লাম।

ডাক্তার মৈত্রও এই প্রথম জাহাজে উঠেছেন। কিন্তু সে কথা বললে এই মহিলা আরও অনেক কিছু বলবেন ভেবে তিনি শুধু হুঁ বললেন।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র থামলেন না। বললেন: জাহাজে চড়ার প্রয়োজন তো আজকাল ফুরিয়ে গেছে। সুয়েজ খাল বন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে জাহাজে চড়ে আর কেউ বিলেতে যায় না। আর মানুষের সময়ও আজকাল কম। কেউই আর সময় নষ্ট করতে চায় না।

এ কথার উত্তরেও ডাক্তার মৈত্র বললেন: হুঁ।

নির্মাল্য মিশ্র বলে চললেন: এখন জাহাজে চড়তে হলে রামেশ্বর থেকে সিলোন কিংবা বম্বে থেকে গোয়া বা কোচিন। আর তা না হলে এই কলকাতা থেকে আন্দামান।

ডাক্তার মৈত্র একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন। কোনও উত্তর দিলেন না।

নির্মাল্য মিশ্র তাঁর পাশের চেয়ারখানায় বসে বললেন: আগে নাকি একখানাই জাহাজ ছিল। তার নাম এস. এস. মহারাজা। কলকাতা থেকে আন্দামান যেত। সেখান থেকে ম্যাড্রাস। তারপর ম্যাড্রাস থেকে আন্দামান হয়ে ফিরত কলকাতা। ম্যাড্রাসে যাবার পথে নানকৌরি আর কার-নিকোবর দ্বীপেও দাঁড়াত খানিকক্ষণের জন্যে। ফেরার পথেও দাঁড়াত কার-নিকোবরে। ব্যাপারখানা বুঝতেই পারছেন!

ডাক্তার মৈত্র কিছুই বুঝলেন না। তবু কোন প্রশ্ন করলেন না নির্মাল্য মিশ্রকে। ভদ্রমহিলা নিজেই বললেন: সে সময়ে স্টীমারে আন্দামান গেলে কবে যে ফিরতে পারবেন, তার কোন ঠিক ছিল না। একেবারে বর্বর যুগের ব্যাপার।

ডাক্তার মৈত্র মনোযোগ দিয়ে একটা চুরুট ধরাচ্ছিলেন। সেটা ধরাবার পরে বললেন: সে সময়ে শখ করে তো কেউ আন্দামান যেত না!

নির্মাল্য মিশ্র ফোঁস করে উঠলেন: আপনি বলছেন কী। আমি কি খুব বেশি দিনের পুরনো কথা বলছি! এই তো বছর কয়েক আগেই এই ব্যবস্থা ছিল! আমাদের এই এম. ভি. আন্দামান্‌স্‌ কবে এসেছে তা জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন, কিংবা ম্যাড্রাসের দিকের জাহাজ স্টেট অফ হরিয়ানা!

ডাক্তার মৈত্র কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র থামলেন না। বললেন: শুনতে পাচ্ছি যে কিছুদিন পর থেকে তিনখানা জাহাজ কলকাতা আন্দামান ও ম্যাড্রাসের মধ্যে চলাচল করবে—আন্দামান নানকৌরি

ও হর্ষবর্ধন। হর্ষবর্ধন নাকি একেবারে আধুনিক জাহাজ হবে। তাতে শুধু এয়ারকণ্ডিসন-ই নয়, সুইমিং পুল খেলা-ধুলোর জায়গা, দোকানপাট, লাইব্রেরি, ডাকঘর, ডাক্তারখানা এমন কি সিনেমা পর্যন্ত থাকবে। ছোটখাট একটা শহর। ব্যাপারটা বুঝুন একবার!

ডাক্তার মৈত্র এবারে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

তাই দেখে নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আপনি খুব দুর্ভাবনায় পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে!

তা একটু পড়েছি বৈকি!

আপনার রোগীদের ভাবনা?

কিন্তু ডাক্তার মৈত্র কোন উত্তর দেবার আগে নির্মাল্য মিশ্র নিজেই বললেনঃ ভেবে কোন লাভ নেই, আর ভাববার দরকারও নেই। এই আমাকেই দেখুন না! আমি কি কোন মক্কেলের কথা ভাবছি! কারও কিছু আটকাবে না বলে জানবেন। কলকাতা শহরে কি ডাক্তার বা উকিলের কোন অভাব আছে!

ডাক্তার মৈত্র একটু নিরিবিলিতে বসে থাকতে চাইছিলেন। কিন্তু বলি বলি করেও কথাটা বলতে পারলেন না। চারিদিকে চেয়ে একবার দেখলেন। বোধহয় বাদলকে খুঁজলেন, কিংবা তার দলের কোন পরিচিত ছেলেকে। কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার চুরট টানতে লাগলেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আন্দামানে আমি প্লেনেই যাব ভেবেছিলাম। তাতে সময় অনেক কম লাগত, আর কয়েকটা দিন বেশি থাকা যেত আন্দামানে। কিংবা আরও অনেকগুলো দ্বীপ ঘুরে দেখবার সময় পাওয়া যেত। কিন্তু পরে ভাবলাম যে জাহাজে চড়ে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া তাহলে হবে না। এও তো একটা অভিজ্ঞতা! এটাই বা বাদ যায় কেন?

ডাক্তার মৈত্র গম্ভীরভাবে বললেনঃ হুঁ।

আপনার কী মনে হয়? আপনিও কি এটাকে একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার ভাবেন না?

বলে ভদ্রমহিলা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কোন উপায় না দেখে ডাক্তার মৈত্র বললেনঃ তা বটে।

তবেই দেখুন, এই জাহাজে আন্দামান যাবার একটা ফর্ম আপনার কাছেও আছে। অথচ আপনি এমন ভাব করছেন যেন একটা গভীর

বিপদের মধ্যে পড়ে গেছেন, আর একমাত্র বাদলই এখন আপনাকে রক্ষা করতে পারে। ঠিক বলছি না ?

ডাক্তার মৈত্র অন্যমনস্কভাবে বলে ফেললেন : হুঁ !

নির্মাল্য মিশ্র জিজ্ঞাসা করে বসলেন : আপনার ঐ হুঁ মানে কী ? আমার কথা সমর্থন করছেন, না কোন উত্তর দিতে চাইছেন না ?

ডাক্তার মৈত্র এবারে একটু ফাঁপরে পড়লেন। বললেন : কী জানতে চাইছেন বলুন তো ?

আমার কথা তাহলে এতক্ষণ শোনেন নি ?

তার পরেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নির্মাল্য মিশ্র বললেন : এই কালটাই হয়েছে এইরকম। হাইকোর্টে জজ সাহেবরাও অনেক সময়ে এই রকম করছেন। বেমালুম অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছেন হয়তো ঘোড় দৌড়ের কথা, কিংবা হাতের ওপর মাথা রেখে চোখ মেলেই ঘুমিয়ে পড়েছেন ! আমরা গলার রক্ত তুলে যে প্রচণ্ড আর্গুমেণ্ট্ করলাম, তার কিছুমাত্র তাঁর কানে গেল না। তারপর হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে আপনার মতোই জিজ্ঞেস করে বসলেন, কিছু জানতে চাইছেন ? বুঝুন ব্যাপারখানা !

ডাক্তার মৈত্র বুঝতে পেরেছেন যে এই উকিল ভদ্রমহিলা এই দীর্ঘ সমুদ্র পথ তাঁকে অতিষ্ঠ করে মারবে। মনে মনে বাদলকেই তিনি দায়ী করলেন তাঁর এই শাস্তির জন্য। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আপনি তো ডাক্তার মানুষ ! আপনার কি অন্যমনস্ক হওয়া সাজে ? রোগীর সব কথা না শুনেই যদি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখতে শুরু করেন তো রীতিমতো বিপদের কথা।

ডাক্তার কথাটি শুনেই ডাক্তার মৈত্র সতর্ক হয়েছিলেন। বললেন : কে বলে যে রোগীর কথা না শুনেই আমি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখি ? ঐ বাদল ছোঁড়াটা বলেছে বুঝি ?

নির্মাল্য মিশ্র এবারে খুশী হয়ে উঠলেন। সোৎসাহে বললেন : বাদল বলবে কেন ! এ রকম কাজ করলে পৃথিবী শুদ্ধ লোক বলবে। জুরিরা যে সারাক্ষণ ঘুমোয়, তা তো সবাই জানে ! আর তারা ঘুমোলে আসামী পক্ষ ভয় পায় না এই জন্যে যে জেগে উঠে কাউকে খুনের আসামী বলে ফাঁসিকাঠে লট্‌কাবার পরামর্শ দিতে বিবেকে বাধবে। আর সব কথা না শুনে জজ সাহেবও কাউকে ফাঁসি কাঠে তুলবে না। কিন্তু আপনারা ভুল চিকিৎসা করে মানুষ খুন করতে পারেন অনেক সহজে। অথচ আপনাদের

বিরুদ্ধে একটা মামলা এলে তাকে ঠেকানোও খুব শক্ত কাজ। তবে আমার সিনিয়ার খুবই যোগ্য লোক।

ডাক্তার মৈত্র সোজা হয়ে বসে বললেন: আপনি কি আমার বিরুদ্ধে মামলা আনছেন নাকি?

আমি মামলা আনব কেন! আপনার রোগীরাই আপনার বিরুদ্ধে মামলা আনবে আমার কাছে। আর আপনাকে যে রকম অন্যমনস্ক স্বভাবের দেখতে পাচ্ছি—

কী সর্বনেশে কথা মশাই—

মশাই নয়, মহাশয়া বলতে পারেন।

অত বড় কথা আমি বলতে পারব না।

তবে মিস মিশ্র বলবেন, কিংবা নির্মাল্য।

ডাক্তার মৈত্র বললেন: দুটোই কঠিন শব্দ। একটা সাদামাটা নাম নেই আপনার?

নির্মাল্য মিশ্র মুখ ঘুরিয়ে বললেন: আপনাকে আমি সে নামে ডাকবার অধিকার দেব কেন! আপনি কি আমাকে হিমাংশু নামে ডাকতে দেবেন?

কী সর্বনাশ! আপনি' আমার নামটাও জানেন দেখছি!

হোয়াট্ এ পিটি!

বলে নির্মাল্য মিশ্র মূর্ছা যাবার ভাণ করলেন। আর পরম বিস্ময় নিয়ে ডাক্তার মৈত্র তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আপনিই তো নিজের নামটা আমাকে বলেছেন! আর এরই মধ্যে ভুলে গেলেন!

আমি বলেছি?

আপনি না বললে আমি জানব কেমন করে!

আমি আপনাকে কখন বললাম?

এই মেমরি নিয়ে আপনি চিকিৎসা করেন কী করে মশাই। এক দিন গিয়ে যা দেখে এলেন, তার পর দিন গিয়ে কি সেই রোগীর কাছেই আবার তার রোগের বিবরণ জানতে চাইবেন? না, উল্টোপাল্টা ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলবেন রোগীকে?

এতো ভারি বিপদ দেখছি!

বিপদই তো! এই তো খানিকক্ষণ আগে নিজের গাড়িতে বসে আপনি

নিজের মুখে বললেন যে আপনার নাম হিমাংশু মৈত্র। আর এরই মধ্যে সে কথা ভুলে গেলেন? এ রকমের ভুলো মনের ডাক্তারকে রোগ দেখানো তো মারাত্মক কথা! ছোরাছুরির বদলে ওষুধের গোলমাল করেই তো আপনি মানুষ খুন করবেন!

ডাক্তার মৈত্র বুঝলেন যে এই নবীন উকিলের সঙ্গে কথায় তিনি এঁটে উঠবেন না। তাই আর কোন উত্তর দিলেন না।

জাহাজ ছাড়তে তখনও দেরি ছিল। হঠাৎ হুড়মুড় করে এসে উপস্থিত হল বাদল, আর তার পিছনে পাঁচ সাতজন মেয়ে পুরুষ। বাদল এসেই বলে উঠল: এরা সবাই আমাদের ক্লাবের মেম্বার ডাক্তারবাবু। সদানন্দদা এনেছেন ওঁর ছোট মেয়ে বিন্দুকে। তারাপদ আর তার দিদি। বিকাশ আর ভানু। আর ইনি হলেন নির্মাল্যদি।

বলে তাঁর সঙ্গেও সবার পরিচয় করিয়ে দিল।

ডাক্তার মৈত্র বললেন: তোমরা কোথায় জায়গা পেয়েছ বাদল?

বাদল বলল: আমরা সবাই নিচে বাঙ্ক ভাড়া করেছি।

সেখানে আমার একটু জায়গা হয় না?

বাদল যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল: সে কি ডাক্তারবাবু, এমন সুন্দর কেবিন আপনার পছন্দ হল না?

ডাক্তার মৈত্র বেশ করুণভাবে বললেন: অপছন্দের কথা বলছি না। আমি একটু নিরিবিলি থাকতে চেয়েছিলাম।

বাদল বলল: কেবিনে আপনি তো একা থাকবেন! এই তো বেশ নিরিবিলি!

নির্মাল্য মিশ্র গম্ভীরভাবে বললেন: এ কথা আপনি আমাকে বলেন নি কেন?

বলে চেয়ার থেকে উঠে গট্‌গট্‌ করে অন্য ধারে চলে গেলেন।

সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। বাদল কাঁদো-কাঁদো ভাবে তাকাল ডাক্তার মৈত্রর দিকে। বলল: উনি অমন রেগে গেলেন কেন?

ডাক্তার মৈত্র বলতে পারলেন না যে তাঁর প্রস্তাবেই ভদ্রমহিলা অপমানিত বোধ করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখলেন।

সবার আনন্দের মধ্যে হঠাৎ কেমন একটা ভাঁটা পড়ে গেল। যাত্রার আগেই একটা বাধার মতো। কিছু একটা করা উচিত ভেবে বাদল নির্মাল্য

মিশ্রর দিকে এগিয়ে গেল। কাছে এসে বলল ঃ ডাক্তারবাবুর কথায় আপনি রাগ করলেন কেন নির্মাল্যদি ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ সে আমারই দোষ।

আপনার দোষ কেন বলব ! আপনার জায়গায় হলে আমিও অপমান বোধ করতাম।

করতে তো ! কিন্তু ভদ্রলোক ফ্র্যাঙ্ক নন কেন ? আমি পাশে বসলে যদি তাঁর মান যায় তো আমি কেন তাঁর পাশে বসে থাকব ! দরকার হলে তিনি আমার পাশে এসে বসবেন !

বাদলের হাতে একখানা বই ছিল। সেটার দিকে নজর পড়তেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ওটা কী বই ভাই ?

বাদল এই অন্তরঙ্গ সুর শুনে খুশী হল। বইখানা তাঁর হাতে দিয়ে বলল ঃ আন্দামানের ওপরে লেখা একখানা সরকারী বই। পড়ে দেখুন না ! আর কিছু দরকার হলেই আমাকে ডাকবেন।

বলে ফিরে গেল।

বাদলের সঙ্গীরা ডাক্তার মৈত্রর সঙ্গে দু একটা কথা বলল। তারপরে বিদায় নিয়ে গেল। বাদলই তাদের ডেকে নিয়ে গেল।

কিন্তু জাহাজ এখন ছাড়বে না। জোয়ারের জন্যে জাহাজকে এখন অপেক্ষা করতে হবে।

এক সময়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল চারিদিক ঘিরে। কিন্তু জাহাজের উপরে অন্ধকার নামল না। উজ্জ্বল আলোয় চারি দিক দিনের মতো দেখাচ্ছিল। ডাক্তার মৈত্র একা বসে চুরট টানতে লাগলেন নিঃশব্দে।

॥ তিন ॥

ডাক্তার মৈত্রর দিকে পিছন ফিরে বসেছিলেন নির্মাল্য মিশ্র। এক সময়ে বই-এর পাতায় ডুবে গেলেন। প্রথম দিকেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একখানা মানচিত্র ছিল। সেখানা তাঁর মনোযোগ এমন গভীর-ভাবে আকর্ষণ করল যে খানিকক্ষণ আগের তিক্ততা আর মনে রইল না।

প্রথমেই একটা জিনিস তাঁর নজরে পড়ল। সেটা হল এই দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপ বর্মার অধীন। কলকাতার দিক থেকে যাবার সময় প্রথম

দ্বীপটি হল কোকো আইল্যান্ড। সেটি বর্মার অধীন। এ ছাড়া আর কোন্ দ্বীপ বর্মার অধীন, তা বোঝা যাচ্ছিল না।

কোকো আইল্যান্ডের দক্ষিণে নর্থ আন্দামান, তারপর মিড্‌ল আন্দামান। পোর্ট-ব্লেয়ার শহর সাউথ আন্দামানে। লিট্‌ল আন্দামান তার দক্ষিণে। এরও দক্ষিণে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। সবার উত্তরে কার-নিকোবর, তার দক্ষিণে নান্‌কৌরি, লিট্‌ল-নিকোবর ও গ্রেট-নিকোবর দ্বীপ।

বই-এর প্রথম কয়েকটা পাতার উপরে চোখ বুলিয়েই নির্মাল্য মিশ্র অনেক খবর পেয়ে গেলেন। আন্দামান ও নিকোবর দুটি স্বতন্ত্র দ্বীপপুঞ্জ। আন্দামানের সবচেয়ে উত্তরে হল ল্যান্ড্ ফল আইল্যান্ড। এই দ্বীপটি থেকে লিট্‌ল আন্দামানের দূরত্ব হল দুশো কুড়ি মাইল। তেমনি কার-নিকোবর থেকে গ্রেট নিকোবরের দূরত্ব প্রায় একশো চৌষট্টি মাইল। লিট্‌ল আন্দামান ও কার-নিকোবরের মধ্যে সমুদ্র হল ষাট মাইল। তার মানে এই দুটি দ্বীপপুঞ্জের এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত দূরত্ব হল সাড়ে চারশো মাইলের মতো। অথচ এই দুটি দ্বীপপুঞ্জের মাঝে দূরত্ব এত কম যে এদের আলাদা নাম কেন দেওয়া হয়, সে প্রশ্ন মনে জাগবেই। বই-এ এর উত্তরও আছে! দুই দ্বীপপুঞ্জের মাঝখানে যে সমুদ্র, তার নাম টেন ডিগ্রী চ্যানেল। ষাট মাইল প্রশস্ত হলেও গভীর চারশো ফ্যাদম। এমন দুর্যোগপূর্ণ সমুদ্র পৃথিবীতে কম আছে। পারাপার করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে বর্ষার সময়ে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন যে একদা ব্রহ্মদেশ আর ইন্দোনেশিয়া একটা গিরিশ্রেণীতে যুক্ত ছিল। সে হয়তো পনর কোটি বছর আগে। তারপর চারিদিকের সমুদ্র গ্রাস করেছে এই পর্বতশ্রেণীকে। উঁচু শিখরগুলি শুধু জেগে আছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জরূপে।

এই দ্বীপপুঞ্জদ্বয়ে সবশুদ্ধ তিনশো উনিশটি দ্বীপ। তার মধ্যে মাত্র বাষট্টিটি দ্বীপ নিকোবরের ভাগে পড়েছে। এ ছাড়াও আরও দুটি দ্বীপ আছে দূরে, তাদের নাম নারকোন্ডাম ও ব্যারেন আইল্যান্ড। এই দুটি আগ্নেয়গিরির দ্বীপ ছাড়াও নামী ও বেনামী পাহাড় আছে একশো নব্বুইটি আন্দামানে ও নিকোবরে আঠাশটি। দূরে এইরকম পাহাড়ের সংখ্যা ষোল। এই দ্বীপপুঞ্জের সব চেয়ে দক্ষিণে হল পিগ্‌মেলিয়ান পয়েন্ট। এটি কন্যাকুমারীর চেয়েও দক্ষিণে।

সমস্ত দ্বীপেই যে মানুষের বাস আছে, তা নয়। বরং ব্যাপারটা ঠিক

উল্টো। অল্প কটি দ্বীপেই লোকজনের বাস। ১৯৭১ সালের লোক গণনায় দেখা গেছে যে এক লক্ষ পনর হাজার নব্বুই জন লোক এই তিন হাজার দুশো দুই বর্গমাইল এলাকায় বাস করে। তার মানে এক বর্গ-মাইলে পঁয়ত্রিশ জন লোকও বাস করে না।

নির্মাল্য মিশ্র মনে মনেই একটু হাসলেন। ভাবলেন, এ হল অংকের হিসাব। এইরকম হিসাব করে নদী পার হবার চেষ্টা করলে ডুবে মরতে হবে। সেই গল্পটা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল। আন্দামানের বসতির বেলাতেও তাই। এর বহু দ্বীপ তো জনমানব শূন্য। যে কটি দ্বীপে বসতি আছে। তার লোক সংখ্যা নিশ্চয়ই বর্গমাইলে পঁয়ত্রিশ জন নয়।

তারপরে মুখ তুলে তাকালেন। আর ঠিক এই সময়েই পেলেন পায়ের শব্দ। কেউ বা কারা তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু পিছন ফিরে তাদের দেখবার চেষ্টা করলেন না।

যারা আসছিল, তারাই ঘুরে তাঁর সামনে এল। নির্মাল্য মিশ্র দেখলেন যে বাদলের সঙ্গে সেই ছোট মেয়েটি এসেছে। তাকে চিনতে পারলেও নামটা মনে করতে পারলেন না।

বাদল বলল: বিন্দু আপনা সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

তাই নাকি!

বলে নির্মাল্য মিশ্র বই মুড়ে বললেন: বোসো।

বাদল বসবে কিনা ভাবছিল। নির্মাল্য মিশ্র বললেন: তোমার কি অন্য কাজ আছে নাকি?

এখন আমার কোন কাজ নেই।

তবে চলে যেতে চাইছ কেন?

বাদল আর ইতস্তত না করে সেও একটা আসন সংগ্রহ করে বসে পড়ল। বলল: আপনি হাইকোর্টে ওকালতি করেন শুনে বিন্দুর খুব পুলক হয়েছে।

কেন?

বাদল বলল: কী বলেছিস, বল না বিন্দু।

বিন্দু একটু লজ্জিতভাবে বলল: আমি 'ল' পাস করতে পারব?

নির্মাল্য মিশ্র খিলখিল করে হেসে উঠলেন। বললেন: কেন পারবে

না! ছেলেরা পারছে না! আমি পারি নি! তুমি যদি বি. এ. এম. এ. পাশ করতে পার তো ল পাস করবে আরও সহজে।

সত্যি!

বাদল বলল: সদানন্দদা বলছেন যে বিন্দু বি. এ. পাশ করলেই ওর বিয়ে দিয়ে দেবেন। আর আপনাকে দেখে বিন্দুর ইচ্ছে হয়েছে, ল পাস করে সেও ওকালতি করবে।

নির্মাল্য মিশ্র হাসতে হাসতে বললেন: ভয় শুধু একটা।

কী ভয়?

পুরুষেরা ভাব করতে ভয় পাবে। ভাববে—

বলে দূরের ডাক্তার মৈত্রকে দেখিয়ে দিলেন।

বাদল এবারে সাহস পেয়ে জিজ্ঞাসা করল: কী হয়েছিল নির্মাল্যদি?

নির্মাল্য মিশ্র খুব সহজভাবে বললেন: আমি কি জানতাম যে ভদ্রলোক মেয়েদের অমন ভয় পান! গাড়ি করে আমাকে জাহাজ ঘাটে এনেছিলেন। ভাবলাম, ওঁর কাছেই খানিকক্ষণ বসি। তারপরে গোমরা মুখ দেখে একটু—

হা-হা করে হেসে উঠল বাদল, বলল: বুঝেছি।

কী বুঝেছ?

একটু লেগপুল করবার চেষ্টা করেছিলেন তো!

নির্মাল্য মিশ্র কোন কথা না বলে হাসতে লাগলেন।

বাদল বলল: ডাক্তারবাবু খুব সীরিয়াস টাইপের লোক কিনা, তাই তামাসাটা বুঝতে পারেন নি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আমাকে ভয় পাবার কারণ ছিল না তো, আমাকে ফ্র্যাঙ্কলি বলতে পারতেন!

বাদল বলল: আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলব।

না না, বুঝিয়ে বলবে কেন! আমি তো দূরে সরে এসেছি! উনি থাকুন না একা নিরিবিলি!

বাদল এ নিয়ে আর আলোচনা করল না। বলল: বইখানা কেমন দেখছেন?

সরকারী বই যে রকম হয়, তেমনি।

—মানে?

লোকের ভাল লাগা না লাগা সম্পর্কে নির্বিকার।

বাদল আশ্চর্য হয়ে নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে তাকাল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আমরা পোর্ট-ব্লেয়ারে যাচ্ছি বেড়াতে। উদ্দেশ্য, ঘুরে ফিরে এই জায়গাটা দেখতে চাই। শহরের একটা নক্সায় কী কী দেখবার জায়গা আছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, কী ভাবে সে সব দেখতে হয়, পোর্ট-ব্লেয়ার থেকে কী না দেখে ফেরা উচিত নয়, আদিবাসীদের দেখবার ব্যবস্থা কী, তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু নতুন কথা—এই সব জানবার আগ্রহ কি আমাদের নেই! কিন্তু এ সব কথার নাম গন্ধ নেই এই বই-এ। তার বদলে আছে, সরকার এই জায়গায় উন্নতির জন্যে যা করেছেন তার বিস্তৃত আলোচনা। লোকে এই জন্যেই সরকারী বই-এর বদলে বেসরকারী গাইড বই খোঁজে, কিংবা ভ্রমণকাহিনী।

বাদল বললঃ ভ্রমণকাহিনী আমি খুঁজেছিলাম। কিন্তু পাওয়া গেল না।

কেন?

বাঙলায় এখন ভ্রমণ কাহিনীর বদলে ভ্রমণ উপন্যাসের চল হয়েছে। অর্থাৎ ভ্রমণ কাহিনীতেও একটা প্রেমের গল্প থাকা চাই। নইলে এ কালের ভ্রমণ কাহিনী হয় না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ সব জায়গাতেই ভেজাল।

তারপরেই বললেনঃ দেখো, এই বই-এ বর্মার কেপ লেগ্রেইস থেকে আন্দামানের সবচেয়ে উত্তরে ল্যান্ড ফল আইল্যান্ডের দূরত্ব লিখেছে একশো তিরানব্বুই কিলোমিটার। কত মাইল হল?

বাদল ভয়ে ভয়ে বললঃ মুখে মুখে হিসেব করতে হবে!

নির্মাল্য মিশ্র ততক্ষণে মনে মনে হিসেব করে বললেনঃ একশো কুড়ি মাইল নয়?

বাদল তাড়াতাড়ি বললঃ তাই হবে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আর সবচেয়ে দক্ষিণে পিগ্‌মেলিয়ান পয়েন্ট থেকে সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরে আচিন হেড বল মাত্র একশো ছেচল্লিশ কিলো-মিটার। মাইলে হিসেব কর তো!

বাদল বললঃ আপনিই করে দেখুন।

একশো ছেচল্লিশের আট ভাগের পাঁচ ভাগ কত হয়? একানব্বুই না?

বিন্দু আশ্চর্য হয়ে বললঃ আপনি মুখে মুখে এই সব হিসেব করতে পারেন!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ভয় পেলে কিছুই পারা যায় না।

বাদল বলল ঃ এই হিসেব দিয়ে আপনি কী করবেন ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ সেই কথাতেই আসছি। এই খবর থেকে বুঝলাম যে দুটি দেশ বর্মা আর ইন্দোনেশিয়া থেকেও এই আন্দামান ও নিকোবর খুব দূরে নয়। কিন্তু আমরা জানতে চাই কলকাতা থেকে এদের দূরত্ব বা মাদ্রাজ থেকে, অথবা সিংহল থেকে। তার কারণ আমরা কলকাতা থেকে এখানে এলে মাদ্রাজ হয়ে ফিরতে পারি।

বাদল বলল ঃ ঠিক কথা।

সময় থাকলে আমি হয়তো ম্যাড্রাস বা সিলোনের দিকে যেতাম।

বাদল বলল ঃ সিলোনে যেতে তো পাসপোর্ট লাগে !

তা লাগুক। যাবার ইচ্ছে থাকলে কলকাতায় কি আর পাসপোর্ট পাওয়া যেত না !

চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায় ! দিন কয়েক ছুটোছুটি করতে হত, এই যা।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন ঃ বাদলের কাছে সে কাজ শক্ত নয়।

বিন্দুর দিকে চেয়ে বাদল সগৌরবে বলল ঃ নির্মাল্যদি বাদলকে চিনে ফেলেছেন দেখছি !

নতুন করে নয়, গোড়া থেকেই চিনি।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করল ঃ সত্যিই, কলকাতা থেকে আন্দামান কত দূরে ?

বাদল বলল ঃ বারোশো পঞ্চান্ন কিলোমিটার।

আর তখনি নির্মাল্য মিশ্র বইখানা উল্টে পেছনের ম্যাপটা দেখিয়ে বললেন ঃ এই দেখ, এই ম্যাপে দেখিয়েছে পনর শো কিলোমিটার।

বাদল আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ ম্যাড্রাসের ডিস্টান্স্‌টা দেখুন তো !

এগারো শো ছাব্বিশ।

আমাদের বলেছিল, এগারো শো নব্বুই কিলোমিটার !

বাদল ভেবেছিল যে নির্মাল্য মিশ্র বোধহয় আবার মাইলের হিসেব করতে বলবেন। কিন্তু তার বদলে তিনি নিজেই বললেন ঃ প্রায় সাড়ে সাতশো মাইল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে এই দ্বীপপুঞ্জ বর্মার তো নয়ই, ইন্দোনেশিয়ারও নয়। এ হল ভারতের অধীন একটা ইউনিয়ান টেরিটরি।

কিন্তু বিন্দুর এ সব কথা ভাল লাগছিল না। সে এসেছিল গল্প করতে। তাই এই সব হিসেবের কথায় তার মন যাচ্ছিল না। নির্মাল্য

মিশ্র তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন ঃ বইটা কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করলে বলেই এত কথা বললাম। তবে কাজের কথাও বোধহয় অনেক আছে। সময়মতো সবটা পড়ে দেখব। কিন্তু বিন্দুর এ সব ভাল লাগছে না, তাই না ?

বিন্দু বলল ঃ অংকের নামে আমার জ্বর আসে।

কিসে জ্বর ছাড়ে বল তো !

বাদল সকৌতুকে বলল ঃ ওকে আপনি বলুন যে বিয়ে না করেও কেমন স্বাধীনভাবে ছেলেদের টেক্কা মেরে চলা যায়। খুব খুশী হবে সেই কথা শুনে।

বিন্দু বলল ঃ আপনার নিজের কথাই বলুন না।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন ঃ আমাকে তো ছেলেদের ওপর টেক্কা মারতেই হয়। কিন্তু সে তো নিজের জন্যে নয় !

তবে ?

মক্কেলের জন্যে। হাইকোর্টে তো মেয়ে বেশি নেই, আর মক্কেলরা এখনও মেয়েদের ভয় পায়।

কেন ?

ভাবে যে মেয়েরা বোধহয় ছেলেদের সঙ্গে লড়তে পারবে না। আর একটা সত্যি কথা বলব ?

বলুন।

আর্গুমেণ্ট করতে উঠে দাঁড়ালেই দেখতে পাই যে সামনে সব বুড়ো বুড়ো ঝানু অ্যাড্‌ভোকেট। তাঁদের বিপক্ষে দাঁড়াতে ছেলেরাই ভয়ে কাঁপে।

বিন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ আপনার ভয় করে না ?

ভয় করে না বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে আগে যত ভয় করত, এখন আর তত করে না। খুব পড়াশুনো করে আসতে হয়। আর বেগতিক দেখলেই সিনিয়ারকে চেপে ধরি, এ মামলায় আপনিই আর্গুমেণ্ট করুন।

তারপরেই বললেন ঃ তবে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।

কেন ?

বলে বিন্দু তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তুমি যখন আসবে, তখন আমি সিনিয়ার হয়ে যাব। আমার কাছেই তুমি অনেক সাহায্য পাবে।

বিন্দু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল ঃ আচ্ছা নির্মাল্যদি, আপনি এতদিন বিয়ে করেননি কেন ?

আমি !

বলে খিলখিল করে হেসে উঠলেন নির্মাল্য মিশ্র।

বিন্দু অপ্রস্তুত হয়ে বলল : হাসছেন যে ?

হাসছি তোমার প্রশ্ন শুনে।

বাদলও উত্তর শোনবার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : বিয়ে কি আর একা হয়! মেয়েদের বিয়ে করতে হলে একজন পুরুষও চাই। আমি তো সবাইকেই মেয়ে ভাবি।

বাদল আশ্চর্য হয়ে বলল : সবাইকে ?

সবাইকে মানে, আমার সঙ্গে যারা প্রেম করতে আসে, তাদের। প্রেম করতে এলে পুরুষদের কেমন ন্যাকা ন্যাকা দেখায়। ঘেন্না করে আমার।

ঘেন্না করে !

করবে না ! ভগবান যদি তোমাকে পুরুষ করে থাকে তো পুরুষের মতো হও। মেয়েদের মতো প্যান প্যান করবে কেন !

বাদল গম্ভীর হয়ে বলল : বুঝেছি।

কী বুঝেছ ?

এই জন্যেই ডাক্তারবাবু অমন ভয় পেয়ে গেছেন।

কেন ?

উনিও তো বিয়ে করেন নি। অথচ বয়েস হয়েছে। নিশ্চয়ই কোন বেফাস কথা বলে ফেলেছিলেন, আর আপনি—

বলে থেমে গেল বাদল।

বিন্দু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল : তাই নাকি নির্মাল্যদি ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : ওতো বুড়ো ডাক্তার! ওর মধ্যে এখনও কোন রস কস আছে নাকি !

বলে পরম কৌতুকে হাসতে লাগলেন নির্মাল্য মিশ্র।

বাদল এইবারে জিজ্ঞেস করল : আন্দামানের নাম কালাপানি হল কেন বলতে পারেন ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : এর উত্তরতো এই বই-এই আছে।

আছে নাকি !

তার পরেই বিন্দুর দিকে ফিরে বাদল বলল : ওরে বিন্দু, শিগগির ডেকে আন্ তোর বাবাকে।

বাদলের কথায় বিন্দু ছুটে চলে গেল নিচে।

নির্মাল্য মিশ্র বইএর পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পড়ে বললেনঃ কালাপানি নাম কেন হল, তা বলতে পারেনি।

বাদল হতাশ হয়ে বললঃ ওমা, সদানন্দদাকে তাহলে ডেকে পাঠালাম কেন!

আমি তো ডাকতে বলিনি!

বললেন না, যে এর উত্তর এই বইতেই আছে!

আছেই তো!

তবে?

এই বই-এর উত্তর হল, কালাপানি নাম কেন হল তা জানা যায় না।

ঠিক এই সময়েই বিন্দুর সঙ্গে সদানন্দবাবু এসে উপস্থিত হলেন। নির্মাল্য মিশ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেনঃ বসুন।

সদানন্দবাবু বসবার পরে বাদল বললঃ হল না সদানন্দদা। আপনার কালাপানি নামের কারণ এই বই-এ নেই।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ নেই বোলো না। এতে আছে যে সমুদ্রের জল সেখানে কালীর মতো নীল।

কিন্তু কালাপানি মানে তো কালো জল!

বোধহয় কালো দেখতে। আর একটা ভয়! এই ভয়ের জন্যেই বোধহয় নাম হয়েছিল কালাপানি।

বাদল বললঃ ভয় কিসের?

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ সে যুগে আন্দামানের নামে সমস্ত পৃথিবীর লোক ভয় পেত।

কেন?

বলে সদানন্দবাবু নির্মাল্য মিশ্রর দিকে তাকালেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আন্দামানের ওপরে একটা ভাল আর্টিক্ল্ পড়েছিলাম। তাতে এই দ্বীপের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

বাদল বললঃ বেশ জমিয়ে বলুন তো নির্মাল্যদি!

বলে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেনঃ আন্দামানের নাম রামায়ণে না থাকলেও কিংবদন্তী আছে যে হনুমান এখানে এসেছিলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন যে ভারত থেকে আন্দামান ও আন্দামান থেকে লংকার সেতু তৈরি করবেন।

পরে এই সিদ্ধান্ত বদল করেন। কিন্তু সেই সময় থেকেই তাঁর নামটি রয়ে গেছে। তাঁর নামেই এই দ্বীপপুঞ্জের নাম হয়েছিল হন্দুমান। হন্দুমান থেকেই আন্দামান।

বাদল বলল ঃ বাজে কথা।

কিন্তু সদানন্দবাবু বললেন ঃ কিংবদন্তী হল কিংবদন্তী। এ নিয়ে তর্ক নেই। বলুন আপনি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ঐতিহাসিক যুগে, মানে দ্বিতীয় শতকে বোধ-হয় ১৩০ খ্রীষ্টাব্দে, আন্দামানের নাম প্রথম শোনা যায় আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমির লেখায়। তিনি নাকি নাম লিখেছেন আগ্‌মাতে। এই বই-এ এই নাম দেখেছি। কিন্তু আমি পড়েছিলাম আঙ্গামানান নাম। টলেমির লেখা তো পড়িনি, কাজেই কোন্‌ নামটা ঠিক তা বলতে পারব না। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে ভিনিসের পর্যটক মার্কোপোলো অবশ্য আঙ্গামানিয়ান নাম বলেছেন। তারপর চীনা ও জাপানীদের কথা। তারা বলেছেন আঙ্গাতামাঙ্গ আর আন্দাবান নাম। ওলন্দাজরাও এসেছে এখানে। কিন্তু এদের লেখায় কোন ভয়ের কথা নেই। টলেমি বলেছেন, আইল্যাণ্ডস্‌ অফ গুড ফর্চুন। ওলন্দাজরা বলেছে, এই দ্বীপে নাকি এমন একটা কুয়ো আছে যার জলে লোহা সোনা হয়। আর সেখানে পরশমণিও আছে।

বাদল সাগ্রহে প্রশ্ন করল ঃ তবে ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ শোন তারপর। প্রথম বদনাম করল চীনারা। সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত তারা যাতায়াত করেছে, আর এই জায়গাকে বলেছে রাক্ষসের দেশ। ই চিং নামে একজন বৌদ্ধ সুমাত্রা থেকে ভারতে আসার পথে নিকোবর দ্বীপে পেঁাছেছিলেন। তিনি এই জায়গার নাম বলেছেন আন্দাবান, আর অধিবাসীদের নরখাদক বলেছেন। নবম শতাব্দীতে আরবের ভ্রমণকারীরাও এখানকার অধিবাসীদের চেহারা ভয়াবহ বলে বর্ণনা করেছেন। দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোরে একাদশ শতাব্দীর একখানা শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাতে এই দ্বীপকে বলেছে তিমাইতিভ। তার মানে অপবিত্র দ্বীপ।

সদানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ সব কথা এই বই-এ আছে ?

সব কথা নেই। অনেক কথাই নেই। তবে মার্কোপোলোর কথা আছে। ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যাবার পথে তিনি এখানে এসেছিলেন। নাম বলেছেন আন্দামানিয়া। তাঁর বর্ণনায় এ দেশের মানুষ ছিল ভয়াবহ।

ভারি নিষ্ঠুর জাত, মানুষ ধরে খায়। এমনকি নিজের জাতের মানুষেও আপত্তি নেই।

নির্মাল্য মিশ্র বই-এর পাতায় চোখ রেখেই এই সব বলে যাচ্ছিলেন। এইবারে বললেনঃ ১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রায়ার ওডোরিক এই দ্বীপে এসে সব কিছু দেখে বলেছিলেন, এখানকার অধিবাসীদের কুকুরের মতো মুখ, আর নরখাদক এরা। কিন্তু ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিকোলোকণ্টি এসে আন্দামানের অন্য বর্ণনা দিলেন। তিনি বললেন, সোনার দ্বীপ আন্দামানিয়া। আর এই যে একবার এই ধারণা বদলালো, তা কয়েকশো বছর ধরে চলল।

একটু থেমে বললেনঃ এই সব চোখে দেখা কথা, না শোনা কথা, তা বলা যায় না। তবে এটা সন্দেহ করা হয় যে, মালয়ের জলদস্যুরাই এই সব কথা ছড়াত। নানারকম ভয়ের কথা ছড়ালে তাদের এই সুবিধা হত যে সুযোগ মতো আত্মগোপন করে থাকতে পারত এই সব দ্বীপে।

সদানন্দবাবু বললেনঃ এইটেই খাঁটি কথা বলে মনে হয়।

তবে আদিবাসী কোথায় নেই! আর তাদের মধ্যে বন্য বা নিষ্ঠুর জাত থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু কুকুরের মতো মুখ বা পরস্পরের মাংস খাওয়া, এ সব অসম্ভব কথা বলেই মনে হয়। আর এরাও বাইরের লোকদের খুব ভাল চোখে যে দেখত না তা অনুমান করা যায়। বাইরের লোকদের বলত চাগা। তার মানে হল ভূত বা দৈত্য।

বিন্দু এই কথা শুনে হেসে উঠল।

তাই দেখে নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ হাসছ কেন! আমরা ভূতকে যদি ভূত বলি তো ভূত আমাদের মানুষ বলবে কেন! ওরাও বলবে, এ কী রকম জন্তু রে! দুটো হাত আর দুটো পা থাকা সত্ত্বেও তাদের দেখে দু পায়ে দৌড়য়! হাত দুটো কাজে লাগায় না অন্য জন্তুদের মতো। তাহলে কত তাড়াতাড়ি পালাতে পারত!

নির্মাল্য মিশ্রের কথা শুনে বিন্দুর সঙ্গে বাদলও হেসে উঠল।

সদানন্দবাবু গম্ভীর হয়ে বললেনঃ কথাটা ঠিকই। আমরা সব সময়েই এক পক্ষের কথা ভাবি। অন্য পক্ষের কথা যে ভাববার মতো হতে পারে তা মানি না।

বাদল বললঃ নির্মাল্যদিরা দু পক্ষেরই কথা শোনেন কিনা, তাই এই রকমের অদ্ভুত কথা বলতে পারেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ কিন্তু কথার খেই হারালে চলবে না। আমরা কালাপানির কথায় এত কথা বলেছি। অথচ কাজের কথায় এখনও পৌঁছইনি।

ঠিক কথা।

বলে বাদল আবার সোজা হয়ে বসল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ এর পরে একেবারে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কথা। এই সমুদ্রে তাদের একটি নিরাপদ আশ্রয়ের দরকার ছিল, বিশেষ করে বর্ষার সময়ে। এই দ্বীপের অধিবাসীদের যতটা মারাত্মক মনে করা হত, ততটা নয় বলে তারা লেফটেনাণ্ট আর্চিবল্ড্ ব্লেয়ারকে পাঠালেন সার্ভে করবার জন্যে। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের উনিশে ডিসেম্বর ব্লেয়ার সাহেব এই দ্বীপপুঞ্জের ইণ্টারভিউ আইল্যাণ্ডে এসে উপস্থিত হলেন। কলকাতা থেকে সেখানে পৌঁছতে তাঁর ন'দিন সময় লেগেছিল। আর কুড়ি দিন ধরে সাউথ আন্দামান, রাটল্যাণ্ড আইল্যাণ্ড, বারাটাঙ্গ, ব্যারেন আইল্যাণ্ড ও প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স অ্যাইল্যাণ্ড দেখে রিপোর্ট দিলেন যে এখন যেখানে পোর্ট-ব্লেয়ার সেখানেই একটা সেট্‌ল্‌মেণ্ট হতে পারে। এক বছর পরেই পোর্ট-ব্লেয়ার স্থাপিত হল। কিন্তু গভর্ণর জেনারেলের নামে তার নাম হল পোর্ট কর্ণওয়ালিস।

তারপর?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বড় বড় মাথা থেকে বড় বড় বুদ্ধি বেরোয়। তিন বছর যেতে না যেতেই কারও মাথা থেকে বুদ্ধি বেরোল যে নর্থ আন্দামানেই জাহাজের বন্দর ভাল হবে। তাই হল। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর জায়গা বলে সেখানে অনেকে অসুখে পড়ল। ঠিক হল যে অন্য কোথাও চল। কিন্তু ক্রমাগত অবস্থার অবনতি হচ্ছে দেখে আন্দামান পরিত্যক্ত হল।

বাদল বলল ঃ তখনই কি এর কালাপানি নাম হয়েছিল?

হতে পারে।

কেন?

আন্দামানের বসবাস যখন উঠে যায়, তখন সেখানে কয়েদী ছিল দুশো সত্তর জন, আর স্ত্রী পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা সাড়ে পাঁচশো। এর আগে পোর্ট কর্ণওয়ালিসে কয়েদী বোধহয় ছিল না। সেখান থেকে একশো উনিশ জন মাত্র লোক সুস্থ দেহে নর্থ আন্দামানে সেট্‌ল্‌মেণ্ট গড়তে এসেছিল। তারপরে যে সব লোক আর কয়েদী পাঠানো হয়, খারাপ জলের

জন্যে তাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। এই সময়ে আন্দামানের নাম কালাপানি হওয়া খুবই সম্ভব। সেখানে কাউকে পাঠাতে চাইলেই হয়তো বলা হত, কালাপানি পাঠাচ্ছে।

সদানন্দবাবু এ যুক্তি মেনে নিলেন। বললেন: তাই হবে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এর পরে আন্দামানের কথা লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। ঐ দিকে মাঝে মাঝে জাহাজডুবির খবর পাওয়া যেত। ১৮৪৪ সালে দুটি জাহাজ ডুবে ছ'শো কুড়িজন লোক পৌঁছেছিল আন্দামানে। চুয়ান্ন দিন পরে যখন তাদের উদ্ধার করা হয়, তখন সাতজন লোক ও কয়েকটি শিশু মারা গিয়েছে। এর পর পাঁচ বছরে আরও দুখানা জাহাজ ডোবে।

বাদল বলল: সাংঘাতিক ব্যাপার! এক সঙ্গে এক এক জোড়া জাহাজ!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: তখন একটা জেল খোলার দরকার হয়েছিল ইংরেজের। ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহে নাস্তানাবুদ হবার পরেই ইংরেজ এই কথা ভাবছিল, সিপাহীদের দ্বীপান্তরে পাঠাতে হবে। আন্দামানের কথাই প্রথম তাদের মনে পড়ল—কালাপানির কথা। একটা কমিটি ঘুরে ফিরে সব দেখে এসে বলল, ব্লেয়ারের পছন্দ করা জায়গাটিই সবচেয়ে ভাল। সে জায়গাটা তত অস্বাস্থ্যকর নয়।

তারপর?

তারপর আর কী! কয়েদী পাঠিয়েই কয়েদীদের থাকবার জায়গা তৈরি হয়ে গেল। আর পাকা হয়ে গেল এর কালাপানি নাম।

বাদল মাঝে মাঝে ডাক্তার মৈত্রর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তা দেখতে পেয়ে নির্মাল্য মিশ্র বললেন: ও দিকে কী দেখছ?

বাদল একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল: না, কিছু নয়।

কিছু না মানে?

মানে, উনি কী করছেন তাই দেখছি।

ও দিকে তাকিয়ো না, যেও না ও দিকে। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে উনি বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না।

তাহলে?

বলে বাদল সদানন্দবাবুর দিকে তাকাল।

সদানন্দবাবু বললেন: ইচ্ছে হলে আমাদের কাছে চলে আসবেন। আর তা না হলে—

বলে তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রের দিকে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আমার কাছে এলে আমি ঘেঁষতে দেব না।

বাদল বলল ঃ সে কি!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আমি ওঁর মর্জিমাফিক চলব নাকি! উনি কি আমার গুরু ঠাকুর!

বিন্দু হেসে বলল ঃ গুরু ঠাকুরের মতোই মনে হচ্ছে।

ধীর স্থির হয়ে বসে আছেন ভদ্রলোক। হাতের চুরটটা নিবে গেছে কিনা দেখা যাচ্ছে না। গঙ্গার জলোচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু বোধহয় তাঁর কানে যাচ্ছে না।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ আপনাকেও আজ অনেক বিরক্ত করেছি। উঠি এবারে।

বলে উঠে পড়লেন। ফিরে যাবার আগে বলে গেলেন ঃ আন্দামানের গল্প শুনতে আবার আসব।

বাদল বলল ঃ গল্প করেই তো চারদিন কাটাতে হবে!

বিন্দু তার বাবার সঙ্গে ফিরে গেল না। বলল ঃ অমনি করে মুখ গুঁজে কি ডাক্তারবাবু চারটে দিন কাটাবেন!

বলে পরম কৌতুকে হাসল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ মৌনীবাবা দেখনি?

না।

ঐভাবে মুখ বুঁজে বসে থাকেন। কিন্তু তাঁরা চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসেন না। বসেন মাটিতে যোগাসনে। তুমি কাছে গেলে তোমাকে ইসারায় বসতে বলবেন, মাটিতে আঁচড় কেটে লিখে দেবেন তুমি যা জানতে এসেছ।

কিছু জিজ্ঞেস না করলেও মনের কথা বুঝতে পারেন বুঝি?

নির্মাল্য মিশ্র সকৌতুকে হেসে বললেন ঃ আমার মতো উকিল হবার পরামর্শ দিতেন না। লিখে দিতেন, তোমার বিবাহের যোগ আছে আন্দামান থেকে ফেরার পরে। বরের নামটাও হয়তো লিখে দিতেন।

বলে তাকালেন বাদলের দিকে।

কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বিন্দু উঠে পড়ল, বলল ঃ ভারি অসভ্য আপনি।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন ঃ আমাকে এ কথা বলতে পারলে, কিন্তু মৌনীবাবাকে বলতে পারতে না।

বিন্দু চলে যাচ্ছিল। নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আবার এসো।

॥ চার ॥

দিনের আলো মিলিয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। গঙ্গার বুকে অন্ধকার নেমে গভীর হয়েছে। দূ তীরের লোকালয়ে এখন ঝলমল করছে বাতি। নির্মাল্য মিশ্র তাঁর বই অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ করেছিলেন। কোনও নতুন যাত্রীর সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেন নি। এ সময়ে তাঁর একাই ভাল লাগছিল।

কখন এক সময়ে গুণগুণ করে গাইতে শুরু করেছিলেন। ভজনের সুরে বাঙলা গান। ভজন গাইলেই যেন মীরা বাঈএর কথা মনে পড়ে। মীরার ভজন। কিংবা হিন্দী ভাষায় লেখা ভজন। নির্মাল্য মিশ্রর এ রকম ভজন ভাল লাগে না। রবীন্দ্রনাথের কোন গান ভজনের সুরে গাইবার উপায় নেই। শান্তিনিকেতনের গোঁড়া ছাত্র-ছাত্রীরা মারতে আসবে। নির্মাল্য মিশ্র তাই নিজেই গানের মতো কথা সাজিয়ে গুণগুণ করে গান। নিজের লেখা গানই একখানা গাইতে শুরু করেছিলেন।—

তোমার কাছে ক্ষমা আমার চাহিতে নাহি হয়,
তুমি যে মোরে গোপনে ভাল বাসো।
দুখের ঝড়ে দেখে আমার চরম বিপর্যয়,
অন্তরালে লুকিয়ে তুমি হাসো।

নির্মাল্য মিশ্রর কণ্ঠস্বর একটু একটু করে উপরে উঠছিল।—

আমায় নিয়ে জানি তুমি,
মত্ত সারা বেলা।
তোমার গড়া পুতুল নিয়ে,
তোমার ছেলে খেলা।
যে দুখ আসে জীবনে মোর সে তোমারই দান,
ভুলে যে যাই আমায় ভালবাসো।
দুঃখ তাপে ব্যথিত বুকের সকল অভিমান
নীরবে হেরি আড়ালে তুমি হাসো।

নির্মাল্য মিশ্রর মনে ছিল না যে তিনি বেশ সহজ ভাবে গান গাইছিলেন। কে শুনছে আর কে শুনছে না, সে দিকে তাঁর মনোযোগ ছিল না। কিন্তু গান থামতেই একটা ভারি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন: থামলেন কেন?

চমকে উঠে নির্মাল্য মিশ্র দেখলেন যে ডাক্তার মৈত্র কখন এক সময় এসে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। নির্মাল্য মিশ্রকে তাকাতে দেখে বললেন : এই তো বেশ গাইছিলেন !

নির্মাল্য মিশ্র একটু কঠিন স্বরে বললেন : আপনাকে শোনাবার জন্যে নিশ্চয়ই গাইছিলাম না।

কিন্তু আমি শুনতে পেয়েই কাছে চলে এসেছি।

বলে নির্মাল্য মিশ্রের পাশের চেয়ারখানায় বসে পড়লেন।

তাই দেখে নির্মাল্য মিশ্র মুখ ঘুরিয়ে বসলেন।

ডাক্তার মৈত্র বললেন : গানের ভাবটিও আপনার গলার মতোই মিষ্টি।

নির্মাল্য মিশ্র কোন উত্তর দিলেন না।

ডাক্তার মৈত্র বললেন : এ ভজনখানি কোথাও শুনি নি।

নির্মাল্য মিশ্র এইবারে প্রশ্ন করলেন : আপনার কি ভজন শোনার অভ্যাস আছে ?

না, মানে—

মানে আপনাকে বোঝাতে হবে না। হ্যাঁ কিংবা না বললেই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারব।

ডাক্তার মৈত্র একটু থতমত খেয়ে বললেন : আগে ছিল।

মানে, এখন নেই। আমি যে গান গাইলাম তা পুরনো নয় এবং কারও জানার কথাও নয়।

কেন ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : এ গানখানি ছাপা হয়ে বেরোয় নি, কোন রেকর্ডে বা রেডিওতেও গাওয়া হয়নি। এমন কি কোন সভা-সমিতি বা কারও ড্রয়িং রুমেও কেউ এখনও গায়নি।

তবে আপনি—

যদি বলি, এ গান আমার নিজস্ব সম্পত্তি !

মানে, আপনার নিজের লেখা ও নিজের সুর দেওয়া গান ?

তা কি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে ?

বলে নির্মাল্য মিশ্র ডাক্তার মৈত্রর মুখের দিকে তাকালেন।

ডাক্তার মৈত্র খুবই আশ্চর্য হয়েছেন বলে মনে হল। বললেন : সত্যি বলতে কি, কথাগুলি শুনে আমি গীতাঞ্জলির গান বলে ভেবেছিলাম।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : রবীন্দ্রনাথকে এ ভাবে অপদস্থ করবেন না।

তিনি যা লিখে গেছেন, তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। এ রকম লেখা তাঁর আগেও হয় নি, পরেও আর সম্ভব হবে না।

আকাশের পরে কী আছে তা ভাবা যায়?

না।

রবীন্দ্রনাথ হলেন আকাশ, তাঁর পরে আর কিছু আছে বা হতে পারে বলে ভাবা যায় না।

ডাক্তার মৈত্র নির্বাক বিস্ময়ে তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রর দিকে। নির্মাল্য মিশ্র বললেন: বুঝতে পারলেন না?

না।

তিনি শুধু বাঙলা আর ইংরেজী পড়ে কবি হন নি। বেদের যুগ থেকে আমাদের ঋষি কবিরা তপস্যায় যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তিনি তাঁর শৈশবেই তা পড়ে বুঝে নিজের অন্তরে গ্রহণ করেছেন। উপনিষদের ঋষিরা যা দুরূহ ভাষায় বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই রকমের কথাই বলেছেন তাঁর গীতাঞ্জলিতে। সে কবিতা অনুকরণ করা যেতে পারে, কিন্তু নতুন কিছু বলা আর সম্ভব নয়। কবিতার নামে এখন শুধু পরীক্ষা নিরীক্ষাই হতে পারে। সত্যিকারের নতুন কবিতা রচনা হতে পারে আর একজন রবীন্দ্রনাথ জন্মালে।

ডাক্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে নির্মাল্য মিশ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বোধহয় এর আগে এ রকমের কথা শোনেন নি!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: কেন, কারণটা স্পষ্ট করে বোঝাতে পারলাম না নাকি?

ডাক্তার মৈত্র বললেন: আমি শুনেছি—

কী শুনেছেন?

এখনও অনেক কবি ভালো কবিতা লিখছেন। তাঁরাও নাকি খুব শক্তিশালী কবি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এখনকার সমালোচকদের মতে রবীন্দ্রনাথের কাল অনেকদিন আগেই গত হয়ে গেছে। তাঁর কবিতা এখন কালিদাসের কবিতার মতো আলমারিতে তুলে রাখবার জিনিস। তাঁদের মতে, শুধু গানের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর কারণ আধুনিক কবিরা গান লিখছেন না। পপ্ সঙ্স্ যাঁরা লিখছেন, তাঁরা কবি নন বলেই রবীন্দ্রনাথ এখনও বেঁচে আছেন।

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ ভারি গোলমেলে কথা।

মোটেই না।

নয়?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ সমালোচকরা সমালোচনা করেন। এও এক রকমের সাহিত্য। কিন্তু সেটা নিতান্ত সাময়িক। লোকের মুখ চেয়ে লেখা। তা না হলে সে লেখা প্রকাশিত হবে না।

কেন?

বলে ডাক্তার মৈত্র বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

নির্মাল্য মিশ্র তা লক্ষ্য করে বললেন ঃ সাময়িক পত্রিকারও এক একটা জোট আছে—গোষ্ঠী। আর এই সব গোষ্ঠীর আছে কবি ও লেখক। তাঁদের মুখ চেয়েই সমালোচনা লিখতে হয়। যে গোষ্ঠীর শক্তি বেশি, তাদেরই জয় জয়কার, আর সবাই অপদার্থ।

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ তাহলে এই সব সমালোচনার মূল্য কী?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ একটা উদাহরণ দিলেই এর মূল্য বুঝতে পারবেন।

দিন।

বলে ডাক্তার মৈত্র তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বেকার নামে কোন ইংরেজী নাট্যকারের নাম আপনি শুনেছেন?

ডাক্তার মৈত্র বেশ আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন ঃ ইংরেজী সাহিত্যে আমার তেমন—

বলে তিনি থামতেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বুঝেছি।

তার পরেই প্রশ্ন করলেন ঃ বার্নার্ড শর নাম শুনেছেন?

তা শুনেছি।

গল্‌স্‌ওয়ার্দির নাম?

এ নামটাও শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন।

খুশী হয়ে ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ কেন বলুন তো!

এরা তিন জনই একই সময়ের নাট্যকার। আর তাঁদের নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে সমসাময়িক সমালোচক কী বলেছিলেন জানেন?

না।

বলেছিলেন, শ একটা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারেন, আর গল্প তৈরি করতে জানেন গল্‌স্‌ওয়ার্দি। কিন্তু বেকার দুই-ই পারেন। এর মানে কী হল?

ডাক্তার মৈত্র বললেন: বেকার তাহলে এঁদের চেয়ে বড় নাট্যকার।

ঠিক তাই। কিন্তু এখন বেকার কোথায়?

জানি না।

ইংরেজী-সাহিত্যের ছাত্ররা এখন বেকারের নামও শোনে না।

তাই নাকি?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: সমসাময়িক সমালোচকদের সমালোচনার মূল্য হল এইরকম।

বুঝেছি। কিন্তু—

বলুন।

ডাক্তার মৈত্র বললেন: আপনি এত কথা জানলেন কী করে?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: চোখ বুঁজে থাকি না বলে।

আমরা কি চোখ বুঁজে থাকি?

এ কথার উত্তর না দিয়ে নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আচ্ছা বলুন তো. বাদলের কাছে আমি আজ কী বই পেয়েছি?

আমি তা কী করে বলব!

কিন্তু আপনাকে কী বই সে চুপি চুপি দিয়ে গেছে, তা বলব?

বলুন।

স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক।

ডাক্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন: আপনাকেও দেখিয়েছে নাকি?

নিশ্চয়ই না।

তবে এ কথা জানলেন কী করে?

নির্মাল্য মিশ্র সকৌতুকে বললেন: চোখ মেলে থাকি বলে।

ডাক্তার মৈত্র খুবই আশ্চর্য হলেন।

তাই দেখে নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এরই নাম চোখ খুলে থাকা, আর চোখ বুঁজে থাকা।

কিন্তু ডাক্তার মৈত্র এ কথায় খুশী হলেন না। বললেন: কিন্তু চোখ খুলে থাকলেই কি সব জিনিস বোঝা যায়! ওটা যে স্বামীজীর বই, আপনি তা বুঝলেন কী করে?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : অমন ছোট আকারের চটি বই দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, আর—

আর কী ?

স্বামীজীর লেখা বই তো, তাই আমাকে লুকিয়ে সে আপনার হাতে দিয়েছে। ও ভেবেছে যে ও বই দেখে আমি নাক সেঁটকাব।

কেন ?

আমাকে চেনে না বলে। কিন্তু বাদল আমার কাছে এলে বলব যে তার সিলেক্‌সন খুব ভাল। বই-এর প্রথম দিকের কয়েকটা পাতায় এই কলকাতার বন্দর থেকে গঙ্গাসাগরের যে বর্ণনা আছে, তা এখনও সবার ভাল লাগবে। ওর মধ্যে এমন কয়েকটি সত্য কথা আছে, যা চিরকালই সত্য হয়ে থাকবে।

কী বলছেন আপনি ?

যদি বলেন তো খানিকটা পড়ে শোনাতে পারি।

ডাক্তার মৈত্র তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে বইখানা এনে নির্মাল্য মিশ্রের হাতে দিলেন।

খানকয়েক পাতা উল্টে নির্মাল্য মিশ্র পড়তে লাগলেন : নদীমুখ বা বন্দর হতে জাহাজ রাতে প্রায় ছাড়ে না,—বিশেষ কলকাতার ন্যায় বাণিজ্য-বহুল বন্দর আর গঙ্গার ন্যায় নদী। যতক্ষণ না জাহাজ সমুদ্রে পেঁছায় ততক্ষণই আড়কাঠির অধিকার ; তিনিই কাপ্তেন ; তাঁরই হুকুম ; সমুদ্রে বা আসবার সময় নদীমুখ হতে বন্দরে পেঁছে দিয়ে তিনি খালাস। আমাদের গঙ্গার মুখে দুটি প্রধান ভয় ; একটি বজবজের কাছে জেম্‌স ও মেরী নামক চোরা বালি, দ্বিতীয়টি ডায়মণ্ড হারবারের মুখে চড়া। পুরো জোয়ারে দিনেরবেলায় পাইলট অতি সন্তর্পণে জাহাজ চালান ; নতুবা নয়। কাজেই গঙ্গা থেকে বেরুতে আমাদের দু'দিন লাগল।

এই পর্যন্ত পড়ে নির্মাল্য মিশ্র ডাক্তার মৈত্রর দিকে তাকালেন।

ডাক্তার মৈত্র গম্ভীরভাবে বললেন : তাহলে কি আমাদের এই জাহাজ আজ রাতে ছাড়বে না ?

আশা কম।

বলে নির্মাল্য মিশ্র পাতা উল্টে আবার পড়তে লাগলেন : এই বেলা এ গঙ্গামার শোভা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য দানবের হাতে পড়ে সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইঁটের

পাঁজা আর নামবেন ইটখোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবে পাট বোঝাই ফ্ল্যাট আর সেই গাধাবোট ; আর ঐ তাল তমাল, আম লিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ও সব কি আর দেখতে পাবে ? দেখবে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মতো অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি !

এই পর্যন্ত পড়ে নির্মাল্য মিশ্র আবার মুখ তুলে তাকালেন।

ডাক্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন : গঙ্গার ধারে তো শুনেছি সবই কলকারখানা ! তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী তো দেখছি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : তারপরে একটি মারাত্মক মন্তব্য করেছেন স্বামীজী।

কী রকম ?

বলে ডাক্তার মৈত্র কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : শুনুন।

বলে আবার পড়তে লাগলেন : এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়ল। ঐ যে "দূরাদয়শ্চক্র" বা "তমালতালি বনরাজি" ইত্যাদি সব কিছু কাজের কথা নয়। মহাকবিকে নমস্কার করি। কিন্তু তিনি বাপের জন্মে হিমালয়ও দেখেন নি, সমুদ্রও দেখেন নি, এই আমার ধারণা।

এবারে নির্মাল্য মিশ্র থামবার পরেও ডাক্তার মৈত্র কোন কথা বললেন না। স্বামীজীর সম্বন্ধে কোন অপ্রিয় মন্তব্য করতে বোধহয় তিনি চান না। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র বললেন : কালিদাস কী দেখেছেন আর কী দেখেন নি, তা আমাদের দেখা সম্ভব নয়, আর তা জানবার দরকারও নেই।

কেন ?

আমরা তাঁর বাক্য পড়ে আনন্দ পাই। কাব্য ভ্রমণ কাহিনী নয় যে না দেখে কিছু লিখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তা ছাড়া কালিদাস তো গঙ্গাসাগরের কথা লেখেন নি যে তাঁর বর্ণনার সমুদ্রের সঙ্গে সে কথা মিলতেই হবে।

কিন্তু—

বাধা দিয়ে নির্মাল্য মিশ্র বললেন : এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই ডাক্তারবাবু। আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হওয়া দরকার, আর বুদ্ধি সংস্কারহীন।

স্বামীজী বলেছেন বলেই যে আমাদের সে কথা মেনে নিতে হবে, সে যুক্তি স্বামীজী নিজেও মানতেন না। সত্য আমরা মানব। কিন্তু সত্য কিনা তা আমরা আগে বাজিয়ে দেখব।

ডাক্তার মৈত্র বললেন: কিন্তু ব্যাপারটা কী জানেন?

কী?

স্বামীজীর মতো লোক মিথ্যা বলেছেন, এ কথা ভাবাই অন্যায়।

নির্মাল্য মিশ্র তৎপর ভাবে উত্তর দিলেন: আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কোন বৈজ্ঞানিকের মতো নয়।

কেন এ কথা ভাবছেন?

বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করেন না যে আজ তাঁরা সত্য বলে যা ভাবছেন, তা সত্যিই সত্য কিনা। তার মানে নূতন সত্য আবিষ্কৃত হলে আগের সত্য বিশ্বাসটি হয়তো মিথ্যা বলে প্রমানিত হবে।

কথাটা ডাক্তার মৈত্র বোঝবার চেষ্টা করলেন। বললেন: আপনার কথাগুলো এখন একটু হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে।

তা হবেই। তার কারণ যদি একদিন কোন শিলালিপি পাওয়া যায় যে কালিদাস বদ্রীনাথের পথে অলকাপুরী গিয়েছিলেন, কিংবা গঙ্গাসাগরে এসে কপিল মুনির আশ্রম দেখে গেছেন, তাহলে স্বামীজীর ঐ উক্তি মিথ্যা বলে প্রমাণ হয়ে যাবে। তাঁর সময়ে হয়তো সেখানকার দৃশ্য ঐ রকমই ছিল।

কী রকম?

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালী বনরাজি নীলা।

তার পরেই বললেন: বলুন না তার পরের লাইনটা।

ডাক্তার মৈত্র করুণভাবে বললেন: সংস্কৃত আমি—

বুঝেছি।

বলে নির্মাল্য মিশ্র নিজেই বললেন: তার পরের লাইনটা হল—

আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

ডাক্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন: আপনি দেখছি ইংরেজীর মতো সংস্কৃতও জানেন।

আজ্ঞে না।

তবে এই সব কঠিন শ্লোক বলছেন কী করে?

নির্মাল্য মিশ্র গম্ভীরভাবে বললেন ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে।

ডাক্তার মৈত্র চটে উঠে বললেন ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে আপনি কালিদাসের শ্লোক বলছেন!

নির্মাল্য মিশ্র রুখে উঠে বললেন ঃ বঙ্কিমচন্দ্রও পড়েন নি! ছিঃ ছিঃ!

ডাক্তার মৈত্র হকচকিয়ে গেলেন। তখনই কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

নির্মাল্য মিশ্র বেশ কৌতুক বোধ করছিলেন। বললেন ঃ কপালকুণ্ডলার প্রথম পরিচ্ছেদই তো 'সাগর সঙ্গমে'। 'যুবা উত্তর করিলেন। সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেইজন্যই আসিয়াছি। আহা! কি দেখিলাম। জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না।' তারপরেই এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিল। মনে নেই?

ডাক্তার মৈত্র সরলভাবে বললেন ঃ না। ছেলেবেলায় পড়া বই কি এত দিন মনে থাকে!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তাহলেই বলুন, স্বামীজী ঠিক বলেছেন, না বঙ্কিমচন্দ্র? স্বামীজীর কথা মানতে হলে বঙ্কিমচন্দ্রও সমুদ্র দেখেন নি। তা কি সম্ভব?

ডাক্তার মৈত্র কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

আর নির্মাল্য মিশ্র তাঁর অবস্থা দেখে হাসতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে বললেন ঃ স্বামীজীর অন্য একটি কথা মনে রেখেছি।

কী কথা?

বলে ডাক্তার মৈত্র তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

নির্মাল্য মিশ্র তৎপরভাবে পাতা উল্টে বললেন ঃ গঙ্গা এইভাবে তার পথ বদল করছে যে স্বামীজী বলেছিলেন কলকাতা এখনও খোলা, তবে "পরেই বা কি হয়" এই ভাবনা সকলের।

বলে পড়তে লাগলেন ঃ নীচে মহাভয়—জেম্স আর মেরী চড়া। পূর্বে দামোদর নদ কলকাতার ত্রিশ মাইল উপরে গঙ্গায় এসে পড়ত, এখন কালের বিচিত্র গতিতে তিনি ৩১ মাইলের উপর দক্ষিণে এসে হাজির। তার প্রায় ৬ মাইল নীচে রূপনারায়ণ জল ঢালছেন। মনিকাঞ্চনযোগে তাঁরা তো হুড়মুড়িয়ে আসুন, কিন্তু এ কাদা ধোয় কে? কাজেই রাশিকৃত বালি। সে স্তূপ কখনও এখানে, কখনও ওখানে, কখনও একটু শক্ত, কখনও নরম হচ্ছেন। সে ভয়ের সীমা কি! দিনরাত তার মাপ জোখ হচ্ছে, একটু অন্যমনস্ক হলেই—দিনকতক মাপজোক ভুললেই, জাহাজের সর্বনাশ।

সে চড়ায় ছুঁতে না ছুঁতেই অমনি উল্টে ফেলা, না হয় সোজাসুজিই গ্রাম !! এমনও হয়েছে, মস্ত তিন মাস্তুল জাহাজ লাগবার আধঘণ্টা বাদেই খালি একটু মাস্তুল মাত্র জেগে রইলেন। এ চড়া—দামোদর রূপনারায়ণের মুখই বটেন। দামোদর এখন সাঁওতালি গাঁয়ে তত রাজি নন, জাহাজ স্টিমার প্রভৃতি চার্টার রকমে নিচ্ছেন।

বই মুড়ে রেখে নির্মাল্য মিশ্র হাসতে লাগলেন।

ডাক্তার মৈত্র বললেন : শেষ লাইনটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : দামোদর নদী আগে সাঁওতালি গ্রাম ভাসিয়ে দিত বন্যায়, এখন তার নজর জাহাজ আর স্টীমারের ওপর।

ডাক্তার মৈত্র বললেন : কথাটা সত্যি। গঙ্গায় যাতায়াত আগের মতোই ভয়াবহ আছে। মাঝে মাঝেই তো জাহাজডুবির খবর কাগজে দেখতে পাই। তাই না !

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : কলকাতা পর্যন্ত জাহাজ আর কত দিন চলবে, এ ভাবনাও সকলের।

ডাক্তার মৈত্রকে এখন বেশ অন্যমনস্ক দেখাল। কিন্তু তাঁর ভাবনার কথা তিনি বললেন না।

খবর পাওয়া গেল যে গঙ্গায় জোয়ার এসেছে অনেকক্ষণ আগেই এবং জল আরও বাড়লে জাহাজ ছাড়বে। খানিকটা ব্যস্ততা দেখা গেল যাত্রীদের মধ্যে। বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই মুহূর্তটির জন্য যেন সবাই উন্মুখ হয়ে উঠল। গত এক মাস ধরে এই যাত্রার উদ্যোগ হচ্ছে। জাহাজে চড়ার অভিজ্ঞতা অনেকের জীবনেই এই প্রথম। আর এই জাহাজে চড়ে সমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে। এ ওখা বন্দর থেকে বেট দ্বারকার তীর্থযাত্রা নয়, আরব সাগরের মাইল তিনেক শান্ত জল নৌকায় চেপে পার হতে হবে না। এ হল দুরন্ত বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগরেরই অংশ। অকূল সমুদ্রের মধ্যে কয়েক শো মাইল দূরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে যাবে এই বৃটিশ জাহাজ এম. ভি. আন্দামান।

কে একজন পরামর্শ দিল : রাত নটা তো বেজে গেছে, খেয়ে নিন তাড়াতাড়ি।

আজকের রাতের খাবার অনেকেরই সঙ্গে আছে। লুচি তরকারি মিষ্টি। সকালের জন্য অনেকে পাঁউরুটিও এনেছে, আর চা কফি চিনি গুঁড়ো দুধ

বা কন্‌ডেন্‌স্‌ড মিল্ক। জাহাজে খাবার ব্যবস্থা আছে। গরম জলও পাওয়া যায়। ব্যাদলরাও অনেক রকম জিনিস এনেছে নিজেদের জন্য।

ডাক্তার মৈত্র নির্মাল্য মিশ্রকে বললেন : আপনি যে বলছিলেন, রাতে জাহাজ ছাড়বে না ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : কই, সে রকম কথা তো আমি বলিনি !

বলেন নি মানে !

কখন বলেছি ?

ডাক্তার মৈত্র জোর দিয়ে বললেন : এই তো একটু আগেই আপনি বললেন !

সে কি আমার কথা ! আমি তো আপনাকে স্বামী বিবেকানন্দর লেখা পড়ে শোনাচ্ছিলাম ! প্রায় একশো বছর আগে তিনি ঐ কথা লিখেছেন। তখন হয়তো নদীতে জল ছিল, জোয়ারের অপেক্ষা করতে হত না বলে দিনের বেলাতেই জাহাজ ছাড়ত। এত দিন পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে থাকলেও কি স্বামীজীর কথায় রাতে জাহাজ ছাড়বে না !

ডাক্তার মৈত্র এ কথার কোন যুৎসই উত্তর খুঁজে না পেয়ে একটু থমকে গেলেন।

নির্মাল্য মিশ্র তাই দেখে বললেন : হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম বটে যে স্বামীজীর অনেক কথাই এখনও সত্য আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে জাহাজ ছাড়ার সময়টাও বদলায়নি।

ডাক্তার মৈত্র এবারে বললেন : এই দেখুন, আপনি বলেছিলেন কিনা ! আমি কি আর তৈরি করে আপনাকে বলেছিলাম।

নির্মাল্য মিশ্র বললেল : বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে এই সময়ে খেয়ে নিন। ওরা ঠিকই বলছে। জাহাজ ছাড়লে আর খাওয়ার সময় পাওয়া যাবে না।

কেন ?

তখন দু দিকের দৃশ্য দেখবেন, না খেতে বসবেন !

ডাক্তার মৈত্র বললেন : অন্ধকারে আবার দৃশ্য দেখব কী !

তবে আপনি বসে থাকুন, আমি খেয়ে নিচ্ছি।

বলে নির্মাল্য মিশ্র উঠে গেলেন।

ডাক্তার মৈত্র কিছুক্ষণ এ দিকে সে দিকে দেখলেন। সবাই এখন রাতের

আহারে ব্যস্ত দেখে স্বগতভাবে বললেন : তাহলে আমিই বা একা বসে থাকি কেন !

বলে উঠে পড়লেন ।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে আসতে প্রায় দশটা 'বাজল । তখনও জাহাজ ছাড়েনি । নির্মাল্য মিশ্র এসে তাঁর পুরনো জায়গায় বসেছিলেন । ডাক্তার মৈত্রও ফিরে এলেন । আর নির্মাল্য মিশ্রকে দেখতে পেয়েই বললেন : কই আপনার জাহাজ ছাড়ল ?

নির্মাল্য মিশ্র গম্ভীরভাবে বললেন : জাহাজটা আমার নয় ।

জাহাজ আপনার হবে কেন !

তবে যে বললেন, আপনার জাহাজ !

ডাক্তার মৈত্র বললেন : কী বিপদ ! আপনি যদি এইভাবে কথার ভুল ধরেন, তবে আপনার সঙ্গে তো কথা বলাই যাবে না !

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : এই তো খানিকখণ আগে আপনি আমার ভুল ধরেছিলেন ! তার সে আমার কথার ভুল ছিল না !

ডাক্তার মৈত্র বললেন : আচ্ছা, আমার ভুল না হয় মেনেই নিলাম । এখন উত্তর দিন তো ! জাহাজ ছাড়ছে বলে যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন—

বাধা দিয়ে নির্মাল্য মিশ্র বললেন : তাহলে জাহাজ ছাড়বার আগে আমাদের খেয়ে নেওয়া উচিত হয়নি' বলছেন ! জাহাজ যদি আজ না ছাড়ে ? তাহলে কি আপনি খাবেন না ভেবেছিলেন ?

বিপদের কথা !

বিপদের কিছু নেই । আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন ।

ডাক্তার মৈত্র বললেন : তাড়া কিছুই ছিল না, আমরা নিজেদের মর্জি মাফিক খেতাম ।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আমি আমার মর্জি মাফিক খেয়েছি । আর আপনাকে তো আমি জোর করে টেনে নিয়ে যাই নি ! আপনাকে দেখেই আমি গিয়েছিলাম । আপনি নিজের ইচ্ছেতেই খেতে গিয়েছিলেন ।

ডাক্তার মৈত্র বুঝতে পারছিলেন যে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে তর্কে এঁটে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় । তাই বললেন : না মশাই, আপনার সঙ্গে—

আবার মশাই বলছেন !

তবে কী বলব ?

বলেছি তো, মহাশয়া বলবেন। তা না হলে মিস মিশ্র বলবেন। আর তেমন ইচ্ছা করলে নির্মাল্যও বলতে পারেন।

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ আপনাকে একেবারে নাম ধরে ডাকব, সেটা যেন কেমন কেমন লাগে!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আপনাকেও হিমাংশু বলে ডাকতে আমারও একটু সঙ্কোচ বোধ হবে। তবে আপনাকে আমি ডাক্তারবাবু বলতে পারি।

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ তা স্বচ্ছন্দে পারেন।

তারপরেই বিমর্ষভাবে বললেন ঃ কিন্তু আপনাকে তো উকিলবাবু বললেও আপনি চটে উঠবেন।

তা চটবই তো!

ডাক্তার মৈত্র হতাশভাবে বললেন ঃ কী মুশকিল বলুন তো!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ মুশকিল ভাবছেন বলেই মুশকিল। তা না হলে মহাশয়া বলতে আপনার আপত্তি কী!

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ মহাশয়া তো কেউ বলে না! তার চেয়ে ম্যাডাম বলা ভাল।

না না, ম্যাডাম বলবেন না।

কেন?

কেমন যেন ড্যাম ড্যাম শোনায়।

ডাক্তার মৈত্র এবারে চটে উঠে বললেন ঃ তবে আপনাকে আমি কী বলে ডাকব?

নির্মাল্য মিশ্র গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ কমরেড বলুন।

ডাক্তার ভয়ে ভয়ে বললেন ঃ সে কি মশাই, আপনি আবার দলাদলির মধ্যে আছেন নাকি!

দলাদলি মানে?

আপনি তো বিপজ্জনক লোক মশাই!

আবার আপনি মশাই মশাই করছেন!

এই সময়ে বাদল এসে উপস্থিত হল। কিছু সন্দেহ করে তাড়াতাড়ি বলে উঠল ঃ এ বেশ ভালো হল নির্মাল্যদি। সকালবেলায় গঙ্গাসাগর দেখতে পাওয়া যাবে।

ডাক্তার মৈত্র চটে উঠে বললেন ঃ তুমি আবার গঙ্গাসাগরের কথা এনে ফেললে কেন?

নির্মাল্য মিশ্র তার মুখের হাসি গোপন করে বললেন ঃ তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই বাদল !

বাদল একটা কৌতুকের আভাস পেয়ে বলল ঃ কী হয়েছে ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ তুমি তো আমাকে ডাক্তারবাবু বলেই খালাস। কিন্তু আমি এঁকে উকিলবাবু বলতে পারি !

বাদল হেসে বলল ঃ আমার মতো নির্মাল্যদি বলুন না !

অ্যাঁ ! দিদি বলব ! কিন্তু আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট না !

বাদল বলল ঃ তা ছোট বোনকেও তো দিদি বলা যায় !

তারপরেই বলল ঃ আজকের রাতটা থাক। কাল ভেবে দেখা যাবে।

সেই ভাল।

বলে ডাক্তার মৈত্র খানিকটা দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন।

বাদল যে খবরটা দিতে এসেছিল, এইবারে তা বলল ঃ আমাদের জাহাজ ছাড়ছে।

জোয়ার এসে গেছে !

সে তো প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আগেই এসেছে। জাহাজের গায়ে কলকল-ছলছল শব্দ শুনতে পাননি ?

না তো !

অনেক ওপরে আছেন তো, তাই শুনতে পান নি। নিচে জাহাজ ছাড়ার জোর তোড়জোড় চলছে। রাতে ঘুমিয়ে সকালে যখন চোখ মেলব, তখন হয়তো আমরা ডায়মণ্ড হারবার বা কাকদ্বীপে পেঁাছে গেছি। তাই বলছিলাম, খুব ভাল সময়ে জাহাজ ছাড়ছে।

বাদলকে এখন ভারি খুশি-খুশি দেখাচ্ছে। সবাইকে নিয়ে যাবার জন্য গত একমাস ধরে সে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। অফিস ফাঁকি দিয়েছে, ছুটি নিয়েছে মাঝেমাঝেই। তারই সব দায়িত্ব। ভালোর জন্য ধন্যবাদ না পাক, গাল শুনবে মন্দর জন্য। তার পক্ষ নিয়ে কেউই হয়তো নড়বে না। তবু সে এখন নিশ্চিন্ত মনে যাত্রার আনন্দ উপভোগ করছে পরিপূর্ণভাবে। পরিশ্রম তার সার্থক হয়েছে।

রাত দশটার পরেই জাহাজ ছাড়ল। ধীর মন্থর তার গতি। বেশ দুলছে শুধু। মনে হচ্ছে, একটুও এগোচ্ছে না। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে অন্ধকারের মধ্যে বাতিগুলো যেন পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে।

এক সময়ে সেই জোনাকির ঝাঁকের মতো বাতি কমে এল। বোঝা গেল যে কলকাতা শহর বিদায় দিল এই জাহাজকে। যাত্রীরা এখন ঘুমোতে যাবে।

॥ পাঁচ ॥

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে যাত্রীরা অবাক হয়ে গেল। জাহাজ এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জানা গেল যে কলকাতা থেকে দশ বারো মাইল আসবার পরে জাহাজ আর এগোতে পারেনি। কেন এগোতে পারেনি, তা জানা গেল না। এমনি করে কতক্ষণ থেমে থাকবে তাও কেউ জানে না।

নির্মাল্য মিশ্র তাঁর কেবিনে একাই ঘুমিয়ে ছিলেন। অন্য বার্থে কোন যাত্রী ছিলেন না। কেবিনে আর কোন মহিলা যাত্রী একা যাচ্ছিলেন না বলেই বোধহয় তিনি একা একখানি কেবিনের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু ডাক্তার মৈত্রর সে সুবিধা হয়নি। তাঁর সঙ্গে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ছিলেন। বাদল তাঁর জন্যেও একখানি স্বতন্ত্র কেবিনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা পেতে হলে তিনশো চুয়ান্ন টাকা ভাড়া দিয়ে এর উপরের তলায় ডিলাক্স কেবিনে উঠতে হত। ডিলাক্সে একটা ড্রয়িং রুমও আছে। স্টেট রুম আছে তিন ক্লাসের—এ, বি ও সি। এর ভাড়া তিনশো এগারো টাকা। ডিলাক্সের মতো তার অ্যাটাচ্‌ড্ বাথরুম। বি-তে দুখানা করে বার্থ। আর কমন বাথরুম। ভাড়া দুশো ষাট টাকা। সি-তে চার বা ছখানা বার্থ। ভাড়া দুশো সাত টাকা। বাদল নিজের বুদ্ধিতেই বি কেবিন ভাড়া করেছিল দুজনেরই জন্য। আর বলে দিয়েছিল যে যাত্রীদের একজন মহিলা, তাঁকে যেন কোন পুরুষের সঙ্গে দেওয়া না হয়। তাই নির্মাল্য মিশ্র একা থাকলেও ডাক্তার মৈত্রকে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে রাত কাটাতে হয়েছিল।

ঘুম থেকে ওঠার পরে জাহাজ থেমে আছে দেখে নির্মাল্য মিশ্রর মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একাই এক জায়গায় বসেছিলেন চুপ করে। আর খানিকটা তফাতে ডাক্তার মৈত্র অন্য দিকে ফিরে চুরুট টানছিলেন। এখন তাঁর পাশে বসে আছেন সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। মুখে গোঁফ দাড়ি আর মাথায় পাগড়ি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি শিখ। কিন্তু কথা বলছেন না কেউই। কতকটা ইংরেজ যাত্রীর মতো হাব-ভাব। অমনভাবে পাশাপাশি

বসে আছেন। অথচ কেউই কারও সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন না। নির্মাল্য মিশ্র তাঁদের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন, তারপর হাসলেন একটুখানি।

ঠিক এই সময়ে বাদল উপরে এসে নির্মাল্য মিশ্রর হাসি দেখতে পেল। প্রসন্ন হয়ে বলল: একা বসে হাসছেন যে নির্মাল্যদি?

মুখ ফিরিয়ে নির্মাল্য মিশ্র বাদলকে দেখতে পেয়ে বললেন: আগে বোসো। তারপরে বলছি।

বাদল এসে তাঁর পাশের চেয়ার-খানায় বসল। বলল: বলুন এবারে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: অনেক দিন আগের পড়া একটি ইংরেজী নাটকের কথা মনে পড়ে গেল। আর সেই জন্যেই হাসলাম।

বলুন না গল্পটা।

সবটাতো মনে নেই, শুধু একটা দৃশ্য মনে পড়ছে।

তাই বলুন।

একটি ইংরেজ দম্পতি একটি জাহাজে বসে আছেন। কিন্তু পাশাপাশি নয়।

তবে?

চেয়ার দুটি এমন করে রেখেছেন যে পিঠে-পিঠ দিয়ে তাঁরা বসেছেন, আর নিঃশব্দে কফি খাচ্ছেন। দুজনের হাতেই খবরের কাগজ। একখানা কাগজেরই-দুটো পাতা।

তারপর?

স্বামী তাঁর হাতের পাতাখানা পড়া হয়ে গেলে পিছনে এগিয়ে দিলেন। আর স্ত্রী সেখানা হাতে নিয়ে নিজের পাতাখানা দিলেন স্বামীর হাতে। কিন্তু কেউ কোন কথা বললেন না।

তারপর?

তারপর আবার নিঃশব্দে সময় কাটতে লাগল। এক সময়ে নিজের কফির পেয়ালা শেষ হতে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, মোর কফি? স্বামী উত্তর দিলেন, নো থ্যাংকস্। ব্যস, আর কোন কথাবার্তা নেই।

বাদল প্রথমে হেসে উঠল, তারপরে বলল: এ গল্প আপনার কেন মনে পড়ল নির্মাল্যদি?

নির্মাল্য মিশ্র কোন উত্তর না দিয়ে আড় চোখে দেখিয়ে দিলেন ডাক্তার মৈত্রকে।

বাদল বলল ঃ উনি তো একা !

একা কোথায় ?

বাদল আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ এই যে শিখ ভদ্রলোক ওঁর পাশে বসে আছেন, ওঁকে তো কাল থেকেই বার বার ওঁর কেবিনে ঢুকতে ও বেরোতে দেখছি। রাতে নিশ্চয়ই একসঙ্গে ছিলেন !

সত্যি নাকি ?

সত্যি বলেই তো মনে হচ্ছে।

তবে একটু দেখে আসি ডাক্তার-বাবুকে।

বলে বাদল উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র তার হাত টেনে ধরে বসিয়ে দিলেন। বললেন ঃ যেও না ঐ বাঘের মুখে। কোন কারণে ওঁর মেজাজটা এখন খুব খারাপ আছে।

একটু থেমে বললেন ঃ তার চেয়ে নিচে চল। তোমাদের ব্যবস্থা একবার দেখে আসি।

বলে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন।

বাদল খুশী হয়ে বলল ঃ আপনাকে তাহলে পাতালে নামতে হবে।

পাতালে !

কতটা উঠেছিলেন মনে নেই ! অতটাই নামতে হবে।

বলে তাঁকে সিঁড়ির কাছে নিয়ে গেল। তারপর বলল ঃ খুব সাবধানে নামুন আমার পেছনে।

এক তলা নিচে নেমে বলল ঃ এইটাকে আপনি গ্রাউণ্ড ফ্লোর বলতে পারেন। এই তলায় কুলি খালাসিরা আছে। আর আমরাও আছি সারাক্ষণ।

কেন ?

বাদল হেসে বলল ঃ বললাম তো, আমরা পাতালবাসী। খোলা হাওয়ার লোভেই আমরা এইখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর আমাদের ক্যাণ্টিনও এইখানে।

তারপর বাদল তাঁকে আরও নিচে নিয়ে গেল। জাহাজের খোলের ভিতরে এই-তলা। বাঙ্ক যাত্রীরা এইখানেই রাত কাটিয়েছে। একসঙ্গে চল্লিশ-পঞ্চাশটা বাঙ্ক, রেলের মতো একখানার উপরে আর একখানা। কিন্তু যাত্রীর সংখ্যা এর চেয়ে ঢের বেশি বলে নির্মাল্য মিশ্র বাদলের দিকে তাকালেন।

বাদল বলল : ভাবছেন, এই ক'খানা বাঙ্কে এত যাত্রী ঘুমলো কেমন করে! আসুন তাহলে।

বলে নির্মাল্য মিশ্রকে সামনের দিকে ডেকে নিয়ে গেল।

নির্মাল্য মিশ্র দেখলেন যে এখানেও ঐ একই রকম ব্যবস্থা। আরও চল্লিশ পঞ্চাশজন এখানে থাকতে পারে। আরও কিছুটা এগিয়ে উপরে উঠবার সিঁড়িও দেখা গেল একটা।

বাদল তাঁর কৌতূহল দেখে হেসে বলল : এই খোলের ভেতরে এই রকমের সেক্টর আছে কুড়ি-বাইশটি। আর ওপরে ওঠা-নামার জন্যে ছ-সাতটা সিঁড়ি। সিঁড়ির ধারে বাঙ্ক পেলে খুব সুবিধে।

কেন?

পায়খানা-বাথরুম তো সব ওপরে, খাবার জায়গাও ওপরে। সিঁড়িটি কাছে হলে ওঠা-নামার ভারি সুবিধে হয়।

নির্মাল্য মিশ্রর বেশ গরম বোধ হচ্ছিল। বাদল তা লক্ষ্য করে বলল : এইটেই শুধু অসুবিধে।

উপরের পাখা দেখিয়ে বলল : পাখার হাওয়াতেও ভেতর ঠাণ্ডা হয় না।

তারপর এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে একটা ব্লোয়ার দেখাল। উপর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া ব্লো করে নিচে পাঠাবার ব্যবস্থা। কিন্তু তাতেও ভিতরের গুমোট কাটছে না।

বাদল বলল : অনেকগুলো পোর্ট হোল আছে, কিন্তু সেগুলো খোলা যায় না।

নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে এরা কম পয়সায় কিছুটা কষ্ট স্বীকার করেই যাচ্ছে। আনন্দ শুধু সমুদ্র যাত্রার, আর নতুন দেশ দেখার। সেইটেই সত্যিকার আনন্দ। সেই আনন্দের কাছে এই কষ্টকে তারা কষ্ট বলে ভাবছে না।

ফেরার পথে বাদল বলল : এই জাহাজে অনেক পুরনো যাত্রী আছে। তাদের একজনের কাছে শুনলাম যে আন্দামান থেকে মাদ্রাজে যাওয়া অনেক আরামপ্রদ।

কেন?

বাঙ্কের ব্যবস্থা অনেক ভাল স্টেট অফ হরিয়ানায়। গরমের কষ্ট নেই। আরও অনেক সুবিধে আছে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ভাল।

তারপরে বলল ঃ ভদ্রলোক যা বললেন, সে সব সত্যি হলে তো পোয়া-বারো। আমাদের জন্যে একটা ইকনমি ক্লাসও আছে। আর আছে সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থা—এক একদিন এক এক ক্লাসে। তারপরে নানা রকমের খেলার ব্যবস্থা, ছোটদের আনন্দের ব্যবস্থা—এই সব। আমাদের এই জাহাজটা বৃটিশ হলে কি হবে, একেবারে সেকেলে ধরনের বলে হরিয়ানাকে স্বর্গ বলে মনে হবে।

উপরে উঠে বাদল বলল ঃ এখানে সুবিধে এই একটাই। সারাক্ষণ ওপরে থাকলে কেউ বাধা দেবে না। অনেকে তো রাতে খোলা আকাশের নিচে ঘুমিয়েছেন। এরও ওপরে, কেবিনের ক্লাসেও আমরা যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারি।

খানিকটা গৌরব বোধ করতে দেখা গেল বাদলকে।

নির্মাল্য মিশ্র এটুকু লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমাদের ওপরে কিছু নেই ?

বাদল বেশ আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ সেকি নির্মাল্যদি, ওপরটা আপনি দেখেননি !

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ না।

আপনাদের ওপরে আরও কয়েক তলা আছে। প্রথমে ডিলাক্স কেবিন। তারও ওপরে জাহাজের অফিসারদের কেবিন।

তারপর ?

তারপরে কিছু আছে কিনা বলতে পারব না। তবে শুনেছি যে খোলের ভেতর থেকে একেবারে ওপর পর্যন্ত ছ-সাত তলা।

হাসতে হাসতে বাদল আরও বলল ঃ ডক থেকে প্রথমে উঠুন পাহাড়ে, তারপরে পাতালে নামুন, কিংবা স্বর্গে উঠে যান।

নির্মাল্য মিশ্রও হেসে বললেন ঃ বুঝেছি।

বাদল এবারে তাঁকে ক্যান্টিনে নিয়ে গেল। বলল ঃ এইটাই আমাদের খাবার জায়গা। খাবার জন্য অনেকেই সিজন কার্ড করেছে—যে কদিন জাহাজে থাকবে চার বেলা খাবার জন্যে।

কী খাওয়াবে ?

সকালে চায়ের সঙ্গে তিনটি বিস্কুট বা রুটি, বিকেলেও চা বিস্কুট। দুপুরে ডাল ভাত তরকারি, আর মাছ মাংস বা ডিমের যে কোন একটা। রাতে ভাত বা রুটি।

তারপর বলল ঃ আপনাদের সিজন কার্ড তো পঁয়তাল্লিশ টাকার !

আপনাদের খাবার নিশ্চয়ই খুব ভাল। সেই ভদ্রলোক বলছিল যে হরিয়ানায় চার্জ কিছু বেশি, কিন্তু খাওয়াটা এখানকার চেয়ে ভাল।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আমরা তো সিজন কার্ড কাটিনি। আমাদের কী ব্যবস্থা হবে?

বাদল সবিনয়ে বলল : কাল কার্ড করেন নি?

কাল আমার সঙ্গে খাবার ছিল।

বাদলের আপশোসের যেন সীমা রইল না। বলল : আমার ভুলের জন্যেই এইরকম হল নির্মাল্যদি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : তার জন্যে আপশোস করবার কী আছে!

বাদল বলল : রোজ পয়সা দিয়ে খেলে আপনার অনেক বেশি খরচ পড়ে যাবে।

খরচ করবার জন্যেই তো বেরিয়েছি বাদল! অত হিসেব করে খরচ করতে কি ভাল লাগে! যেদিন যা ইচ্ছে করবে, তাই খাব। ওদের পছন্দ মতো খাব কেন!

বাদল বলল : তাহলে একটা কাজ করুন।

কী?

ডেইলি মীল টিকিট কাটবেন। তাতেও অনেক কম খরচ হবে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আমার জন্যে আর তোমাকে ভাবতে হবে না বাদল, জাহাজে আমার নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারব।

বাদল বলল : কিন্তু জাহাজের চা খেতে পারবেন না।

কেন?

চা খাচ্ছেন না বিষ, তা বুঝতে পারবেন না।

মানে?

অখাদ্য। তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ পয়সার চা-ও অখাদ্য।

বলতে বলতে বাদল তাঁকে ডেকের এক ধারে টেনে নিয়ে এল। নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে বাদলের দলবল সেখানে চায়ের আয়োজন করছিলেন। নির্মাল্য মিশ্রকে দেখে সবাই খুশী হয়ে উঠলেন। সবচেয়ে বেশি খুশী হল বিন্দু। সে লাফিয়ে উঠে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে ছুটে এল। সদানন্দবাবু বললেন : আসুন আসুন।

বলে বসবার জায়গা একটা দেখিয়ে দিলেন।

এই দলের সঙ্গে পাঁউরুটি মাখন আছে, বিস্কুট ডালমুট আছে, চা কফিও

আছে। ক্যান্টিন থেকে গরম জল নিয়ে চায়ের পাতা ভিজিয়ে সবাই পাঁউরুটি খাবার উদ্যোগ করছিলেন। তারাপদর দিদি এক পিস পাঁউরুটি নির্মাল্য মিশ্রর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ হাতে হাতেই খেতে হবে ভাই, বাসনপত্র আমাদের নেই।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বাসনপত্র তো খাব না দিদি, যা দিচ্ছেন তাই খাব।

বলে এমন সহজভাবে তা নিলেন যেন তিনিও এই দলেরই একজন।

বাদল বলল ঃ আমি তাহলে ডাক্তারবাবুকে একবার দেখে আসি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তোমার সাহস তো খুব।

কেন?

তা না হলে বাঘের মুখে যাবার জন্যে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছ!

বিন্দু খিল খিল করে হেসে বলল ঃ সুন্দরবনের বাঘ নাকি নির্মাল্যদি?

নির্মাল্য মিশ্রও হেসে বললেন ঃ ভাগ্যিস ঐ সিংহ মশাই ছিলেন, তাই রক্ষে। তা না হলে আমাকে হয়তো খেয়েই ফেলতেন। কাল সারা রাত আমি দক্ষিণ রায়ের নাম জপ করেছি।

বিন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ সিংহ মশাই কে?

বাদলের হাত ধরে তারাপদ তাকে বসিয়ে দিয়েছিল। তাই বাদল কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল ঃ এক শিখ ভদ্রলোক আছেন ডাক্তারবাবুর কেবিনে।

কিন্তু বিন্দু জিজ্ঞাসা করল ঃ দক্ষিণ রায় আবার কে নির্মাল্যদি?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ দক্ষিণ রায়কে চেনো না, অথচ সুন্দরবনের দিকে চলেছ নির্ভাবনায়! দক্ষিণ রায়ের পুজো দিয়ে যে এ পথে যাত্রা করতে হয়।

বিন্দু এবারে নির্মাল্য মিশ্রর একেবারে কাছে ঘেঁষে এসে বলল ঃ গল্পটা বলুন না নির্মাল্যদি!

নির্মাল্য মিশ্র হাসলেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না।

বিকাশ আর ভানু এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। এইবারে কতকটা একই সময়ে দুজনেই নির্মাল্য মিশ্রকে গল্প বলার অনুরোধ জানাল। বিকাশ বলল ঃ দক্ষিণ রায়ের নাম শুনেছি, কিন্তু তিনি কে তা জানিনে।

আর ভানু বলল ঃ দক্ষিণ রায়ের আবার পুজো কিসের!

নির্মাল্য মিশ্র সবার দিকেই চেয়ে দেখলেন একবার। সবাই উৎসুক

হয়েছে গল্প শুনতে। তারাপদর দিদি একটা প্লাস্টিকের গেলাস এগিয়ে দিয়ে বললেন : নিন ভাই, চায়ে চুমুক দিয়ে আপনার গল্পটা শুরু করুন।

নির্মাল্য মিশ্র গেলাস হাতে নিয়ে বললেন : সুন্দরবন যে দক্ষিণ রায়ের রাজত্ব তা জানো তো ?

বলে বাদলের দিকে তাকালেন।

বাদল বলল : দক্ষিণ রায় কে ?

দক্ষিণ রায় হলেন বাঘের দেবতা। আর দেবতাদের মধ্যে তিনিই হলেন সবচেয়ে প্রিয় দেবতা।

বিন্দু বলে উঠল : দেবতার নাম দক্ষিণ রায় ?

দক্ষিণের রাজা তিনি। সুন্দরবনের অধিবাসীরা তাঁর পুজো না করে কখনও বনে ঢুকবে না। ঢুকলেই বিপদ।

কেন ?

বাঘে খেয়ে ফেলবে।

আর পুজো দিয়ে ঢুকলে বাঘে খাবে না ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : কী করে খাবে! রাজার অনুমতি নিয়ে ঢুকেছে তো, প্রজারা তাকে খাতির না করে খেয়ে ফেলতে পারে!

সদানন্দবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন : খুব ঠিক কথা।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : কিন্তু বিপদ বাঁধিয়েছে সুন্দরবনের মুসলমান অধিবাসীরা।

কেন ?

তারা আর এক দেবতার আমদানি করেছে। তাঁর নাম হল গাজী সাহেব। এই গাজী সাহেবের সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের একবার তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। একদিকে দক্ষিণ রায় ও তাঁর বাহন হীরা বাঘ, অন্য দিকে গাজী সাহেব ও তার বাহন দাউদা। সুন্দরবনের সমস্ত বাঘ দুদলে ভাগ হয়ে দুজনের পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করল : ওরা যুদ্ধ করল না ?

কী করে করবে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে। হুকুম না পেলে প্রজারা কী করে যুদ্ধে নামে!

তারাপদর দিদি একে একে সবার হাতেই রুটি আর চা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সদানন্দবাবু তাঁর চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন : ঠিক কথা।

কে জিতল ?

বলে বিন্দু নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে তাকাল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ হারজিৎ তো পরের কথা। দুই দেবতার যুদ্ধ দেখে গোটা সুন্দরবনটা কেঁপে উঠল। মনে হল যে দেশটা বুঝি সমুদ্রের নিচেই চলে যাবে। ঠিক এমনি সময়ে দেখা দিলেন অর্ধকৃষ্ণ পয়গম্বর। দুজনের মাঝখানে এসে যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন। বললেন, সুন্দরবনে দুজনেরই পুজো হবে। হিন্দুরা দক্ষিণ রায়ের পুজো করবে, আর মুসলমানরা মানবে গাজী সাহেবকে।

তারপর ?

তারপর আর কী! সেই থেকে আর কোন বিবাদ নেই। এক দেবতাকে মানলেই হল। সুন্দরবনের বাঘ আর কারও ক্ষতি করবে না। কিন্তু তার আগে—

বলেই নির্মাল্য মিশ্র থামলেন।

বাদল বললঃ তার আগে ?

খবরের কাগজে পুরনো দিনের কথা পড়নি ?

না।

একশো বছরেরও বেশি আগে সংবাদ প্রভাকরে গঙ্গাসাগর মেলার খবর বেরোত—এক মেজর সাহেব এক দল সেনা নিয়ে সারাক্ষণ তোপ দাগার জন্যে এবারে বাঘের ভয় খুব বেশি ছিল না। শুধু তিনজন নাবিক ও পঞ্চাশজন গঙ্গাসাগর যাত্রী বাঘের পেটে গেছে। তার ওপরে আছে অজগর কুমীর আর নৌকাডুবি।

সদানন্দবাবু বললেনঃ সর্বনাশ!

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ সুন্দরবনের বাঘ সেদিন সত্যিই মানুষের বিভীষিকা ছিল। প্রাণ হাতে নিয়ে যেতে হত গঙ্গাসাগরে।

তারাপদর দিদির কানে কী একটা কথা ফিসফিস করে বলেই বিন্দু হেসে উঠল। আর তারাপদর দিদিও মুখ টিপে হাসলেন।

বাদল ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ কী হয়েছে দিদি ?

দিদি বললেনঃ ওকেই জিজ্ঞেস কর।

কিন্তু বিন্দু সে কথা বলতে চাইল না।

বাদল বললঃ নিশ্চয়ই একটা মজার কথা বলেছে।

দিদি বললেনঃ একজনের নাম দিয়েছে দক্ষিণ রায়।

আমার নাম ?

তোমার নাম তো হীরা!

বলে দিদি হাসলেন।

হা-হা করে হেসে উঠল তারাপদ। বলল: খুব ভাল নাম দিয়েছে বিন্দু। দক্ষিণ রায়ের বাহন হীরা বাঘ।

বিকাশ আর ভানুও হাসল প্রবলভাবে। তারপর বিকাশ বলল: যাও হে হীরা, তোমার দক্ষিণ রায়কে এবারে দেখে এসো।

কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল নির্মাল্য মিশ্রর মুখ। গল্প বলা তাঁর সার্থক হয়েছে। গত রাত্রির অপমানের তিনি উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পেরেছেন। বললেন: আপনাদের চা সত্যিই ভাল।

তারাপদর দিদি বললেন: তাহলে আর একটু চা নিন।

॥ ছয় ॥

জাহাজ এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে বলে নির্মাল্য মিশ্রর ভাল লাগছিল না। এও ঠিক ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকার মতো বিরক্তিকর ব্যাপার। কেন দাঁড়িয়ে আছে, কিসের জন্য, তা কেউ জানে না। কার কাছে জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে, তাও কারও জানা নেই। হয়তো সব জাহাজই এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকে। তা না হলে চার পাঁচ দিন সময় লাগবে কেন!

চুপ করে বসে থাকতে নির্মাল্য মিশ্রর ভাল লাগে না। তাড়াতাড়িতে কোন বইপত্র আনবার কথা মনে পড়েনি। ভেবেছিলেন যে চারিদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতেই সময় কেটে যাবে। বই পড়ে এই জলপথের একটা মোটামুটি ধারণা তাঁর ছিল। ভেবেছিলেন যে চোখে দেখে তা মিলিয়ে নেবেন। কিন্তু এই সুন্দর সকালটা এক জায়গায় দাঁড়িয়েই কাটাতে হচ্ছে। বাইরে বসে একই দৃশ্য দেখতে আর ভাল লাগছে না।

নতুন কোন যাত্রীর সঙ্গে তিনি কথা বলতে চাইছিলেন না। ডাক্তার মৈত্রর কথা তাঁর মনে আছে। নিজে থেকে কারও দিকে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আর মহিলা বলে কেউ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে না। জাহাজে মহিলা আরও অনেক আছেন। কিন্তু তাঁরা স্বামী ও সন্তানদের নিয়েই ব্যস্ত। হয়তো তাঁরা আন্দামানেরই অধিবাসী। কিংবা সেখানেই বসবাস করতে যাচ্ছেন কিছুদিনের জন্য। সরকারী কর্মচারী নাকি অনেক আছেন। ছুটিতে তাঁরা যাতায়াত করেন। বদলিতেও যান। কিছুদিন কাজ করে আবার ফিরে আসেন।

একটু বেলা হতেই নির্মাল্য মিশ্র স্নান সেরে নিলেন। জাহাজে জলের অভাব নেই। স্নান করে তাঁর বেশ আরাম হল। ক্যান্টিনে গিয়ে খেয়েও নিলেন। তারপর বাইরে এসে আন্দামানের সেই বইখানা খুলে বসলেন।

দু একটা পাতা পড়বার পরেই মনে হল যে ভাতের একটা নেশা আছে। একটু ঘুম-ঘুম ভাব আসছে। তবু তিনি জোর করে পড়বার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গঙ্গার শীতল বাতাসে চোখের পাতা যেন বুঁজে আসছে। বইখানা মুড়ে তিনি খানিকক্ষণ বসে রইলেন। তারপর উঠে নিজের কেবিনে এসে শুয়ে পড়লেন।

নির্মাল্য মিশ্র যে এইভাবে ঘুমিয়ে পড়বেন, তা ভাবতেও পারেন নি। একবার জেগেছিলেন। তারপর পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। কখন বেলা পড়ে গেছে, অন্ধকার নেমেছে কখন, তা বুঝতে পারেন নি। বোঝবার উপায় ছিল না। কেবিনের ভিতরে অন্ধকার ছিল, আর পাখার বাতাস বেশ মিষ্টি মনে হচ্ছিল। তাই জেগেও খানিকক্ষণ শুয়ে রইলেন।

হঠাৎ মনে হল যে জাহাজ দুলছে। অনেকক্ষণ থেকেই দুলছিল। সে দিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। জাহাজ যে চলতে শুরু করতে পারে, এ কথা তাঁর একবারও মনে হয়নি। মনে হতেই লাফিয়ে উঠে পড়লেন। বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিলেন। শাড়িটা ঠিক করে মাথা আঁচড়ে বেরিয়ে এলেন কেবিন থেকে। আর বাইরে এসেই বিস্ময়ে পুলকিত হয়ে উঠলেন।

জাহাজ চলছে। ধীরে ধীরেই চলছে। নির্মাল্য মিশ্রর মনে হল যে মানুষ বোধহয় পায়ে হেঁটেও এর চেয়ে তাড়াতাড়ি চলে। তবু জাহাজ চলছে। সেই পুরনো দৃশ্য এখন আর নেই। কিন্তু অন্ধকারে নতুন দৃশ্যও ভাল দেখা যাচ্ছে না।

এক নজরে ডাক্তার মৈত্রকে নির্মাল্য মিশ্র দেখে নিলেন। এবারে তিনি শিখ ভদ্রলোকের কাছ থেকে খানিকটা দূরে বসেছেন। আর সামনের দিকে চেয়ে চুরট টানছেন। নির্মাল্য মিশ্র খানিকটা দূরে সরে গিয়ে বসলেন। তারপর নিজের মনেই একটুখানি হাসলেন।

নির্মাল্য মিশ্রর মনে হল যে ডাক্তার মৈত্রর কথা তিনি ভুলতে পারছেন না। ঐ কঠিন মানুষটা তাঁর প্রচ্ছন্ন মনে যেন সারাক্ষণ হানা দিচ্ছে। তাঁকে ভোলবার চেষ্টা করেও ভোলা যাচ্ছে না। এই ভুলে থাকবার চেষ্টাই যেন মানুষটাকে সারাক্ষণ মনের সামনে ধরে রাখছে। মনে মনে নির্মাল্য মিশ্র বললেন, আর না। ডাক্তারের কথা আর তিনি ভাববেন না।

কিন্তু ডাক্তার মৈত্রও যে তাঁর কথাই ভাবছিলেন, নির্মাল্য মিশ্র তা ভাবতে পারেন নি। একসময়ে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে ভদ্রলোক বেশ প্রসন্ন মুখে তাঁর পাশে এসে বসলেন। বললেন ঃ আপনি কি আমার ওপরে রাগ করে আছেন ?

আমি ?

হ্যাঁ, আপনি !

আমি আপনার ওপরে রাগ করতে যাব কেন !

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ আমিও তো সেই কথাই ভাবছি !

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তবে রাগ করেছি ভাবলেন কেন ?

মানে—

বলুন !

মানে, সারাদিন তো আপনাকে দেখতে পেলাম না ! সকালে বেরিয়ে কোথায় চলে গেলেন, তারপরে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল—

নির্মাল্য মিশ্র খুশী হলেন এই কথা শুনে। একটুখানি হাঁসতে গিয়েই কাশি এসে গেল।

ডাক্তার মৈত্র খুব বিচলিত হয়ে বললেন ঃ চুরটের ধোঁয়ায় আপনার কাশি আসছে, তাই না ?

বলেই হাতের চুরটটা গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

নির্মাল্য মিশ্র চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ না না, চুরটের ধোঁয়ায় নয়, একটু বিষম লেগে যাচ্ছিল।

বিষম ! বিষম লাগবে কেন ? এখন কি আপনার কথা কেউ ভাবছে ?

কী জানি !

ডাক্তার মৈত্র যেন বিষণ্ণ হলেন খানিকটা, বললেন ঃ এখন আপনার কথা কে ভাবতে পারে ?

নির্মাল্য মিশ্র সকৌতুকে বললেন ঃ ভাববার লোকের কি আমার অভাব আছে !

অনেক কৌতূহল নিয়ে ডাক্তার মৈত্র তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন ঃ নতুন অ্যাড্ভোকেট হলে হবে কী ! মক্কেল আমার কম নেই !

মস্ত বড় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ তাই বলুন !

তারপরেই বললেন : তাহলে তো আমারও বিষম লাগা উচিত। রোগীর সংখ্যা আমারও কিছু কম নয়!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আপনি শুধু শুধুই চুরটটা ফেলে দিলেন!

ডাক্তার মৈত্র বললেন : করবার মতো কোন কাজ ছিল না বলেই তো চুরট ধরিয়েছিলাম! এখন আর ওটা ভাল লাগত না।

নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে ডাক্তার মৈত্র সত্যি কথাই বলছেন, তৈরি করে মিথ্যা বলার অভ্যাস তাঁর নেই। আর সত্য কথা বলার সময় কারও ভাল-মন্দ লাগার তোয়াক্কা যে তিনি করেন না, একদিনেই নির্মাল্য মিশ্র তা বুঝতে পেরেছেন। তাই বেশ নিশ্চিন্তভাবে প্রশ্ন করলেন : কতক্ষণ আপনি বাইরে বসে আছেন?

তা অনেকক্ষণ হল।

বলেই ডাক্তার মৈত্র ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন : বিকেলে তো আপনার চা খাওয়া হয়নি!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : তার জন্যে আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! চায়ের নেশা আমার নেই।

সে কি একটা কথা হল! আসুন আমার সঙ্গে।

বলে নির্মাল্য মিশ্রর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। যেন তাঁর এই হাত ধরেই নির্মাল্য মিশ্রকে উঠতে হবে।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র তাঁর হাত না ধরেই উঠে পড়লেন। বললেন : আমার জন্যে আপনি অনর্থক কষ্ট করছেন!

কষ্ট! কষ্ট কিসের!

বলতে বলতে ডাক্তার মৈত্র এগিয়ে চললেন। আর নির্মাল্য মিশ্র অনুসরণ করলেন তাঁকে।

ক্যান্টিনের চেয়ারে বসে ডাক্তার মৈত্র বললেন : এখানকার চা খেয়েছেন?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : না।

জাহাজের চা আপনি কিছুতেই খেতে পারবেন না।

কেন, বিষ নাকি?

ডাক্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন : কী করে জানলেন?

বাদল তাই বলছিল বটে।

বলছিল তো! বলবেই। তার চেয়ে কফি খাওয়া যাক, কী বলেন?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : সেও বিষ হবে না তো?

দেখাই যাক না।

বলে ডাক্তার মৈত্র কফির অর্ডার দিলেন। আর তার সঙ্গে ভাল পেস্ট্রি বা কেক।

তার পরেই নির্মাল্য মিশ্রর দিকে ফিরে বললেন: ডিনারের অর্ডারও এই সময়ে দিয়ে রাখা ভাল। আপনি মুর্গি খান তো?

খাই।

তাহলে মুর্গির রোস্ট্ উইথ বয়েল্ড্ ভেজিটেব্ল্স দিতে বলি। কেমন?

সেই ভাল।

রাতে ভাত খান, না রুটি?

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন: রোস্টের সঙ্গে রুটিই ভাল লাগবে।

কিংবা পাঁউরুটি?

তাও চলতে পারে।

আর একটা ভাল সুইট ডিশ চাই। পুডিং বা আইসক্রীম। কী বলেন?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আপনি দেখছি মেয়েদের চেয়েও ভাল মেনু বলতে পারেন!

বলেই দেখতে পেলেন যে ডাক্তার মৈত্র সগৌরবে তাকালেন তাঁর দিকে। খুব খুশি খুশি ভাব। যেন একটা গোপন অভিযানে সফল হয়েছেন তিনি। বললেন: একা থাকতে হলে সব দিকেই নজর দিতে হয়।

নির্মাল্য মিশ্র সকৌতুকে বললেন: তাইতো দেখছি।

এইসময়ে তাঁদের কফি এল, আর কেক। ডাক্তার মৈত্র কেকের প্লেট এগিয়ে দিলেন নির্মাল্য মিশ্রর দিকে। বললেন: সকালে সেই কখন খেয়েছেন, নিশ্চয়ই খুব ক্ষিধে পেয়েছে!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আপনি নিন।

আমি! আমি তো বিকেলেই খেয়েছি!

তবে আমি একা খাব নাকি?

ডাক্তার মৈত্র বললেন: দিন তাহলে।

বলে নিজেও এক পিস কেক তুলে নিলেন।

নির্মাল্য মিশ্র তাঁর পেয়ালাটি টেনে নিচ্ছিলেন। কিন্তু ডাক্তার মৈত্র হাঁ-হাঁ করে বাধা দিলেন। বললেন: করছেন কী!

থমকে থেমে গেলেন নির্মাল্য মিশ্র।

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ আমি আপনাকে কফি ঢেলে দিচ্ছি।

বলে নিজেই কফি তৈরির কাজে লেগে গেলেন।

নির্মাল্য মিশ্রর হঠাৎ নজর পড়ল বাইরের দিকে। দেখতে পেলেন, বাদল আর বিন্দু তাঁদের লক্ষ্য করছে মনোযোগ দিয়ে। পরম কৌতূহল তাদের দৃষ্টিতে, কৌতুকে মুখ উদ্ভাসিত। তাঁকে তাকাতে দেখেই দুজনে সরে গেল।

কিন্তু ডাক্তার মৈত্র তাদের দেখতে পাননি। কফির একটা পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ দেখুন তো সব ঠিক হয়েছে কিনা!

কফি শেষ করে দুজনে যখন বাইরে এসে বসলেন, অন্ধকার তখন আরও গভীর হয়েছে। মাঝে মাঝে দু একটা আলো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। শরৎ শেষ হয়ে হেমন্তের শুরু হয়েছে দিন কয়েক আগে। গঙ্গার বাতাসে শরীর এখন জুড়িয়ে যাচ্ছে। মনও প্রসন্ন।

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পর নির্মাল্য মিশ্র প্রশ্ন করলেন ঃ জাহাজ কখন ছেড়েছে বলতে পারেন?

ডাক্তার মৈত্র একটু ফাঁপরে পড়লেন। বললেন ঃ তাতো খেয়াল করিনি! কেন, জেনে আসব?

না না, তার দরকার নেই। আমি ভাবছিলাম, আমরা কত দূর এসেছি তা বোঝা যাচ্ছে না তো!

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ আমি এ দিকে কখনও আসিনি। তাই কিছুই চিনতে পারব না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আমিও কখনও আসিনি।

তারপরেই বললেন ঃ একবার গঙ্গাসাগরে যাব বলে বইপত্র পড়েছিলাম। আর খবরের কাগজে গঙ্গাসাগর যাত্রার কথা।

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ কিছু জানেন তো বলুন না!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আমরা চলেছি মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার সীমানা ধরে। এ ধারে ফল্‌তা পয়েন্ট, ওধারে দামোদর এসে গঙ্গায় মিশেছে। আর একটু এগিয়ে রূপনারায়ণ। মনে হয়, জলের তোড়ে গঙ্গাকে ঠেলে নিয়ে গেছে পশ্চিম থেকে পূর্বে। এই বাঁকের ওপরেই ডায়মণ্ড হারবার কি আমরা পেরিয়ে আসিনি?

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ টের পাইনি তো!

টের পান নি! গঙ্গা সেখানে মাইল তিনেক চওড়া। আর দৃশ্য নাকি অপরূপ।

ডাক্তার মৈত্র আপশোস করে বললেন: দেখুন তো কেলেঙ্কারি! আপনি রাগ করে রইলেন আমার ওপরে, আর আমার কিছু দেখাই হল না!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: সে জায়গার পুরনো নাম কী ছিল জানেন তো!

না।

পুরী যাবার পথে চৈতন্যদেব যখন সেখানে এসেছিলেন, তখন তার নাম ছিল হাজীপুর। ইংরেজ এসে বন্দর তৈরি করে নাম রেখেছিল ডায়মণ্ড হারবার।

তারপরে নির্মাল্য মিশ্র বললেন: সমুদ্রে পৌঁছবার আগে গঙ্গা আবার পশ্চিমমুখো হয়ে দক্ষিণে নেমেছে। পশ্চিম থেকে হলদি নদী যেখানে এসে মিলেছে, তারই উত্তরে হলদিয়া বন্দর। সে একটা উপদ্বীপের মতো।

ডাক্তার মৈত্র বললেন: আপনি তো অনেক খবর রাখেন দেখছি!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: গঙ্গাসাগরে যাবার জন্যেই এই খবর সংগ্রহ করেছিলাম। গাড়ি নিয়ে যাবার কথাও ভেবেছিলাম।

গাড়ি নিয়ে!

হ্যাঁ। কিন্তু নামখানার পরে আর গাড়ি যায় না। কলকাতা থেকে সোজা সড়ক ডায়মণ্ড হারবার ও কাকদ্বীপের ওপর দিয়ে নামখানায় পৌঁছেছে। সেখান থেকে সাগরদ্বীপে যেতে হয় নৌকো বা লঞ্চে বড়তলা খাঁড়ি পেরিয়ে। গঙ্গাসাগরের মেলা হয় সাগরদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে।

ডাক্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে নির্মাল্য মিশ্রর গল্প শুনছিলেন। বললেন: আমি ওদিকের কিছুই জানিনে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: ফ্রেজারগঞ্জ আরও দক্ষিণে, কিন্তু অন্য দ্বীপে। নামখানা থেকেই সেখানে যেতে হয়। ফ্রেজারগঞ্জ বকখালি—এ সব নাকি সুন্দর বেড়াবার জায়গা।

ডাক্তার মৈত্র বললেন: চলুন না, এবারের শীতে আমরাও বেড়িয়ে আসি।

নির্মাল্য মিশ্র কোন উত্তর না দিয়ে হাসলেন। তারপরে বললেন: আপনি একটা কথা শুনেছেন?

কী কথা?

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী নাকি এই সাগরদ্বীপেই ছিল?

তাই নাকি!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: সাগরদ্বীপের উত্তর দিকটা নাকি বনজঙ্গলে

পূর্ণ। গ্রামের লোকেরা কাঠ কাটতে আর মধু ও মোম সংগ্রহ করতে যায় সেই জঙ্গলে। বলে, সেই বনের ভেতর অনেক ভাঙা বাড়ি আর মন্দির আছে। মাটি খুঁড়ে নাকি মূর্তি আর তাম্রলিপি পাওয়া যায়। তাইতেই তারা মনে করে যে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল এইখানে।

ডাক্তার মৈত্র বললেন : কিছু বিচিত্র নয়, বুঝলেন!

তারপরেই বললেন : একবার আমরা দেখেই আসব।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আমার কী দেখবার ইচ্ছে জানেন?

না।

আমার একবার গঙ্গাসাগর মন্দির দেখবার ইচ্ছে।

খুব সুন্দর মন্দির বুঝি?

মোটেই তা নয়।

তবে?

দু রকম কথা শুনেছি! মন্দিরে তিনটি মূর্তি আছে। কেউ বলে, সেই মূর্তিগুলি কপিল মুনি ভগীরথ আর সমুদ্রের। আবার কেউ বলে, সমুদ্রের মূর্তি নেই, আছে সাগর রাজার, আর ভগীরথ আছেন মকরবাহিনী গঙ্গার কোলে।

ডাক্তার মৈত্র বললেন : তা হলে সত্যি ব্যাপারটা কী?

তাই দেখতেই তো যেতে চাই। তবে আমার কী মনে হয় জানেন?

কী?

বলে ডাক্তার মৈত্র নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে তাকালেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : পুরাণে বলে, পাতালে ছিল কপিল মুনির আশ্রম। কিন্তু আসলে তা নয়। এই গঙ্গাসাগরেই কপিল মুনির আশ্রম ছিল। এইখানেই সাগর রাজার দশ হাজার ছেলে তাঁর চোখের আগুনে ভষ্ম হয়ে গিয়েছিল। আর ভগীরথ হিমালয়ে তপস্যা করে গঙ্গাকে এনেছিলেন এইখানে। কাজেই গঙ্গাসাগরের মন্দিরে কপিল মুনি গঙ্গা ও ভগীরথের মূর্তি থাকাই উচিত।

ডাক্তার মৈত্র মাথা নেড়ে বললেন : ঠিক বলেছেন।

কিন্তু আজ আমার খুব দুঃখ হচ্ছে।

কেন?

অন্ধকারে এ সব কিছুই দেখতে পাব না।

বলে নির্মাল্য মিশ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ডাক্তার মৈত্র গম্ভীর হয়ে বললেনঃ দিনেরবেলায় একবার আমাদের আসতে হবে।

ঘন অন্ধকারে চারিদিক তখন একাকার হয়ে গিয়েছিল। কাছে ও দূরে কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আকাশে কি আজ চাঁদ ওঠেনি! না, চাঁদের আলোয় পৃথিবীর অন্ধকার এখানে ঘোচে না! সামনের দিকে চেয়ে দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

॥ সাত ॥

কেবিনের দরজায় ধাক্কা শুনে নির্মাল্য মিশ্রর ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসলেন তিনি। কত রাত হয়েছে বুঝতে পারলেন না। কিন্তু রাতে তাঁর দরজায় কে ধাক্কা দেবে!

নির্মাল্য মিশ্র নিজের চোখ রগড়ে নিলেন। তারপরে উঠে বাতি জ্বাললেন ঘরের। ঘড়ি দেখলেন। রাত শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু ভোর হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ দরজা খুলতে খানিকটা ভয় হল নির্মাল্য মিশ্রর। শাড়িখানা সামলে নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

এইবারে আরও জোরে কেউ ধাক্কা দিচ্ছে বলে মনে হল। আর একজনের গলাও শুনতে পেলেন। শিগগির দরজা খুলুন, আমি হিমাংশু বলছি।

হিমাংশু! ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র ডাকছেন নির্মাল্য মিশ্রকে!

নির্মাল্য মিশ্র লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। আর তাঁকে দেখতে পেয়েই ডাক্তার মৈত্র খুশিতে ভরে উঠে বললেনঃ কী ব্যাপার দেখুন!

বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন জাহাজের এক ধারে।

বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন নির্মাল্য মিশ্র। সামনে অকূল জল ছলছল করছে। উঠছে আর নামছে। কোনও দিকে তীর দেখা যাচ্ছে না, মাটি নেই কোন দিকে। পৃথিবীটা যেন একটা বিরাট সমুদ্র। আর এই জাহাজটাই একমাত্র প্রাণী।

নির্মাল্য মিশ্রর দিকে চেয়ে ডাক্তার মৈত্র বললেনঃ কেমন, ভাল লাগছে না?

কিন্তু এ কথার উত্তর দিলেন না নির্মাল্য মিশ্র। বললেনঃ এ কি চাঁদের আলো?

ডাক্তার মৈত্র বললেনঃ এই তো সেদিন অমাবস্যা গেল! চাঁদ কি উঠেছে?

বলে চারি ধারে তাকিয়ে বললেন ঃ কই, দেখছি না তো!

নির্মাল্য মিশ্রও তাকালেন চারি ধারে। দেখলেন, অনেক যাত্রী এখন এই দৃশ্য দেখছেন তন্ময় হয়ে।

না, কালাপানি নয়। নীল জল নীল আকাশের সঙ্গে মিলে আছে। জলের সীমানা নেই। সমুদ্রের জল আকাশের নীলের সঙ্গে কোথায় কোলাকুলি করছে তা দেখা যাচ্ছে না। নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তবে আমরা কোন্ আলোয় সব দেখতে পাচ্ছি?

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ এতো দিনের আলো নয়!

তবে কি তারার আলো! না, এই আলো আমাদের মনের!

বলে নির্মাল্য মিশ্র তাকালেন ডাক্তার মৈত্রর দিকে। কিন্তু তিনি এ কথার উত্তর দিতে পারলেন না।

এম. ভি. আন্দামান্স্ এখন দুলছে। উঠছে। নামছে। আবার স্থির হচ্ছে। জাহাজের সমস্ত যাত্রী বাংক থেকে উঠে এসেছে ডেকে। নিজেদের কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে সমুদ্র দেখতে। নীল সমুদ্র দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে সব কিছু। ভোরের আলো ফুটছে। পৃথিবীর প্রসাধন শুরু হয়েছে পূর্বের আকাশে।

ধীরে ধীরে কথা কইলেন নির্মাল্য মিশ্র। বললেন ঃ এ রকমটি এর আগে কোথাও দেখিনি।

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ সেইজন্যই তো আপনাকে ডেকে তুললাম!

নির্মাল্য মিশ্র অভিভূত হয়ে দেখছিলেন সমুদ্র। এই সমুদ্র দেখবার জন্য পুরো একটি দিন সবাইকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হয়েছে। আঠারোই অক্টোবর সন্ধ্যেবেলায় এই জাহাজে উঠেছেন। আর আজ বিশে অক্টোবর। পঁচিশ-ত্রিশ মাইলের গঙ্গা অতিক্রম করতেই তাঁদের এত সময় লেগেছে। গঙ্গাসাগর কখন পেরিয়ে এসেছেন, তা জানেন না। কখন তাঁরা সমুদ্রে পৌঁছেছেন, তাও বুঝতে পারেননি। এখন আর মাটি দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না তমালতালী বনরাজিনীলা। এখন শুধু 'জল আর জল, ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ'।

হ্যাঁ, গঙ্গাসাগরের সেই অমানুষিক দৃশ্য নির্মাল্য মিশ্রর মনে পড়ে গেল। বন্ধ্যা নারী গঙ্গায় মানত করে সন্তান লাভ করেছে, আর তার প্রথম সন্তানকে বিসর্জন দিচ্ছে গঙ্গাসাগরে। এমনি করে বাঙলার মায়েরা কত সন্তান

বিসর্জন দিয়েছে, তার কোন হিসেব নেই। নির্মাল্য মিশ্র বোধহয় মনে মনে শিহরে উঠলেন।

ঠিক এই সময়ে বাদল নিচে থেকে ওপরে উঠে এল। বেশ হন্ত-দন্ত হয়েই এল। বলল : আপনারা উঠে পড়েছেন নির্মাল্যদি!

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন : তোমাদের খবর কী?

বাদল বলল : আমি তো বিকাশ আর ভানুর সঙ্গে ডেকেই শুয়েছিলাম। অন্ধকারে বুঝতেই পারিনি যে সমুদ্রে পড়েছি। আকাশ একটু ফর্সা হতেই সবাই চেঁচিয়ে উঠল।

তারপর?

তারপর আর কী! বাঙ্ক্ থেকে ডেকে আনলাম সবাইকে। বিন্দুকে নিয়ে সদানন্দদা এলেন। আর তার দিদির সঙ্গে তারাপদ। বিন্দু তো সমুদ্র দেখে লাফাচ্ছে!

লাফাচ্ছে মানে?

বাদল বলল : ওর যে কলেজে-পড়া বিদ্যে। কোলরিজের 'এন্‌সেন্ট্ মেরিনার' আওড়াচ্ছে—ওয়াটার ওয়াটার এভ্রি হোয়ার!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আর বেশি দিন কবিতা আওড়াবে না।

কেন?

ও তো আমার মতো উকিল হবে বলছে। মক্কেলের চাপে পড়ে ওর সব কবিতা শুকিয়ে যাবে।

ডাক্তার মৈত্র এক সময়ে কেবিনের ভিতরে চলে গিয়েছিলেন। এইবারে একটা চুরট ধরিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই বাদল বলল : আমি এখন আসি নির্মাল্যদি। চা তৈরি হলে আপনাদের দিয়ে যাব।

বলে দ্রুত পায়ে নিচে নেমে গেল।

ডাক্তার মৈত্র কাছে এসে বললেন : আপনি এদের একটু বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছেন!

নির্মাল্য মিশ্র কিছু আশ্চর্য হলে বললেন : আপনি কি বাদলের কথা বলছেন?

হ্যাঁ। ওদের দলটার কথাই বলছি।

নির্মাল্য মিশ্র এবারে হেসে বললেন : বাদল না থাকলে আমার আসাই সম্ভব হত না। আমার সব ব্যবস্থা তো সে-ই করেছে! এমন কি—

বলুন।

আপনার সঙ্গে পরিচয়টাও হয়েছে তারই জন্যে। আপনার হাতে আমার কার্ডটা না দিলে আপনি কি আমাকে বাড়ি থেকে জাহাজ-ঘাটায় লিফ্‌ট্‌ দিতেন!

ডাক্তার মৈত্র কোন উত্তর দিলেন না।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে ফেললেন। আর তাই দেখে ডাক্তার মৈত্র জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি হাসছেন!

বাদলের বুদ্ধির কথা ভেবেই হাসছি।

আপনি যে মেয়েদের ভয় পান, তা সে জানত। তাই আপনাকে বুঝতেই দেয়নি যে আমি বাঙালী মেয়ে।

ডাক্তার মৈত্রর সে কথা মনে পড়ে গেল। সত্যিই তিনি কার্ড দেখে বুঝতেই পারেন নি যে নির্মাল্য মিশ্র বাঙালী মেয়ে। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কে যাবেন?' আর উত্তরে 'আমি' শুনে চমকে উঠে বলেছিলেন 'আপনি!'

নির্মাল্য যে মেয়ের নাম, তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। আর মিশ্র যে বাঙালীর উপাধি তা তাঁর কল্পনার অতীত ছিল। আর কার্ডের উপরে 'অ্যাড্‌ভোকেট হাইকোর্ট' লেখা দেখে ভেবেছিলেন একজন অবাঙালী উকিল-বাবুকে দেখতে পাবেন। তাই তিনি নির্মাল্য মিশ্রর এই মন্তব্যের কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

দিনের আলো ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দূরে নীল জলের উপরে সাদা রেখা দেখা যাচ্ছে। ঢেউএর মাথায় আলো পড়েছে, না সমুদ্রের বুকেই ঢেউ ভাঙছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নির্মাল্য মিশ্র বললেন : বাদল আমার পরিচয়টা আগে আপনাকে দিলে আপনি বোধ হয় আমাকে তুলে আনতেন না। তাই না?

কথাটা যে সত্যি, ডাক্তার মৈত্র তা বলতে পারলেন না। প্রতিবাদ করতেও পারলেন না; বললেন : কাল আপনি ওদের নিয়ে খুব মাতামাতি করেছিলেন।

মাতামাতি!

ওই ছোঁড়ার সঙ্গে তো আপনি নিচে নেমে গিয়েছিলেন!

হ্যাঁ, বাদলরা কী ভাবে যাচ্ছে তাই দেখতে গিয়েছিলাম।

তারপরে কখন ফিরেছেন তা আর দেখতে পাইনি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : ওরা খুব আনন্দ করে চলেছে। ওদের দেখে বেশ ভাল লাগে।

ডাক্তার মৈত্র বললেনঃ সেইজন্যেই তো বলছি, ওদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করবেন না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আমি কি ওদেরই একজন নই?

ডাক্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রর দিকে। আর নির্মাল্য মিশ্র নিজেই উত্তর দিলেনঃ আমি যদি জানতাম যে ওরা বাংকে যাচ্ছে, তাহলে কেবিনের টিকিট কাটতে দিতাম না।

ডাক্তার মৈত্র যেন আর্তনাদ করে উঠলেনঃ কী সর্বনাশ!

সর্বনাশ কেন?

আমি একজনকে নিয়েই পাগল হয়ে উঠেছি, আর আপনি ঐ দঙ্গলটার সঙ্গে—

বলেই চুপ করে গেলেন।

নির্মাল্য মিশ্র তাকিয়ে দেখলেন যে বাদল আর বিন্দু আসছে দু পেয়ালা চা নিয়ে। তাদের ডান হাতে একটি করে পেয়ালা। বোধহয় দুটো তলা উপরে উঠতে হয়েছে বলেই দুজনে দুটি পেয়ালা নিয়ে এসেছে।

বাদল এগিয়ে এসে নির্মাল্য মিশ্রর হাতে পেয়ালাটি দিল, আর ডাক্তার মৈত্রকে দিল বিন্দু। ডাক্তার মৈত্র এই চা নিতে ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র অত্যন্ত সহজভাবে চা হাতে নিয়েই বললেনঃ আমার জন্যে আবার কষ্ট করলে কেন ভাই!

বাদল বললঃ আপনার গল্প শোনবার জন্যে সবাই জানতে চাইছে, আপনি নিচে নামবেন, না সবাইকে ওপরে আসতে হবে!

বলে ভয়ে ভয়ে তাকাল ডাক্তার মৈত্রর দিকে।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র নির্ভয়ে বললেনঃ একজনের জন্যে সবাই কেন কষ্ট করবে!

বিন্দু খুশী হয়ে বললঃ সেই ভাল নির্মাল্যদি!

বলে কাছে ঘনিয়ে এসে বললঃ ওপরে আসতে আমার কেমন ভয় ভয় করে।

নির্মাল্য মিশ্র তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেনঃ ভয় করলে ওকালতি করবে কী করে! বড় বড় খুনে আসামীকেও ফাঁসি কাঠে লটকাবার জন্যে তুমুল আর্গুমেণ্ট করতে হবে তারই চোখের সামনে। তখন এ কথা ভাবলে চলবে না যে ছাড়া পেয়ে গেলে তোমাকেই ও খুন করে ফেলবে।

বলে হাসতে হাসতেই চায়ের পেয়ালাটা নিঃশেষ করে বাদলের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

ডাক্তার মৈত্র চা খেলেন অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে। চায়ের পেয়ালা নিয়ে দুজনে নিচে নেমে গেল।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন : ওদের চা-টি বেশ।

হুঁ।

বলে ডাক্তার মৈত্র গম্ভীর হয়ে রইলেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : সকালে এ রকম এক পেয়ালা চা না পেলে মনটা সারাদিন খারাপ হয়ে থাকে।

ডাক্তার মৈত্র এবারেও বললেন : হুঁ।

কিন্তু এই জাহাজের চা নাকি মুখে দেওয়া যায় না! আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের কথা মনে পড়ে যায়—চা পান, না বিষ পান!

ডাক্তার মৈত্র আর সইতে পারলেন না। রাগে যেন ফেটে পড়লেন : তাই বলে কি যেখানে সেখানে চা খেয়ে বেড়াবেন!

ডাক্তার মৈত্রর এই রাগ দেখে নির্মাল্য মিশ্র বেশ খুশী হয়ে বললেন : ওরা ভালবেসে চা এনেছে, ওদের কি বারণ করা যায়!

ডাক্তার মৈত্র বললেন : বারণ করা যায় না বলে কি আপনি নিজে ওদের কাছে যাবেন গুলতানি করতে।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন : ওরা আন্দামানের কথা শুনতে চায়।

তা আপনার কাছে শুনতে চায় কেন! জাহাজে কি আর মানুষ নেই! না, আন্দামানের কথা ছাড়া আর কোন কথা নেই দুনিয়ায়!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমরা ওদের দলের লোক। ওরাই ব্যবস্থা করে আমাদের এনেছে। আর যাচ্ছি যখন আন্দামানে, তখন ঐ জায়গার সম্বন্ধেই কিছু জানতে চাওয়া স্বাভাবিক।

ঠিক এই সময়ে সেই শিখ ভদ্রলোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে স্নান সেরে এসেছেন। ভিজে দাড়ি এখন কাপড়ের ফিতে দিয়ে বাঁধা। মুখখানা হাসি-হাসি। তাঁদের কাছে এসে বললেন : গুড মর্নিং।

ডাক্তার মৈত্র গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, মুখে কিছু বললেন না। নির্মাল্য মিশ্রই উত্তর দিলেন : গুড মর্নিং।

ভদ্রলোক নির্মাল্য মিশ্রর দিকে ফিরে বললেন : আই অ্যাম গুরুবক্স্ সিং সোহল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : গ্ল্যাড টু মীট ইউ মিস্টার সোহল। আই অ্যাম নির্মাল্য মিশ্রা।

একটু হেসে যোগ করলেন : মিস মিশ্রা।

মিস্টার সোহল বললেন : পরশু রাতে আপনার গান আমার খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু পরিচয় ছিল না বলে কাছে আসতে সাহস পাইনি।

পরিষ্কার বাঙলায় কথা বললেন মিস্টার সোহল। আর নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আপনি তো চমৎকার বাঙলা বলেন দেখছি!

আপনিও তো বাঙলা গান গাইছেন!

আমি তো বাঙালী!

সে অর্থে আমিও বাঙালী। বাঙলায় জন্মেছি, মানুষ হয়েছি বাঙলায়। শুধু ধর্মের ব্যাপারেই শিখ। খ্রীষ্টান বা মুসলমান হলে যদি বাঙালী ভাবতে পারেন, তো শিখ বলে বাঙালী ভাবতে পারবেন না কেন!

ডাক্তার মৈত্রর দিকে তাকিয়ে নির্মাল্য মিশ্র দেখলেন যে তিনি চটেছেন। ঘন ঘন মুখে চুরুটের ধোঁয়া নিলেন এবং শেষ পর্যন্ত চুরুটটা সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের কেবিনের দিকে চলে গেলেন!

মিস্টার সোহল সেই দিকে তাকিয়ে বললেন : ডক্টর আপনার পুরনো বন্ধু বুঝি!

এর উত্তরে নির্মাল্য মিশ্র একটু হাসলেন।

মিস্টার সোহল বললেন : লেট্স্ হ্যাভ সাম টি অর কফি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : এইমাত্র আমরা চা খেয়েছি।

তাহলে ব্রেকফাস্ট এক সঙ্গে খাব।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্রকে এ কথার উত্তর দিতে হল না। বাদল ছুটে এসে বলল : এ কি নির্মাল্যদি, আপনি এখনও তৈরি হননি! সবাই যে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে!

মিস্টার সোহল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : কিসের অপেক্ষা?

চায়ের।

আমি এখন আসছি।

বলে মিস্টার সোহলকে বললেন : এক্সকিউজ মি প্লীজ!

মিস্টার সোহল দেখলেন যে নির্মাল্য মিশ্র অত্যন্ত দ্রুত পায়ে নিজের কেবিনে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর বাদল খুশী হয়ে নিচে নেমে গেল।

॥ আট ॥

নিচে নেমে যেতে নির্মাল্য মিশ্রর বেশি সময় লাগল না। ভারী খুশী হল সবাই। বিন্দু বলে উঠল ঃ নির্মাল্যদি না এলে আসর যেন ঠিক জমে না।

বাদল বলল ঃ ডাক্তারবাবু আরও একটু বিগড়েছেন মনে হল!

তারাপদ বলল ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। উনি হলেন দক্ষিণ রায়, আর আমাদের বাদল তাঁর বাহন হীরা বাঘ।

বিন্দু খিল খিল করে হেসে উঠল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আমাদের বাদল বাঘ হবে কেন! ও বেচারার কী দোষ!

তারাপদ বলল ঃ দক্ষিণ রায়কে সামলাচ্ছে বলেই ও হীরা বাঘ।

কিন্তু দক্ষিণ রায় তো বাঘ নন, উনি বাঘের দেবতা! কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানো?

বলে নির্মাল্য মিশ্র তাকালেন বাদলের দিকে।

বিন্দুর কৌতূহলই সবচেয়ে বেশি। বলে উঠল ঃ কী নির্মাল্যদি?

হাজী সাহেবও আজ বেরিয়ে পড়েছেন!

বাদল বলল ঃ সত্যি নাকি!

কিন্তু সদানন্দবাবুর হঠাৎ এই হাজী সাহেব নাম মনে পড়ল না। বললেন ঃ হাজী সাহেব আবার কে?

বিন্দু উত্তর দিল ঃ তোমার মনে নেই বাবা! সুন্দরবনের মুসলমানরা যাকে বাঘের দেবতা বলে মানে!

ও হ্যাঁ, দক্ষিণ রায় আর হাজী সাহেবেই তো সেই যুদ্ধ হয়েছিল! আর সুন্দরবনের সমস্ত বাঘ দু'দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুজনের পেছনে!

তারাপদর দিদি বললেন ঃ এই নতুন মানুষটি কে বলুন তো!

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন ঃ গুরুবক্স্ সিং সোহল। দাড়ি গোঁফওয়ালা সর্দারজী, কিন্তু বাঙলা বলেন আমাদেরই মতো। ভয়ে আমি আপনাদের কাছে পালিয়ে এলাম।

ভয় কিসের ?

ও'রা এক কেবিনে আছেন যে !

বাদল বলল ঃ সর্বনাশ ! এই জন্যেই আমার ওপরে এমন ক্ষেপেছেন ! আমি ভাবছিলাম—

বলে সে থামতেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ কী ভাবছিলে ?

বাদল একটু লজ্জিতভাবে তাকাল বিন্দুর দিকে। তারপরে বলল ঃ আপনার সঙ্গে ডাক্তারবাবুকে কাল চা খেতে দেখে—

ভেবেছিলে ডাক্তারবাবুর মন এখন প্রসন্ন ! তা মোটেই না। ওপরে গিয়ে একবার দেখে এসো না !

বাদল বলল ঃ আমার সাহস নেই।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ অমন মানুষকে দলে আনা কেন বাপু !

বাদল বলল ঃ জানেন না সদানন্দদা, ও'র নামেই অনেক কাজ হয়েছে। চিঠি পত্র সব ও'র নামেই লিখেছি তো !

উনি সব সই করেছেন ?

পাগল হয়েছেন ! ডাক্তারের সই তো ! ও'র প্যাডের কাগজে আমিই সব সই করে দিয়েছি।

ঠিকানা ?

বলে নির্মাল্য মিশ্র বাদলের দিকে তাকালেন।

বাদল বলল ঃ সে ভুল করি নি। ঠিকানা ও'র চেম্বারের কেটে নিজের রেসিডেন্সের দিয়েছিলাম।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তবে তোমাকে মজা দেখাচ্ছি আমি।

বাদল আর্তনাদ করে উঠল ঃ দোহাই নির্মাল্যদি, বিশ্বাস করে আপনাকে বলেছি। বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

বিন্দু বলল ঃ ডাক্তারবাবুকে আপনি বলে দেবেন নির্মাল্যদি।

নির্মাল্য মিশ্র গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ বলতেই হবে।

তারাপদর দিদি তখন রুটিতে মাখন মাখিয়ে হাতে হাতে বিলি করতে শুরু করেছিলেন। এইবারে চা ঢালবেন। কাজেই সবার মনোযোগ এবারে খাবার দিকেই গেল।

ভানু চুপচাপ সাহায্য করছিল তারাপদর দিদিকে। সে একটু কম কথা বলে, যতটা পারে সাহায্য করে অপরকে। কিন্তু তার কাজ বড় একটা চোখে পড়ে না। প্রকৃতিটা ঠিক বাদলের উল্টো। তাকে লক্ষ্য না করলে বোঝাই

যাবে না যে দলে আর একটা মানুষ আছে। অথচ সে না থাকলে পদে পদে অসুবিধা হবে। এতক্ষণ পরে সে একটা কথা কইল। বলল ঃ আন্দামানের কথা বলুন নির্মাল্যদি!

নির্মাল্য মিশ্র রুটিতে কামড় দিয়েছিলেন। মুখের ভিতরে সামলে নিয়ে বললেন ঃ ম্যাপে আন্দামানের চেহারা দেখেছ?

বাদল বলল ঃ আকাশ থেকে বড় বড় ফোঁটায় যেন চোখের জল পড়েছে!

বিকাশ চেঁচিয়ে উঠল ঃ সাবাস জীবনানন্দ!

বাদল রুখে উঠে বলল ঃ সাবধান বিকাশ, আমাকে অপমান করতে পারিস। কিন্তু জীবনানন্দকে অপমান করলে আমি কিছুতেই সইব না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তার চেয়ে অন্য একটা উপমা দিলে বোধ হয় আরও রিয়ালিস্টিক হত।

কী?

ধনুকের টঙ্কার।

কী রকম?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বর্মার দক্ষিণে আরও কিছুটা নেমে এসে এই দিকে মুখ করে দাঁড়াও। মনে কর যে এই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ একটা ধনু। তাতে গুণ দিয়ে টানো। ধনুর আকার যে রকম হবে, এই দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান ঠিক তেমনি। উত্তরে বার্মা আর দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়ার দিকেই যেন একটু ঝুঁকে আছে। কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিচু-জায়গা সব ডুবে গেছে। আর সমুদ্রের বাইরে জেগে আছে একটি গিরিশ্রেণী, তারই নাম আন্দামান ও নিকোবর। সেই পাহাড়ের উপত্যকাতেই এখন লোকজন বসবাস করছে।

সদানন্দবাবু গম্ভীরভাবে বললেন ঃ লোকজনও বোধ হয় বহু পুরনো কালের, তাই না?

কত পুরনো তা জানা যায় না। কিন্তু যত দিন থেকে এই দ্বীপপুঞ্জের কথা জানা গেছে, তত দিন থেকেই নানা ধরনের কথা শোনা গেছে এদের অধিবাসীদের সম্বন্ধে। নরখাদক, কুকুরদের মতো মুখ—আরও কত কথা। কিন্তু সে সব তো সত্যি কথা নয়। গত একশো বছরে এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক সত্য কথা জানা গেছে।

বাদল খুশী হয়ে বলল ঃ এই সব অধিবাসীদের কথাই আজ শোনা যাক।

তারাপদ বলল ঃ এক দিনে সব কথা শুনলে চলবে না।

কেন ?

তিন দিন তিন রাত্রি কাটাতে হবে এই সমুদ্রের ওপরে।

আরও তিন দিন তিন রাত্রি !

আমরা তো এক দিন দু রাত্রি কাটিয়ে দিয়েছি !

বাদল বলল ঃ শোনা যাচ্ছে, আমরা চতুর্থ দিন ভোরেই পেঁছতে পারব।

সদানন্দবাবু নির্মাল্য মিশ্রকে বললেন ঃ এরা নিজেরাই কথা বলবে, আপনাকে কিছু বলতে দেবে না।

বাদল বলল ঃ ঠিক আছে। আমরা মুখ বন্ধ করলাম।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বই-এ যতটুকু পড়েছি, আমি ততটুকুই বলতে পারব।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ তাই বলুন।

এর বেশি জানতে হলে স্থানীয় লোকদের কাছে জেনে নিতে হবে।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ মাপ করুন, আমরা পণ্ডিত হতে চাই নে। কারও কাছে আমাদের কোন পরীক্ষা দিতেও হবে না। অল্পবিস্তর জানতে পারলেই আমরা সন্তুষ্ট হব।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আন্দামানকে এখন মিনি ভারত বলা যায়। অর্থাৎ ভারতের প্রায় সব জায়গার অধিবাসীরাই এখন এখানে বসবাস করছেন। কিন্তু একটা ছোট জায়গায় এক সঙ্গে মিলে মিশে থাকার জন্যে এখানকার সব কিছুই নাকি জগা-খিঁচুড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু আগে তা ছিল না। তখন আন্দামান ও নিকোবরের দ্বীপগুলিতে নানা জাতের আদিবাসীর বসবাস ছিল। তারা এখনও আছে এবং তাদের কথাই আগ্রহ সহকারে জানবার মতো।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ মানে ইণ্টারেস্টিং !

এক্‌জ্যাক্ট্‌লি সো।

বলে নির্মাল্য মিশ্র একটু থেমে বললেন ঃ প্রথমে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কথাই বলি। পরে বলব নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কথা। ইউনিয়ন টেরিটরির এই দুটি মাত্র জেলা। কিন্তু দ্বীপের সংখ্যা অগণিত। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে আন্দামান জেলায় বড় দ্বীপ পাঁচটি। তাদের নাম নর্থ মিড্‌ল ও সাউথ আন্দামান ও রাট্‌ল্যাণ্ড। লিট্‌ল আন্দামান সকলের দক্ষিণে। তারপর টেন ডিগ্রী চ্যানেল পেরিয়ে নিকোবর জেলা। এতে বড় দ্বীপ হল কার নিকোবর। চাওড়া, নানকৌরি, কাটচাল ও গ্রেট নিকোবর।

বিন্দু বলল ঃ টেন ডিগ্রী চ্যানেল কী ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ সমুদ্রের একটা ভয়াবহ জায়গা।

কি রকম ?

ব্যাপারটা বুঝতে হলে, ভূগোলের অক্ষরেখা মনে করতে হবে। দশ ডিগ্রী অক্ষরেখা। এই রেখাটি গেছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মাঝখান দিয়ে। তুলনা করলে দেখা যাবে যে এই রেখা কেরালা রাজ্যকেও দু ভাগে ভাগ করেছে। সিংহল এর দক্ষিণে, বিষুবরেখা আরও দক্ষিণে। এই দশ ডিগ্রীর অক্ষরেখা সমুদ্রের যে অংশের ওপর দিয়ে গেছে, সেখানে সমুদ্র খুবই বিপজ্জনক।

কেন ?

এই কেনর উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে অনুমান করতে পারি। ভূতাত্ত্বিকরা বলেন যে এই আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এক সময়ে একটা গিরিশ্রেণী ছিল। সমুদ্রের নিচে থেকে এই পাহাড় সমুদ্রের ওপরে জেগে থাকত। কোন প্রাকৃতিক কারণে অর্থাৎ ভূবিপর্যয়ে এই গিরিশ্রেণী জলমগ্ন হয়েছে, শুধু তার উঁচু চূড়াগুলো এখন দ্বীপের মতো সমুদ্রের ওপরে জেগে আছে। এইজন্যে এই দ্বীপপুঞ্জের কোন পাহাড়ের উচ্চতা বেশি নয়, আবার দুই দ্বীপের মাঝখানের সমুদ্রও খুব বেশি গভীর নয়। এর ব্যতিক্রম হল লিট্‌ল আন্দামান ও কার নিকোবরের মাঝখানের সমুদ্র। দশ ডিগ্রীর অক্ষরেখা গেছে ঠিক এই সমুদ্রেরই মাঝখান দিয়ে। খুব গভীর এবং বিপদসংকুল। সমুদ্র এখানে সারাক্ষণই উত্তাল। রাতের দিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে বলে জাহজ সাধারণত রাতে এই দশ ডিগ্রী চ্যানেলটা পেরিয়ে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে যাবার চেষ্টা করে। নাবিকেরাও শুনেছি ভীষণ ভয় পায় এই চ্যানেলকে। নৌকোয় এ জায়গা পেরোবার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। তাই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও খুব দুর্বল।

বাদল খুব ভয় পেয়ে গেল। বলল ঃ জাহাজ তবে ম্যাড্রাসে যায় কেমন করে ? নিকোবর দ্বীপ ঘুরেই তো যায় !

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন ঃ না, অমন দুঃসাহস নেই কারও।

তবে ?

সাউথ আন্দামানের ঠিক দক্ষিণে রাটল্যাণ্ড দ্বীপ, তার দক্ষিণে লিট্‌ল আন্দামান। কিন্তু জাহাজগুলো এই দুই দ্বীপের মাঝখান দিয়ে ম্যাড্রাসের

দিকে চলে যায়। বলতে গেলে পোর্ট-ব্লেয়ারের ঠিক নিচে দিয়েই বেরিয়ে যায়। আগে অনেক জাহাজডুবি হত জানো তো ?

বাদল বলল : শুনেছি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আমার মনে হয় যে এই সমস্ত জাহাজ টেন ডিগ্রী চ্যানেলেই ডুবত। আর এই রকমের কোন জাহাজডুবি থেকেই আন্দামানের প্রথম মানুষ এসে এখানে আটকে পড়েছিল।

সত্যি !

বলে বিন্দু বিস্ময় প্রকাশ করল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : প্রাগৈতিহাসিক যুগে এসেছিল আফ্রিকার সেই কালো বেঁটে কোঁকড়ানো চুলের মানুষ। তাদের বংশধরের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হলেও তারাই আন্দামানের আদিম অধিবাসী। নৃতাত্ত্বিকরা বলেন, এরা আফ্রিকার নেগ্রিটো গোষ্ঠীর একটি শাখা। মালয়ের সেমাং, ফিলিপাইনের আয়েটা আর নিউ গিনির ট্যাপিরোদের সঙ্গে আন্দামানীদের চেহারার অনেক মিল আছে। এদের মধ্যে অনেক উপজাতি থাকলেও প্রধান হল আন্দামানী, ওঙ্গে, সেন্টিনেলি ও জারোয়া। নিকোবরীরা মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর। তাদের মধ্যে প্রধান হল নিকোবরী ও শম্পেন।

বাদল বাধা দিয়ে বলল : এমন সংক্ষেপে বললে চলবে না নির্মাল্যদি, বেশ জমিয়ে বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন : শক্ত পাল্লায় পড়েছি দেখছি।

তারাপদর দিদি বললেন : আপনাকে খাতির করে ভাবছে, মাথা কিনেছে আপনার।

সদানন্দবাবু নির্মাল্য মিশ্রকে বললেন : আপনি বলুনতো !

নির্মাল্য মিশ্র তাঁর দিকে চেয়ে বললেন : শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন যে আন্দামানে এখন আর আন্দামানী দেখতে পাওয়া যায় না।

সেকি !

তাইতো পড়েছি। এক সময়ে তাদের মধ্যে দশটা জাত ছিল—আকা-বো, আকা-বোরা, এইরকম সব নামের আলাদা আলাদা উপজাত। তাদের ভাষাও আলাদা। আলাদা আলাদা এলাকায় তারা থাকত। পুরুষেরা শিকার করত, আর মেয়েরা ছোট ছেলেদের নিয়ে ধারালো লাঠি হাতে বনে যেত মূল জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে। বাঁশের লগি দিয়ে গাছের ফল পাড়ত। চাষ আবাদ করে যে ফসল পাওয়া যায়, সে কথা তারা জানত না।

বিদেশী দেখলে তাদের দিকে তাকাত বিদ্বেষের চোখে। আর এই জন্যেই বোধহয় বিদেশীরা ভয়ে তাদের নরখাদক বলত। কিন্তু তাদের নিজের দশ জাতের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল। উৎসবের সময় সব জাতের মেয়ে পুরুষরা এক সঙ্গে নাচগান করত।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ইংরেজের আমলেই আন্দামানীরা শেষ হয়ে গেল।

কেন ?

ইংরেজরা তাদের সভ্য করবার চেষ্টা করেছিল। তিরিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা আট হাজার থেকে কমে দু হাজারে নেমে গেল। ক্যাম্পে রোগে তারা মরতে লাগল। আর ভগবান জানেন, কোথা থেকে তাদের মধ্যে যৌন রোগ ঢুকল। আর একবার মড়কের মতো হাম হল। এর পরেই দেখা গেল যে আন্দামানে আর আন্দামানী নেই। মুষ্টিমেয় যে কজন আছে, তারা নাকি এখন মাছ আর শুয়োর মারার জন্যে বর্শা তৈরি করছে। আর বার্মিজ ও ব্যারেনদের ফাই ফরমাস খাটছে।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ এখন তাদের চেনা যায় তো ?

আমরা চেষ্টা করব চিনতে। খবরের কাগজে পড়েছি যে জনা কুড়ি মেয়ে পুরুষকে এখন আন্দামান সরকার স্টেট দ্বীপে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে।

বাদল বলল ঃ সর্বনেশে কথা।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ বলুন তার পরে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ লিট্‌ল আন্দামানের ওঙ্গেরা শুনেছি পোর্ট-ব্লেয়ারে আসে। ওদের আমরা খুঁজে দেখবার চেষ্টা করব।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ কিন্তু চিনব কী করে ?

দেখতে ওরাও যে আন্দামানীদের মতো। শক্ত সমর্থ চেহারার বেঁটে মানুষ, আর এক মাথা কোঁকড়ানো চুল নিগ্রোদের মতো। এক সময়ে হিংস্র ছিল। এখন বেশ শান্তশিষ্ট।

তারপরেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ পোর্ট-ব্লেয়ার থেকে লিট্‌ল আন্দামান খুব দূরে নয়। সেখানে গেলে ওদের বিচিত্র জীবন যাত্রা দেখে আসা যায়।

কী রকম জীবন যাত্রা ?

বলে সদানন্দবাবু নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে তাকালেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ শুনেছি, ওদের কুঁড়ে ঘরগুলোই দেখবার জিনিষ। সমস্ত দ্বীপটায় নাকি একই রকমের কুঁড়ে ঘর। মৌচাকের মতো

গোল সেগুলোর আকার, আর ভেতরে শোবার জন্যে কাঠের উঁচু পাটাতন। এক একটি কুঁড়ের মধ্যে নাকি তিন-চারটি পরিবার একসঙ্গে বাস করে। রান্না করে বিছানার পাশে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—সবই এই কুঁড়ের ভেতর।

মানে ?

জন্ম তো হবেই, মৃত্যুও হবে। কিন্তু সেই মৃত দেহ কবর দেবে পাটাতনের নিচে। আর বিয়েও হবে এই কুঁড়ের মধ্যে। সেদিন সবাই মিলে রান্না করবে এই কুঁড়ের মাঝখানে।

তারাপদ বলল : কত বড় কুঁড়ে ঘর রে বাবা !

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : খুব বড় নয় নিশ্চই।

কেন ?

সরকারী হিসেবে ওঙ্গেদের সংখ্যা এখন একশো তিরিশ।

মাত্র !

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : এদের নাচ গানেরও ছবি দেখেছি আমি। এখন এরা বেশ শান্ত জাত বলে এদের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়। কিন্তু সেন্টিনেলি আর জারোয়ারা ভীষণ হিংস্র বলে তাদের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না।

কোথায় থাকে তারা ?

পোর্ট ব্লেয়ারে সেন্টিনেলিদের ভয় নেই। তারা থাকে সেন্টিনেলি দ্বীপে। সংখ্যায় তারা শ খানেকের কম বলে অনুমান করা হয়। ওদের দ্বীপের ধারে কাছেও যাবার উপায় নেই তো !

কেন ?

মারাত্মক ওদের তীরের লক্ষ্য। আর তীরের ফলায় থাকে বিষ। তাদের দ্বীপের কাছে জাহাজ বা নৌকো দেখলেই হল। প্রাণ নিয়ে আর ফিরে আসতে হবে না। তাই তাদের সম্বন্ধে যা জানা গেছে, তা উড়ো জাহাজ থেকে। একবার নাকি একটা পরিত্যক্ত কুঁড়ে ঘর থেকে তাদের কিছু অস্ত্র-শস্ত্র আর জিনিষপত্র সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল। তবে ভাগ্য ভাল হলে জারোয়োদের দর্শন আমরা পোর্ট-ব্লেয়ারেই পেতে পারি। সেন্টিনেলিদের চেয়ে তারা কম হিংস্র নয়। আর সংখ্যাতেও শ পাঁচেক হবে।

বিন্দু সভয়ে বলল : ওরে বাবা !

বাদল বলল : ভাগ্য ভাল থাকলে বলছেন কেন ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ ওদের দেখা পাওয়া তো সৌভাগ্যের কথা। শুনতে পাই, ওদের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে নাকি যথাসাধ্য চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হচ্ছে না। আগে ওদের সঙ্গে মাঝেমাঝেই খণ্ড যুদ্ধ হত। এখন বুশ পুলিশ দিয়ে ওদের এলাকাটা ঘিরে রাখা হয়েছে।

বাদল এবারে ভয়ে ভয়ে বললঃ ওরা কোন্ দ্বীপে থাকে?

নির্মাল্য মিশ্র তার মুখের ভাব দেখে হেসে বললেনঃ আমরা যে দ্বীপে যাচ্ছি, সেই দ্বীপেরই পশ্চিম উপকূলে। মিড্‌ল আন্দামানেও তারা আছে।

তারপরে বললেনঃ জারোয়াদের কথা আমি রামপ্রসাদ সেনের উপন্যাস 'দ্বৈপায়নে' পড়েছিলাম। ভদ্রলোক অনেকদিন আন্দামানে কাটিয়েছিলেন, আর নিজের চোখে দেখেছিলেন তাদের আক্রমণ। সাংঘাতিক জাত।

সদানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেনঃ এখনও তারা আক্রমণ করে নাকি?

আক্রমণ করে বলে শুনিনি। তবে—

তবে কী?

লোহার জিনিষ বা শাক সব্জি চুরি করতে আসে।

বিন্দু ভয়ে ভয়ে বললঃ মানুষ চুরি করে না তো।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেনঃ সুন্দর মেয়ে দেখলে—

বলেই তিনি থেমে গেলেন। হঠাৎ এক ভদ্রলোকের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল। বাদল তা লক্ষ্য করেই ফিরে তাকাল। দেখল যে একজন শিখ ভদ্রলোক এই দিকে আসতে আসতেই অন্য দিকে ফিরে গেলেন। খানিকটা দূরে চলে যাবার পরেই সে জিজ্ঞাসা করলঃ ভদ্রলোক কে নির্মাল্যদি?

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ হাজী সাহেব।

বিন্দু খিলখিল করে হেসে উঠে বললঃ এ দিকে আসছিলেন কেন?

বাদল বললঃ নিশ্চয়ই নির্মাল্যদির খোঁজ করতে।

তারাপদর দিদি হেসে বললেনঃ বেশ ভাল হয়েছে। আপনার এক দিকে দক্ষিণ রায়, অন্য দিকে হাজী সাহেব।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ সেইজন্যেই আমার আর ভয় নেই।

কেন?

ভয়তো একটা বাঘ হলেই। যে কোন সময় খেয়ে ফেলতে পারে। বাঘ দুটো হলে নিজেরাই খেয়োখেয়ি করবে।

তাঁর কথা শুনে বিন্দুই হাসল বেশি।

কিন্তু সদানন্দবাবু বললেনঃ আবার আমরা অন্য কথায় চলে যাচ্ছি।

তারাপদর দিদি আর এক পেয়ালা চা নির্মাল্য মিশ্রর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ গলাটা ভিজিয়ে নিন।

আপত্তি করলেন না নির্মাল্য মিশ্র, বললেন ঃ ভাল চা বলেই খাচ্ছি।

তারপরেই সদানন্দবাবুর দিকে চেয়ে বললেন ঃ এইবারে নিকোবরীদের কথা বলতে হয়। ওদের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে ইতিহাসের কথা এসে পড়ে। এক সময়ে নাকি এই দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের অধীন ছিল।

বাধা দিয়ে বিন্দু বলল ঃ একটা কথা জিজ্ঞেস করতে আমার ভয় করছে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ভয় কাকে ?

বিন্দু থতমত খেয়ে গেল· কিন্তু কাকে তার ভয় তা বলতে পারল না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ভয় নিজের মনেরই দুর্বলতা। ওকে যত প্রশ্রয় দেবে, ও তত বাড়বে। জোর করে ঝেড়ে ফেলতে পারলে ভয় আর থাকবে না। বল, এইবারে।

বিন্দু বলল ঃ আমি শুনেছিলাম যে আন্দামানেই ছিল হনুমানের রাজত্ব।

বাদল বলল ঃ কোথায় কিষ্কিন্ধ্যা, আর কোথায় আন্দামান।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বিন্দুর কথা উড়িয়ে দিও না বাদল। এটা ওর কথা নয়। আমিও পড়েছি যে রামায়ণে আন্দামানের উল্লেখ দেখে কোন ঐতিহাসিক বলেছেন যে হনুমান বা তার বংশধররা ছিল আন্দামানের অধিবাসী। প্রাচীনকালে মালয়বাসীরা নাকি হনুমানের দেশকে বলত হান্দুমান। কাজেই হান্দুমান থেকে আন্দামান নাম হওয়া আশ্চর্যের নয়।

বাদল বলল ঃ ভারি মজার কথা।

কিন্তু সদানন্দবাবু বললেন ঃ আপনি চোল রাজাদের কথা বলছিলেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ হ্যাঁ। তাঞ্জোরে যে লিপি পাওয়া গেছে, তাতে আছে যে একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চোল রাজা দ্বিতীয় রাজেন্দ্র গ্রেট নিকোবর ও কার নিকোবর এই দুটি দ্বীপ অধিকার করেছিলেন এবং এই দ্বীপকে নক্কাভরম বলা হয়েছিল। অন্য ভারতীয়রা নাকি এই দ্বীপকে বলত কর দ্বীপ।

বাদল এইবারে তার মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল ঃ দাঁড়ান একটু নির্মাল্যদি, সব কথা কি রকম গুলিয়ে যাচ্ছে।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ এর আগে আপনি বোধহয় অন্য রকম কথা বলেছিলেন।

নির্মাল্য মিশ্র তৎপরভাবে বললেন ঃ ঠিকই ধরেছেন। তখন বলেছিলাম যে এই দ্বীপের নাম ছিল তিমাইতিভ। তার মানে অপবিত্র দ্বীপ। আসল ব্যাপারটা কী জানেন ?

কী ?

ইতিহাসে আছে যে তাঞ্জোর লিপিটা ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের। কিন্তু কোন্ ভাষায় তা লেখা তা জানি নে। জানলেও পড়তে পারব না। কাজেই তিমাইতিভ লিখেছে, না নক্কাভরম লিখেছে, তা যিনি সব জানেন তিনিই বলতে পারবেন। দুজনের লেখায় আমি দুরকম কথা পেয়েছি।

নির্মাল্য মিশ্রর কথায় হেসে ফেলল সবাই। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র গম্ভীর ভাবে বললেন ঃ আপনারা হাসছেন! কিন্তু আমার আজ আর একটি লেখার কথাও মনে পড়ছে।

বলুন।

১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিকলো কন্তি নাকি আন্দামান ভ্রমণ করবার পরে এই দেশকে দেবতাদের দ্বীপ বলেছেন। কিন্তু তিনি বাঙলায় এই কথা নিশ্চয়ই বলেননি। কোন্ ভাষায় কী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, প্রবন্ধ লেখক তা বলেননি। বললে মুখস্ত করে রাখবার চেষ্টা করতাম।

বিন্দু আবার হেসে উঠল। কিন্তু সদানন্দবাবু বললেন ঃ ইতিহাসের কথা থাক, আপনি নিকোবরীদের কথা বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ওদের কথা বলতে গিয়েই তো ইতিহাসের কথা এসে পড়ল।

তারপর বিন্দুর দিকে চেয়ে বললেন ঃ নক্কাভরম কথাটার মানে বোঝ ?

বিন্দু তৎপরভাবে বলল ঃ ন্যাকা লোকে ভরা।

বাদল হেসে উঠল উদ্দামভাবে। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র তাকে একটা ধমক দিয়ে বললেন ঃ হাসবার কী হল! বিন্দু তো প্রায় ঠিকই বলেছে।

অ্যাঁ।

ন্যাকালোক নয়, নক্কাভরম হল উলঙ্গ লোকের দেশ।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ লোকেরা কাপড় পরে না নাকি ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ কিছুই পরে না বললে মিথ্যে বলা হবে, যা পরে তা না পরার সামিল। শুধু এক ফালি কাপড় কৌপিনের মতো করে পরে পেছনের দিকে একটুখানি ঝুলিয়ে দেয়। আর সব খালি। শুধু নিকোবরী নয়, আন্দামানের সব আদিবাসীদেরই প্রায় এই বেশ।

আর মেয়েদের ?

মেয়েদের কথা বলতে পারব না।

কেন ?

দুরকমই দেখেছি ছবিতে। ছেলেদের মতোও দেখেছি, আবার ভাল পোষাক আশাকও দেখেছি। কতকটা বর্মীদের মতো বা কেরালার মেয়েদের মতো লুঙ্গির ওপরে ব্লাউজ।

তারপরে নিকোবরীদের গল্প বললেন নির্মাল্য মিশ্র ঃ জন্ম এরা একটা নোংরা ব্যাপার বলে মনে করে। আর সেই জন্যেই শিশুদের নাকি জন্ম হয় গ্রামের বাইরে। বিয়েতে ছেলেমেয়েদের পুরো স্বাধীনতা আছে। বিয়ের আগে থেকে স্বাধীনভাবে মেলামেশা করে নিজেরাই বিয়ে স্থির করে। অবশ্য বাপ-মায়ের না বলার অধিকার আছে। আর মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের ধারণা ইজিপ্সিয়ানদের মতো। তারা মনে করে যে মৃত্যুর পরেও মৃতের আত্মা পার্থিব জিনিষ ভোগ করতে পারে। তাই তারা জামাকাপড় অলংকার ও খাদ্যদ্রব্য মৃতের কবরে দেয়! সাতদিন পরে সেই মৃতদেহ কবর থেকে তুলে সমুদ্রের ধারে সাধারণ কবরখানায় পুঁতে আসে। এই সব পুরনো রীতি নীতি এখন বদলে যাচ্ছে।

কেন ?

নিকোবরীরা অধিকাংশই এখন খ্রীষ্টান হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইয়োরোপবাসীরা এখানে আসতে শুরু করে। প্রথমেই আসে খ্রীষ্টান পাদ্রী সাহেবরা। অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে আসে ফরাসী মিশনারীরা। তারপর দিনেমার এবং এই শতাব্দীরই শেষের দিকে ইংরেজ অধিকার করে এই দ্বীপপুঞ্জ। এই মিশনারীরাই এখানকার অধিবাসীদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে খ্রীষ্টান করেছে। আর সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ করেছে এই যে একজন বুদ্ধিমান নিকোবরীকে তারা ভাল শিক্ষা দিয়ে পাদ্রী তৈরি করেছিল। নিকোবরে তিনি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

কী নাম তাঁর ?

বিশপ রিচার্ডসন। তিনি নিকোবরী ভাষায় অনুবাদ করেছেন বাইবেলের অনেক কিছু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানীদের হাতে তিনি খুব নিগৃহীত হয়েছেন বলে শুনেছি। তাঁর নাকি দুবার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। একবার বিদ্রোহের ভয়ে জাপানীরা তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিল। আর দ্বিতীয়বার তাঁকে হত্যা করবার আগেই হেরে

গিয়েছিল তারা। এই বিশপ রিচার্ডসনের চেষ্টাতেই নিকোবরীরা খ্রীষ্টান হয়েছে।

এর পর নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এই হল কার নিকোবর দ্বীপের নিকোবরীদের কথা। এ ছাড়া গ্রেট নিকোবরে আর এক জাতের আদিবাসী আছে, তাদের বলে শম্পেন। এরা জারোয়াদের মতো নৃশংস না হলেও বেশ হিংস্র জাত। বিদেশীরা এদের কাছে ভিড়তে সাহস পায় না। এরাও বিদেশীদের পছন্দ করে না।

সকালের জলখাবার তখন সবার শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভানু সব গেলাস আর পেয়ালা কুড়িয়ে চলে গেল। তারাপদর দিদি এর আগেই তাঁর জিনিষপত্র গুছিয়ে তুলে ফেলেছিলেন। নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আজকের সভা এখানেই শেষ হোক।

বাদল বলল: ওপরে আপনার ভয় করবে না?

ভয়! ভয় কিসের?

বলে নির্মাল্য মিশ্র বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

॥ নয় ॥

নির্মাল্য মিশ্র উপরে এসে দেখলেন যে ডাক্তার মৈত্র বাইরে নেই। চারিধারে চেয়ে কোন দিকে দেখতে না পেরে একটু চিন্তিত হলেন। এখন কেউ কেবিনের ভিতরে নেই। সবাই বাইরে বসে সমুদ্র দেখছেন। কেউ বইপত্র পড়ছেন, কেউ বা গল্প গুজব করছেন। যাঁরা সপরিবারে চলেছেন, তাঁরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছেন। ডাক্তার মৈত্র ব্রেকফাস্ট করতে গেছেন ভেবে নির্মাল্য মিশ্র সেদিকটাও ঘুরে দেখে এলেন। কিন্তু কোথাও দেখতে পেলেন না।

হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল গুরবন্ত্ সিং সোহলের দিকে। নির্মাল্য মিশ্রর দুর্ভাবনা দেখে ভদ্রলোক যেন হাসছেন। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র তাঁর কাছে না গিয়ে একখানা খালি চেয়ারে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পরেই গুরবন্ত সিং সোহল তাঁর কাছে চলে এলেন। বললেন: আপনি কাকে খুঁজছিলেন?

নির্মাল্য মিশ্রর মনে হল যেন এই সর্দারজী তাঁকে বিদ্রুপ করছেন। তাই একটু বিরক্তভাবে বললেন: বসবার একটা ভাল জায়গা দেখছিলাম।

ভদ্রলোক তাঁর পাশে বসে বললেন : আমি ভেবেছিলাম, আপনি বোধহয় ডক্টরকে খুঁজছেন।

ডক্টরকে আমার কোন দরকার নেই। সী সিক্‌নেশ আমার নেই। আই অ্যাম পার্ফেক্টলি ফিট।

না না। সেজন্যে নয়। আমি ভেবেছিলাম কম্পানির জন্যে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : একটু আগেই তো আমি—

বলে থেমে গেলেন। এতক্ষণ এত লোকের সঙ্গে এত কথা বলে আসবার পর এখন যে তাঁর একা থাকতেই ভাল লাগবে, সে কথা এই ভদ্রলোকের মুখের ওপর বলতে পারলেন না। অপ্রিয় ভাষণের অভ্যাস তাঁর নেই।

কিন্তু মিস্টার সোহল বোধহয় একা থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই কারও সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ছটফট করছিলেন। বললেন : দি ডক্টর ওয়াজ নট ফীলিং ওয়েল।

কী হয়েছে তাঁর ?

বলে নির্মাল্য মিশ্র সোজা হয়ে বসলেন।

মিস্টার সোহল বললেন : তিনি নিজে কিছু বললেন না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দিয়েই কেবিনের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

কতক্ষণ আগে ?

তা অনেকক্ষণ হল।

আপনি কোন খোঁজ নেননি ?

খোঁজ নেব কি ! কথাতো বলেন না, ধমক দেন শুধু।

বলে বিরক্তি প্রকাশ করলেন খানিকটা।

নির্মাল্য মিশ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : যদি তাঁর শরীর খারাপ হয়ে থাকে তা ডাক্তারকে খবর দেওয়া দরকার।

বলে কেবিনের দিকে পা বাড়াতেই মিস্টার সোহল বললেন : আপনি কি কেবিনে যাচ্ছেন নাকি !

কেন, আপত্তি আছে আপনার ?

আপত্তি কিসের !

বলে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে চললেন।

কেবিনে গিয়ে দেখলেন যে ডাক্তার মৈত্র উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। নির্মাল্য মিশ্র মুখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কী কষ্ট হচ্ছে ডাক্তারবাবু ?

নির্মাল্য মিশ্রর কণ্ঠস্বর শুনে ডাক্তার মৈত্র যেন চমকে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ চিৎ হয়ে শুলেন। আর অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রর দিকে।

কী কষ্ট হচ্ছে? গা গুলোচ্ছে।

শিশুর মতো মাথা নাড়লেন ডাক্তার মৈত্র।

নির্মাল্য মিশ্র আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে চলে গেলেন তাঁর নিজের কেবিনে। সঙ্গে একটা ছোট বাক্স ছিল ওষুধের। তার মধ্যে কয়েকটা প্রয়োজনীয় ওষুধ। একটু উল্টে পাল্টেই অ্যাভোমিন ট্যাবলেট পেয়ে গেলেন। ফ্লাস্কের ঢাকনায় জল ঢেলে নিলেন খানিকটা। তারপর ডাক্তার মৈত্রর কাছে এসে সেই বড়িটা খাইয়ে দিলেন।

ডাক্তার মৈত্র একবারও জানতে চাইলেন না কী ওষুধ, কে দিয়েছে? নির্মাল্য মিশ্রই যেন ডাক্তার আর তিনি রোগী, এই কথাই মেনে নিলেন নিঃশব্দে।

মিস্টার সোহল আশ্চর্য হয়ে বললেনঃ আপনি ডাক্তারীও জানেন নাকি?

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ সামান্য শরীর খারাপের জন্যে ডাক্তারী জানার কি দরকার হয়! মাথা ধরার কী ওষুধ, আর বমির ভাব হলে কী খেতে হয়, এ সব তো আজকাল সবাই জানে। বিশেষ করে পাহাড়ে ওঠার সময় বা জাহাজে চলতে অনেকেরই এরকম হয়। যাদের হয়, তাদের আগে থেকেই সতর্ক হতে হয়।

ডাক্তার মৈত্র নির্মাল্য মিশ্রর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সেদিকে চোখ পড়তেই নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আমাকে খবর দেননি কেন?

ডাক্তার মৈত্র এবারে অভিমানের সুরে বললেনঃ আপনাকে পাব কোথায়!

কেন, আমি তো নিচেই ছিলাম!

কাছে থাকলে তো বলব!

এই উত্তর শুনে হাসলেন নির্মাল্য মিশ্র। বললেনঃ এই বন্ধ কেবিনে আপনার আরও খারাপ লাগছে যে! বাইরে খোলা হাওয়ায় চলুন।

ডাক্তার মৈত্র বললেনঃ জল ওঠা-নামা দেখলে—

বাধা দিয়ে নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ দেখবেন না। অন্য ধারে মুখ ফিরিয়ে বসবেন। গল্প করবেন আমাদের সঙ্গে। কী বলেন?

বলে তিনি মিস্টার সোহলের দিকে তাকালেন।

মিস্টার সোহল বললেনঃ ঠিক বলেছেন। আপনার কথা বলতে কষ্ট হয়, আমরা গল্প করব। আপনি শুনবেন।

নির্মাল্য মিশ্র তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ উঠে পড়ুন তো!

ডাক্তার মৈত্র নির্মাল্য মিশ্রর হাত ধরে উঠে বসলেন! তারপরে বেরিয়ে এলেন কেবিন থেকে।

মিস্টার সোহল একখানা চেয়ার ঘুরিয়ে দিয়ে বললেনঃ আপনি এই চেয়ারটায় বসুন।

বলে নিজে তাঁর উল্টো ধারে নির্মাল্য মিশ্রর পাশে বসলেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ ব্রেকফাস্ট খেয়েছেন তো!

ডাক্তার মৈত্র করুণভাবে বললেনঃ না।

সে কি! কিছু না খেয়েই আছেন!

তারপরে মিস্টার সোহলের দিকে চেয়ে বললেনঃ আপনি একটু কষ্ট করে বলে আসবেন! প্রথমে একটু অরেঞ্জ বা লাইম জুস, তারপরে—

মিস্টার সোহল উঠে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র তাঁকে ডেকে বললেনঃ তার পরে কী বলবেন?

এখন কী পাওয়া যাবে তা জিজ্ঞেস করে আসি।

বলে ভদ্রলোক ক্যান্টিনের দিকে চলে গেলেন।

গুরবক্স্ সিং সোহল চলে যেতেই ডাক্তার মৈত্র বললেনঃ ঐ লোকটাকে একেবারেই আস্কারা দেবেন না।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেনঃ কেন বলুন তো!

সাংঘাতিক লোক। বলছে, আন্দামানে ওর বিজনেস আছে। কিন্তু কিসের বিজনেস তা বলছে না। ওর হাবভাব আমার মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না।

ডাক্তার মৈত্রকে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ মনে হচ্ছে। নির্মাল্য মিশ্রর সন্দেহ হল যে বোধহয় ঐ ভদ্রলোকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যেই তিনি কেবিনে গিয়ে ঢুকেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল যে তা বোধহয় নয়। শরীর অসুস্থ বোধ না করলে সময়মতো ব্রেকফাস্টটা খেয়ে নিতেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা নিরাপদ হবে না ভেবে চুপ করে রইলেন।

মিস্টার সোহল ফিরে এসে বললেনঃ অরেঞ্জ স্কোয়াস আসছে। আর রুটি মাখন ডিম পাওয়া যাবে।

ডাক্তার মৈত্র আবার একটু ঝিমিয়ে গেলেন। নির্মাল্য মিশ্রর দিকে চেয়ে বললেন ঃ ওসব এখন আর খাব না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ সেই ভাল। তাড়াতাড়ি স্নান করে ঝোল ভাত খেয়ে নেবেন।

মিস্টার সোহল বসে পড়ে বললেন ঃ আপনার ওষুধে বেশ কাজ হয়েছে দেখছি।

নির্মাল্য মিশ্র শুধু হাসলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

বেয়ারা অরেঞ্জ স্কোয়াসের গেলাস আনল মিস্টার সোহলের কাছে। তিনি ডাক্তার মৈত্রকে দেখিয়ে দিলেন।

ডাক্তার মৈত্রর হাতে গেলাসটা দিয়ে বেয়ারা বলল ঃ আপনার দুটো ব্রেকফাস্ট রাখা আছে।

ডাক্তার এক নিঃশ্বাসে গেলাসটা নিঃশেষ করে বললেন ঃ লাঞ্চের সময় পয়সা নিয়ে নিও।

বেয়ারা ফিরে গেল। মিস্টার সোহল সকৌতুকে তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে।

খানিকটা তফাতে একজন রেডিও বাজাচ্ছিলেন। সেই শব্দে বিরক্ত হচ্ছিলেন ডাক্তার মৈত্র। বললেন ঃ অকারণে কেন এরা গোলমাল করে, তা বুঝতে পারিনে।

এ কথার উত্তর দিলেন মিস্টার সোহল। বললেন ঃ সারা দিন কী করবে বলুন। খবরের কাগজটাও তো নেই যে তাই নিয়ে খানিকটা সময় কাটানো যাবে।

ডাক্তার মৈত্র এবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বোধহয় বুঝতে পারলেন যে কোন কথা বললেই এই সর্দারজী তাতে ফোড়ন কাটবেন। কাজেই এঁর সামনে কোন কথা না বলাই ভাল।

কিন্তু মিস্টার সোহল চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন ঃ আন্দামানে আপনারা কোথায় উঠবেন স্থির করেছেন ?

বলে ডাক্তার মৈত্রর দিকে তাকালেন।

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ জানি নে।

মিস্টার সোহল এবারে নির্মাল্য মিশ্রর দিকে তাকালেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বোধহয় কোন ট্যুরিস্ট বাংলোয় ব্যবস্থা হয়েছে।

ট্যুরিস্ট বাংলোয়, না ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউসে ?

ঠিক জানি নে।

মিস্টার সোহল বললেন ঃ ট্যুরিস্ট বাংলোই সবচেয়ে ভাল। একেবারে সমুদ্রের ধারে। সব দিক থেকেই ভাল, অসুবিধে শুধু একটি।

নির্মাল্য মিশ্র একবার ডাক্তার মৈত্রর দিকে তাকালেন। বুঝতে পারছিলেন যে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প শুরু করলে তিনি আরও চটবেন। কিন্তু অভদ্রের মতো চুপ করে থাকাও যায় না। আর চুপ করে থাকা তাঁর স্বভাবও নয়। তাই সাহস করে বললেন ঃ কী অসুবিধে ?

গুরবন্ত্ সিং সোহল গল্পের এই সূত্রপাতে খুশী হলেন। উৎসাহিত হয়ে বললেন ঃ সদর রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে বলে যাতায়াতের জন্যে যানবাহন পাবেন না। হেঁটেই আপনাদের যাতায়াত করতে হবে, কিংবা হঠাৎ কোন ট্যাক্সি এসে পড়লে তাকেই পাকড়াতে হবে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ফেরার জন্যে তো ভাবনা নেই। কোথাও গেলে একেবারে সোজা এসে ট্যুরিস্ট বাংলোয় নামা যাবে। আর বেরোবার সময় না হয় একটু হাঁটতেই হল।

মিস্টার সোহল বললেন ঃ বেড়াতে এসে হাঁটতে হয়তো আপনাদের ভালই লাগবে। তবে একেবারেই যদি হাঁটতে না চান তো ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস নাম্বার ওয়ানে উঠবেন। সেটা একেবারে সদর রাস্তার ওপরেই। রেস্ট হাউস থেকে বেরিয়েই বাস পাবেন।

একটু থেমে বললেন ঃ রেস্ট হাউস নাম্বার টু একটু ভেতরের দিকে। কাঠের পিলারের ওপর বাড়ি। ডর্মিটরি আছে বলে একটু সস্তা। আর দলবল নিয়ে যারা আসে, তারাই বেশি পছন্দ করে। আপনাদের ঠিক পছন্দ হবে না।

কেন ?

লোকজন বেশি থাকে বলে হৈ-চৈ একটু বেশি।

বলে আড়চোখে ডাক্তার মৈত্রর দিকে তাকালেন।

তারপরেই বললেন ঃ অবশ্য আপত্তি না থাকলে আপনারা গরিবের আস্তানাতেই পায়ের ধুলো দিতে পারেন।

নির্মাল্য মিশ্র হাসলেন। তাঁর কথা বলার ধরন দেখে ডাক্তার মৈত্র যে ভেতরে ভেতরে ভীষণ চটছেন, তাও বুঝতে পারছিলেন। তাই বললেন ঃ আমাদের স্বাধীনতা একটু কম কিনা, তাই নিজেরা কিছু স্থির করা সম্ভব নয়।

মিস্টার সোহল আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ কেন ?

আমরা একটি দলের সঙ্গে যাচ্ছি। আমাদের ম্যানেজার যে ব্যবস্থা করবে, সবাইকে তাই মেনে নিতে হবে।

দলের সঙ্গে যাচ্ছেন!

নির্মাল্য মিশ্র মুচকি হেসে বললেন : হ্যাঁ।

চারিধারে চেয়ে মিস্টার সোহল বললেন : দলের আর সবাই কোথায়?

নিচে।

যাদের সঙ্গে বসে আপনি চা খাচ্ছিলেন?

ঠিক তাই।

মিস্টার সোহল যেন হতাশ হলেন অনেকটা। বললেন : ওরা নিশ্চয়ই আপনাদের রেস্ট হাউস নাম্বার টুতে নিয়ে যাবে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : ওদের ওপরেই সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি।

নিশ্চিন্ত আছেন ভাববেন না, পরে হয়তো দুশ্চিন্তায় পড়বেন।

সে আশঙ্কা করি না।

বলে নির্মাল্য মিশ্র উঠে দাঁড়ালেন। আর কিছু না বলেই চলে গেলেন নিজের কেবিনে। যেতে যেতেই দেখলেন যে ডাক্তার মৈত্র খুশী হয়েছেন এই সর্দারজীকে উপেক্ষা করে যাবার জন্যে। মনে মনে তাই একটুখানি হাসলেন নির্মাল্য মিশ্র।

দুপুরের আহার সেরে নির্মাল্য মিশ্র একটা লম্বা ঘুম দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন। সময় কাটাবার এমন নিরাপদ উপায় আর নেই। কয়েকটা ঘন্টা বেশ নিশ্চিন্তে কাটবে। তা না হলেই আবার দোটানার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে।

কথাটা মনে হতেই নির্মাল্য মিশ্রর হাসি পেল। ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র আর গুরুবন্ত্ সিং সোহল যেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হয়েছেন। আর তাঁদের দ্বন্দ্বে তাঁকেই শাস্তি পেতে হচ্ছে অকারণে। সমস্ত দায় যেন তাঁরই। মিস্টার সোহল গায়ে পড়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন, আর তিনি জবাব দিলেই ডাক্তার মৈত্রর মুখ ভার হবে। অথচ এই দুজনের কাউকেই তাঁর গ্রাহ্য করবার দরকার নেই! অথচ নির্মাল্য মিশ্র যেন ভদ্রতার খাতিরেই তা পারছেন না। মিস্টার সোহল এমন কোন অপরাধ করেননি, যে তাঁর সঙ্গে অভদ্রতা করা চলতে পারে। অথচ ভদ্রতা করলে ডাক্তার মৈত্র রেগে আগুন হবেন। এ এক অদ্ভুত অবস্থা তাঁর।

নির্মাল্য মিশ্র তাই ভাবলেন যে দুপুরে একটা ঘুম দিয়ে বিকেলে নিচে নেমে যাবেন। সন্ধ্যেবেলাটা বাদলদের সঙ্গেই কাটাবেন মনের আনন্দে। তাঁকে কাছে পেয়ে তারাও খুশী হবে।

বিছানায় শুয়ে তিনি আন্দামানের বই-এর আর একটা পরিচ্ছেদ পড়ে দেখলেন। তারপর নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লেন।

॥ দশ ॥

কেবিনের দরজায় খুটখাট শব্দ শুনে নির্মাল্য মিশ্রর ঘুম ভাঙল। প্রথমটায় তিনি ভেবেছিলেন যে বোধহয় ভোর হয়েছে। তারপরেই মনে পড়ল যে তা নয়, দুপুরে তিনি ঘুমিয়েছিলেন। কিন্তু কে তাঁকে ডাকছে তা বুঝতে না পেরে পরনের শাড়িটা ভাল করে সামলে নিয়ে দরজা খুললেন। আর বাইরে বিন্দুকে দেখতে পেয়ে খুশী হলেন অপরিমিত। 'এসো এসো' বলে হাত ধরে তাকে ভেতরে টেনে আনলেন।

বিন্দু বলল ঃ আপনাকে সবাই ডাকছে নির্মাল্যদি।

কেন বলতো!

খুব ঝগড়া বেঁধেছে।

ঝগড়া!

হ্যাঁ। বাদলদা বলছে, নেতাজীর জন্যেই আন্দামানের কী একটা নাম হয়েছিল, আর তারাপদদা বলছে যে নেতাজীকে ওরা আন্দামানে পাঠায়নি।

নির্মাল্য মিশ্র প্রশ্ন করলেন ঃ বিকাশ আর ভানু কী বলছে?

বিকাশদা তারাপদদার দলে, আর ভানুদা কোন কথাই বলছে না।

তুমি নিশ্চয়ই বাদলের পক্ষে?

ধ্যেৎ।

তবে বাদল হেরে যাবে।

কেন?

দলে ভারি যারা, তাদেরই তো জিত হয়।

তবে বাদলদা হারবে না।

কেন?

বিন্দু সহাস্যে বলল ঃ দিদি ওর পক্ষ নিয়েছে যে!

আর সদানন্দদা কী বলছেন?

বাবা আপনাকে ডেকে আনতে বললেন।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে তাঁর ঘড়িটা দেখে বললেন : বিকেল হয়ে গেছে দেখছি!

বিন্দু বলল : চা পাওয়া যাবে একটু পরেই।

তবে একটু বোসো।

বলে নির্মাল্য মিশ্র বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে শাড়িটা বদলে নিলেন। মুখে আলতোভাবে একটু পাউডার ছড়িয়ে বললেন : চল।

নিচের তলায় তাঁকে দেখতে পেয়ে সবাই হৈ হৈ করে উঠল। সদানন্দবাবু বলে উঠলেন : শিগগির আসুন, এসে ঝগড়া মেটান এদের।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : ঝগড়া মেটানো তো আমার কাজ নয়, ঝগড়া বাড়ানো আমার কাজ। আমার ফী দেবে কে, সেইটে আগে জেনে নিই।

বাদল চেঁচিয়ে উঠল : আমি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : তবে তোমার কেসটা বল।

বাদল বলল : নেতাজী এই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের নাম দিতে চেয়েছিলেন শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : ঠিক কথা।

বাদল উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে তারাপদও চেঁচিয়ে উঠল আমার কথাটাও শুনুন। আমিও আপনাকে ফী দিতে রাজী আছি।

তবে বল।

বলে নির্মাল্য মিশ্র এবারে তার দিকে তাকালেন।

তারাপদ বলল : নেতাজীকে ইংরেজ এই দ্বীপে কখনও পাঠায় নি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : এও ঠিক কথা।

তারাপদ এবারে উঠে দাঁড়িয়ে লাফাতে লাগল।

কিন্তু সদানন্দবাবু বললেন : দুজনের কথাই ঠিক হবে কেমন করে?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : নেতাজীকে তো ইংরেজ সেখানে পাঠায় নি। নেতাজী নিজে সেখানে গিয়েছিলেন। আর সেই সময়েই এই দ্বীপপুঞ্জের নাম রেখেছিলেন শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ।

বিন্দু বলে উঠল : এ ড্যানিয়েল হ্যাজ্ কাম টু জাজ্মেন্ট্।

ঝগড়া মিটে গেল। কিন্তু তারাপদর দিদি বললেন : নেতাজীর গল্পটা তাহলে বলুন ভাই।

বলে গরম জল আনবার জন্যে কেট্‌লিটা দিলেন বাদলের হাতে। কিন্তু ভানু নিঃশব্দে ছোঁ মেরে কেট্‌লি নিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে ছুটে চলে গেল।

নির্মাল্য মিশ্র সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন : দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের কথা আপনার বোধহয় মনে আছে।

সদানন্দবাবু বললেন : না থাকারই কথা।

বাদল বলে উঠল : আমাদের দিকে তাকান নির্মাল্যদি। আমাদের কারও তখনও জন্ম হয়নি।

তারাপদর দিদি সহাস্যে বললেন : তোমাদের নির্মাল্যদির জন্ম হয়েছিল কিনা সে কথাও জেনে নাও।

নির্মাল্য মিশ্র হাসলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

এই সময়ে গরম জলের কেটলি নিয়ে ভানু ফিরে এল। গল্প শুরু হয়ে গিয়েছে ভেবে তার মুখ কিছু মলিন হয়েছিল। তাই দেখে নির্মাল্য মিশ্রই বললেন : ভয় নেই, গল্প এখনও শুরু হয়নি।

তারাপদ বলল : তাহলে একেবারে গোড়া থেকেই গল্পটা আরম্ভ করুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : ইউরোপে জার্মানী আর ইতালি লড়ছিল আর সব দেশের সঙ্গে। আমাদের দেশে সুভাষচন্দ্র বসু ভাবতেন যে ইংরেজ স্বেচ্ছায় এ দেশ ছেড়ে যাবে না, তাদের তাড়াতে হবে। আর শুধু ভেতর থেকে আন্দোলন করে নয়, বাইরে থেকে আক্রমণ করাও দরকার। ভারতের ইংরেজ সরকার তাই তাঁকে ভাল চোখে দেখত না। ১৯৪০ সালের দোসরা জুলাই তাঁকে কারারুদ্ধ করল। কিন্তু পাঁচই ডিসেম্বরেই তাঁকে ছেড়ে দিতে হল।

কেন?

উনত্রিশে নভেম্বর থেকে তিনি অনশন আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁর শরীরের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ছেড়ে দেওয়া হল ঠিকই, কিন্তু তাঁকে তাঁর নিজের এলগিন রোডের বাড়িতেই সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে ঘিরে রাখা হল। কয়েকদিন পরেই, মানে ১৯৪১ এর সতেরই জানুয়ারী তিনি সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন।

কোথায়?

ঐতিহাসিকরা বলেন, আফগানিস্তান ও রাশিয়ার ভেতর দিয়ে জার্মানীতে। কিন্তু—

কিন্তু কী?

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ শুনেছি, তিনি মস্কোতে ছিলেন দিন পনেরো। স্টালিনের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা নাকি করেছিলেন। কিন্তু দেখা না পেয়েই জার্মানিতে চলে যান।

সদানন্দবাবু বললেনঃ এ রকম কথা আমিও শুনেছি বলে মনে পড়ছে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ পড়বেই। তখনও তো রাশিয়া বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। সেইজন্যেই বোধ হয় স্টালিন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাননি। সে যাই হোক, হিটলারের জার্মান সরকার তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। আর সেই বছরেরই বাইশে জুন জার্মানি যুদ্ধ ঘোষণা করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে।

তারপর?

সুভাষচন্দ্র জার্মান সরকারের কাছে প্রস্তাব করলেন, যেসব ভারতীয় সৈন্য জার্মানদের হাতে বন্দী আছে, তাদের নিয়ে তিনি একটি সেনাদল গড়বেন এবং রাশিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতের দিকে এগোবেন। জার্মান সরকার রাজী হল, কিন্তু আপত্তি করল ভারতীয় সেনারাই।

তাহলে কি হেরে গেলেন সুভাষচন্দ্র?

তিনি তো হারবার ছেলে নন। হেরে যাবার জন্যে তিনি জন্মাননি।

তবে কী হল?

ভারতীয় সেনারা তাঁর আদর্শের কথা শুনল, নিজের চোখে দেখল তাঁর ব্যক্তিত্ব। মুগ্ধ হল তারা। জার্মানীতে যে সব ভারতীয় ছিলেন, তাঁরাও তাঁর পক্ষে ছিলেন। তাই এক দিন সবাই রাজী হয়ে গেল। তৈরি হল আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় জার্মান সেনাপতিদের কাছে তারা যুদ্ধ শিখতে লাগল। ভারতীয়রা সুভাষচন্দ্রের নাম দিলেন নেতাজী এবং 'জয় হিন্দ্' বলে পরস্পরকে অভ্যর্থনা করতে লাগলেন।

তারপর?

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ তারিখটা ঠিক মনে নেই। তবে নভেম্বর মাস। পৃথিবীর লোক নাকি প্রথম শুনল যে, 'স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শক্তি যোগানোর জন্যে দেশের বাইরে এসেছেন' নেতাজী সুভাষচন্দ্র। জার্মানীতেই একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করে একটি শক্তিশালী বেতারে তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে প্রচার চালাতে আরম্ভ করলেন। জাপান যুদ্ধে নেমেছিল কবে মনে আছে তো?

বলে তিনি সদানন্দ বাবুর দিকে তাকালেন।

সদানন্দ বাবু তৎপরভাবে উত্তর দিলেন: না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: ১৯৪১-এর সাতই ডিসেম্বর জাপান ইংরেজ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা মালয় উপদ্বীপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে সিঙ্গাপুর দখল করে পরের বছর ১৫ই ফেব্রুয়ারী। তারপরেই বর্মা আক্রমণ করে রেঙ্গুন অধিকার করে নেয় মার্চের সাত তারিখ।

বাদল বলল: নেতাজীর কী হল?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: তার আগে আর একজন বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কথা বলতে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সফল হতে পারেননি। এই সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল অনেক। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আরও অনেক বিপ্লবী ছিলেন। রাসবিহারী বসু ছিলেন জাপানে। তিনি টোকিওতে সবাইকে ডাকলেন আটাশে মার্চ, পনেরই জুন ব্যাংককের কনফারেন্সে তিনরঙা পতাকার নিচে স্বাধীনতা সংঘের প্রতিষ্ঠা হল। এর আগেই সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তৈরির কাজ আরম্ভ হয়েছিল।

বাদল অসহিষ্ণুভাবে বলল: নেতাজী এদিকে এলেন কবে?

নির্মাল্য মিশ্র সহাস্যে বললেন: বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ হচ্ছে। আসব বললেই কি আসা যায়! আসবেন কী ভাবে? জার্মানী থেকে বেরোবেন কোন্ পথে?

সদানন্দবাবু বললেন: সত্যিই তো!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: ব্যাংকক্ কনফারেন্সেই ঠিক হয়েছিল নেতাজীকে ডেকে তাঁর ওপরেই সব ভার দেওয়া হবে। তাঁকে ডাকা হল বেতারে। আর নেতাজী বললেন, যেমন করে পারি চলে আসব।

কী করে এলেন?

সাবমেরিনে সমুদ্রের তলা দিয়ে। প্রথমে একটা জার্মান সাবমেরিনে এলেন আফ্রিকার পূর্ব দিকের সমুদ্রে, তারপর জাপানী সাবমেরিনে সুমাত্রা থেকে টোকিওতে এসে পেঁছিলেন ১৯৪৩-এর তেরই জুন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং জাপানের বিধান-সভায় তিনি ঘোষণা করলেন যে ভারতের মুক্তি যুদ্ধে জাপান সব রকমে সাহায্য করবে। তারপরেই নেতাজী টোকিও থেকে বেতারে ভারত স্বাধীন করার পরিকল্পনা প্রচার করলেন।

তারপর?

নেতাজী সিঙ্গাপুরে এসে পেঁছিলেন এই বছরেরই দোসরা জুলাই। এক বিশাল জনতা তাঁকে সেখানে সম্বর্ধনা করল। চৌঠা জুলাই বৃদ্ধ রাসবিহারী বসু তাঁর হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। নেতাজী অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের প্রস্তাব ঘোষণা করলেন এবং পরদিনই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভার নিয়ে বললেন, দিল্লী চলো।

তারাপদর দিদি কেটলির জলে চায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে গল্প শুনছিলেন মনোযোগ দিয়ে। সবাই নির্বাক হয়েছিল। আর বিন্দু আশ্চর্য হচ্ছিল নির্মাল্য মিশ্রর স্মরণশক্তি দেখে। একটু থেমেই তিনি বললেনঃ এই দিনটি, মানে পাঁচই জুলাই একটি স্মরণীয় দিন। নেতাজীর কথা শুনে পৃথিবীর লোক চমকে উঠেছিল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে তিনি বলেছিলেন, এতদিন আমি অনুভব করেছি যে যদিও ভারত সর্বতোভাবে স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে, তার একমাত্র অভাব ছিল মুক্তিবাহিনীর। এই মুক্তিবাহিনী ছিল বলেই জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলেন, আর গ্যারিবল্ডি ইতালিকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন তাঁর সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাহায্যে। আজ আপনাদের সামনেও সুযোগ এসেছে ভারতের প্রথম জাতীয়বাহিনী গঠনের। এই কাজ করেই আপনারা স্বাধীনতা অর্জনের শেষ বাধা অতিক্রম করবেন।

জুলাই-এর নয় তারিখে আবার তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রবাসী ভারতীয়দের তিনি বললেন, পূর্ব এশিয়ার ভারতবাসীদের আজ টাকা ও লোকবল দিয়ে সংগঠিত হবার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। আমাদের তিন লাখ সৈন্য ও তিন কোটি ডলার চাই। আজ সেই দিন এসে গেছে, যেদিন আমি পৃথিবীর লোককে ও শত্রুদেরও প্রকাশ্যভাবে বলতে পারি যে কী ভাবে আমরা দেশকে মুক্ত করতে চাই। ভারতের বাইরে ভারতীয়, বিশেষভাবে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা যে সেনাবাহিনী গঠন করেছেন, তা ভারতের বৃটিশ সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করতে সক্ষম। যেদিন আমরা তা করব, সেদিনই ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লব আসবে। শুধু অসামরিক লোকেরাই নয়, বৃটিশ পতাকার নিচে যে ভারতীয় সেনাবাহিনী আছে তারাও এই বিপ্লবে যোগ দেবে। এইভাবে ভিতর ও বাহির থেকে এক সঙ্গে আক্রমণ হলে বৃটিশ শক্তির পতন হতে বাধ্য।

সদানন্দবাবু অভিভূত হয়ে শুনছিলেন। নির্মাল্য মিশ্র থামতেই তিনি বললেনঃ একটু একটু মনে পড়ছে। নেতাজীর কথা শোনবার জন্যে

আমরা কী অধীর আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। আর কত ভয়ে ভয়ে কত সাবধানে সেই কথা শুনতাম।

বিন্দু বলল : ভয়ে ভয়ে কেন ?

সদানন্দবাবু বললেন : পুলিশের ভয়ে। শুনেছিলাম যে নেতাজীর কথা শুনলে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : দেশে থাকতেও নেতাজী এই রকমই ভাবতেন। অন্যান্য দেশনেতার মতো তিনি বিশ্বাস করেননি যে ইংরেজ বন্ধুভাবে ভারতীয়ের হাতে ক্ষমতা দিয়ে চলে যাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে দেশের বাইরে থেকে ইংরেজের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

হঠাৎ তাঁর মনোযোগ ভানুর দিকে আকৃষ্ট হতেই তিনি থেমে গেলেন। দেখলেন যে ভানু খুব মৃদুস্বরে তারাপদর দিদিকে কিছু বলছে। তার কথা শুনে তারাপদর দিদি যেন চমকে উঠলেন। তারপরেই চা তৈরির কাজে লেগে গেলেন। নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে ভানু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে চায়ের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। নির্মাল্য মিশ্র খুশী হলেন তাঁর গল্প বলার সাফল্যে। কিন্তু মুখে বললেন : গল্পটা জমাতে পারলাম না।

বাদল আশ্চর্য হয়ে বলল : কেন ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : ভানুর মন ছিল চায়ের দিকে।

হেসে উঠলেন সবাই! কিন্তু লজ্জা পেলেন তারাপদর দিদি। ভানুর কোন ভাবান্তর হল না।

তারাপদর দিদি খুব তাড়াতাড়ি চা বিতরণ করে দিলেন। দু এক চুমুক চা খেয়েই সদানন্দবাবু বললেন : থামবেন না, চা খেতে খেতেই গল্প বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : ১৯৪৩ সালের একুশে অক্টোবর নেতাজী আজাদ হিন্দ্‌ সরকার অর্থাৎ স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন সিঙ্গাপুরে, আর বললেন যে ভারতের মাটিতে এই সরকার প্রথম কাজ শুরু করবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে।

বিন্দু বলে উঠল : এতক্ষণ পরে আন্দামানের নাম এল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : কিন্তু নেতাজী তখনই এসে পৌঁছননি। নভেম্বরের আট তারিখে তিনি জাপান থেকে বললেন, আমাদের মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমরা ছটির মধ্যে পাঁচটি কাজে সফল হয়েছি। যুদ্ধের অবস্থা

সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান হয়েছে। বৃটিশের শত্রুদের আমরা সহানুভূতি পেয়েছি, ঘরে বাইরে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছে, এই বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধও মিলে গেছে এবং স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ্ সরকারেরও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বাকি আছে আমাদের মিত্রদের সহায়তায় শত্রুর ওপরে শেষ আঘাত হানতে।

নিঃশব্দে সবাই নির্মাল্য মিশ্রর কথা শুনছিল।

তিনি বললেন ঃ দুদিন পরেই শোনা গেল যে জাপানীরা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিকার নেতাজীকে ছেড়ে দেবে।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ কবে তারা এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেছিল ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ দু' রকম কথা শুনেছি।

কী রকম ?

সুভাষচন্দ্রের এক জীবনীতে পড়েছি যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ জাপ্ যুদ্ধ জাহাজের সাহায্য নিয়ে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে, আর অন্যত্র পড়েছি যে সাত হাজার জাপানী সেনা এসে আন্দামান দখল করে নিয়েছিল ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে। একটাও গোলাগুলি চলে নি।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ গোলমেলে কথায় আমাদের দরকার নেই। আপনি তার পরের ঘটনা বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ জাপানীরা এই দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে দেবে শুনেই নেতাজী এর নাম ঘোষণা করলেন শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ। টোকিওর জার্নালিস্টদের বললেন যে ভারতবাসীদের কাছে এই দ্বীপপুঞ্জেই হবে ইংরেজের কবল মুক্ত প্রথম মাটি। আর এই মাটিতেই আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রতিষ্ঠা হবে।

তারপর ?

আন্দামানে নেতাজী কবে এসেছিলেন জানো ?

বলে নির্মাল্য মিশ্র তাকালেন তারাপদর দিকে।

তারাপদ বলল ঃ জানি নে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ১৯৪৩ সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর। তিন দিন তিনি সেখানে ছিলেন। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা তিনি পোর্ট-ব্লেয়ারে তুলেছিলেন ৩০শে ডিসেম্বর। ভারত স্বাধীন হবার সাড়ে তিন বছর আগে এই ঘটনা ঘটেছিল আন্দামানে।

বাদল বলল ঃ জাপানীরা নিজে থেকেই আন্দামান ছেড়ে দিয়েছিল ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : নানা কারণেই তারা এই দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে ছেড়ে দিতে পারছিল না। ১৯৪৩ সালটা আন্দামানের পক্ষে খুব খারাপ সময় ছিল। প্রথমে একটা পীস কমিটি ছিল। তারপর বছরের শেষ দিকে কর্তৃত্ব মিলিটারীর হাতে যেতেই দুর্দশা আরম্ভ হয়। একে উৎকট খাদ্যাভাব, তারপর সবাইকে দাবিয়ে রাখবার জন্য অত্যাচার। ইংরেজের একটা কমান্ডো পার্টি এসে ঢুকে পড়েছিল। তারা জাপানীদের খবর ইংরেজকে দিত, আর রোজ ডুবত জাপানী জাহাজ। তাই জাপানীরা সবাইকে সন্দেহ করতে লাগল। জেলে দিল অনেককে, অত্যাচার করে মারলও অনেককে। তারপর নেতাজী এসে পড়ায় সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দু মাস পরে নেতাজী লেফটেনান্ট কর্ণেল লোকনাথনকে পাঠালেন চীফ কমিশনার করে। তাঁর আজাদ হিন্দ্ সরকার তখন রেঙ্গুনে চলে গেছে। লোকনাথন এসে আন্দামানের জীবনযাত্রার উন্নতি করলেন।

সদানন্দবাবু বললেন : কিন্তু জাপানীরা তো শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিল!

তা গিয়েছিল। আমেরিকানরা ভারতে এসেছিল ইংরেজকে সাহায্য করতে। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী ও মে মাসে আরাকান সেন্টারের কয়েক জায়গায় জয়লাভ করেছিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। মনিপুরে নেতারা পতাকা তুলেছিলেন, কোহিমা পর্যন্ত এসেছিল তাঁর ফৌজ। কিন্তু তারপর জাপানীদের পিছু হটতে হল। ডিসেম্বর মাসে নেতাজী মালয়ে চলে গেলেন। তারপরেও কিছুদিন যুদ্ধ চলেছিল। যুদ্ধ শেষ হল আমেরিকার অ্যাটম বোমা জাপানের মাটিতে পড়বার পর। সেদিন নেতাজী কী বলেছিলেন জানো?

কী বলেছিলেন?

বলেছিলেন, অদৃষ্টের মতো ইতিহাসের পথ খুবই বিচিত্র। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে বৃটিশের অধীন ভারতীয় সেনার দেখা দরকার ছিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। বার্মায় এসে যখন তারা দেখল, তখন বুঝল যে এত দিন তারা ভুল জেনে এসেছে—আজাদ হিন্দ্ ফৌজ জাপানীদের পাপেট আর্মি নয়। ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি, আই. এন এ.। শত্রুরাও এ কথা স্বীকার করেছিল।

সবার হাতের চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভানু গেলাস আর পেয়ালা

সংগ্রহ করছিল ধরুয়ে রাখবার জন্যে। নির্মাল্য মিশ্র নিজের হাতের পেয়ালাটা তাকে দিয়ে বললেন ঃ এই যুদ্ধে আন্দামানের লাভ হয়েছিল সব চেয়ে বেশি।

কী রকম ?

বলে সদানন্দবাবু তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রর দিকে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ পরের বছরেই আন্দামানের কালাপানি নাম ঘুচে গেল। সেলুলার জেলের তিন হাজার কয়েদী আগেই ফিরে গিয়েছিল। এবং পরে ফিরে গেল বাকি চার হাজার। আন্দামান আর দ্বীপান্তর রইল না, আন্দামান হল আন্দামানের অধিবাসীদের।

॥ এগার ॥

এমনি করে আরও একটা দিন কেটে গেল। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার মৈত্র এসে নির্মাল্য মিশ্রর পাশে বসলেন। বললেন ঃ আর ভাল লাগছে না।

নির্মাল্য মিশ্র একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ কেন বলুন তো !

বড় এক ঘেঁয়ে লাগছে। শুধু জল দেখে দেখে ক্লান্ত [illegible] পড়েছি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তা হবেনই তো। আপনি তো কারও সঙ্গে মিশলেন না !

কারও সঙ্গে মেশবার জন্যে তো আসিনি !

জানি। কিন্তু আমরা সবার সঙ্গেই মিশেছি। সত্যি বলতে কি, জাহাজের সব যাত্রীকেই এখন এক পরিবারের বলে মনে হচ্ছে। কাল তাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে।

কষ্ট হবে !

তা হবে বৈকি ! অনেকের সঙ্গেই যে পরিচয় হয়েছে ! কত জনের নিমন্ত্রণ পেয়েছি জানেন ?

ডাক্তার মৈত্র গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ সারাক্ষণ ডেকে কাটালে নিমন্ত্রণ তো পাবেনই ! কিন্তু কাজটা ভাল করেননি।

কোন্ কাজটা ?

এই যে—

বলেই ডাক্তার মৈত্র থেমে গেলেন।

নির্মাল্য মিশ্র চেয়ে দেখলেন যে গুরবন্ত্ সিং সোহল এই দিকে আসছেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই ডাক্তার মৈত্র চুপ করে গেলেন।

মিস্টার সোহল কাছে এসে নির্মাল্য মিশ্রকে বললেন : এখন একটা ছোট অনুরোধ নিয়ে আপনার কাছে আসছি।

অনুরোধ!

হ্যাঁ, অনুরোধ। খুব আশা করছি যে আমার অনুরোধ আপনি রাখবেন।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন : এইরকম ভূমিকা করলেই ভয় করে। অথচ যদি ভূমিকা না করে সরাসরি কোন কথা বলতেন, তাহলে হয়তো খুব সহজেই রাজী হওয়া যেত।

তারপরেই ডাক্তার মৈত্রর দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে তাঁর দৃষ্টি খুব কঠিন হয়ে উঠেছে। বেশ বিরক্ত হয়েছেন তিনি।

মিস্টার সোহল বললেন : একদিন সন্ধ্যাবেলায় আপনি মানে আপনারা এই গরিবের কুটীরে আসবেন। আমার দু একজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করব। একটু খাওয়া দাওয়া হবে। আর—

আর কী?

একটু গান বাজনা! যদি আপত্তি না থাকে তো একখানা ভজন গেয়ে শোনাবেন আমার বন্ধুদের।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে ফেললেন।

মিস্টার সোহল বললেন : আপনি হাসবেন না মিস মিশ্র! আমরা সেখানে কীভাবে জীবন যাপন করি, তা আপনি জানেন না। বাড়িতে অতিথি এলে আমরা খুব খুশী হই। আর—

বলুন।

রেডিওতেই আমরা গান-বাজনা শুনি তো, নিজেদের মধ্যে এ সবের চর্চা নেই।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আমি তো গায়ক নই, গান গাই নিজের শখে। চেষ্টা করলে আপনারাও আমার মতো গাইতে পারবেন।

মিস্টার সোহল বললেন : সে বয়েস আর নেই। সময় মতোই এ সব শিখতে হয়। আর একবার শিখলে সারা জীবন অভ্যাস রাখা সম্ভব।

তারপরেই বললেন : আপনার গলা শুনে আমার কী মনে হয়েছে জানেন?

কী?

মানুষের জীবনে গানেরও প্রয়োজন আছে। গান মানুষকে ওপরের দিকে নিয়ে যায়।

মিস্টার সোহল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলেন। নির্মাল্য মিশ্রর ইচ্ছা হল, তাঁকে পাশে বসতে বলেন। কিন্তু তা বলার সাহস পেলেন না। ডাক্তার মৈত্র যেন একদিনেই তাঁর অভিভাবক হয়ে গেছেন। তাঁরই ভয়ে তিনি চুপ করে রইলেন।

মিস্টার সোহল বোধহয় এ কথা বুঝতে পারলেন। বললেন ঃ আপনাদের আর বিরক্ত করব না। কাল হয়তো একথা বলার সময় পেতাম না। তাই আজই অনুরোধটা জানিয়ে রাখলাম।

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ কাল সময় পাওয়া যাবে না কেন?

মিস্টার সোহল বললেন ঃ ঘুম থেকে উঠেই হয়তো দেখবেন যে আমরা জেটিতে পেঁছে গেছি।

দূর থেকে আন্দামান দেখতে পাব না?

দেখতে চান বুঝি?

নিশ্চয়ই চাই। এই অকূল সমুদ্র থেকে একটি প্রাণবন্ত জায়গা জেগে উঠবে, তা দেখতে চাইব না।

মিস্টার সোহল হেসে বললেন ঃ আপনার ভাগ্য ভাল হলে তা নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।

বলে আর দেরি না করে সরে গেলেন অন্য ধারে।

মিস্টার সোহল সরে যেতেই ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ তবু ভাল যে আপনি ঝপ্ করে রাজী হয়ে যাননি। যাই ভাবুন আপনি, লোকটা সুবিধের নয়। বাঙলায় কথা বলছে বলেই ভাববেন না যে, যা বলল তা সবই সত্যি।

নির্মাল্য মিশ্র এ কথা মেনে নিতে পারলেন না। কোনও উত্তরও দিলেন না। তিনি তখন অন্য কথা ভাবছিলেন। ভাবছিলেন, আন্দামানের কথা। কাল ভোরবেলায় এই জাহাজ আন্দামানে ভিড়বে। দূর থেকে এই আন্দামান কেমন দেখায়। তা দেখবার বাসনা তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠল। অথচ ভোরে ওঠার অভ্যাস তাঁর নেই। কেউ না ডাকলে এখনও তিনি অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতে পারেন। বিকেলেও তাই হয়। না ঘুমোলে কোন কথা নেই, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে সহজে ঘুম ভাঙে না। কাল ভোরেও যে তাঁর ঘুম ভাঙবে না, সেই বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। কিন্তু ডাক্তার মৈত্রকে এ কথা বলা যায় না, বলা যায় না গুরুবন্ত সিং সোহলকে। তাঁরা কী ভাববেন!

ঠিক এই সময়েই বাদল আর কিন্তু হুড়মুড় করে উপরে উঠে এল।

বাদল বলল ঃ শুনেছেন নির্মাল্যদি, আমাদের জাহাজ নাকি শেষ রাতেই আন্দামানে পেঁছিবে।

শেষ রাতে!

হ্যাঁ, ভোরবেলাতেই আমাদের নেমে পড়তে হবে।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র মোটেই খুশী হতে পারলেন না। তাই দেখে বিন্দু খুব আশ্চর্য হল। বলল ঃ আপনার আনন্দ হচ্ছে না নির্মাল্যদি?

না ভাই।

কেন?

খবরটা পেয়ে মন আমার খুব খারাপ হয়ে গেল।

বাদল আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ জাহাজেই আপনার ভাল লাগছিল?

তাও না। জল দেখে দেখেও হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

তবে?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ রাতের অন্ধকারে না পেঁছে জাহাজ যদি দিনের আলোয় পেঁছিত, তাহলে খুব ভাল হত। সব দেখতে দেখতে পেঁছিতাম।

বিন্দু বলে উঠল ঃ ঠিক বলেছেন। আমারও সব দেখবার ইচ্ছে।

বাদল বলল ঃ তার জন্যে ভাবনা কী! আমরা তো ডেকেই ঘুমোই। খালাসীদের বলে রাখব, সময়মতো জাগিয়ে দেবে আমাদের। আর আমরা আপনাদের সবাইকে জাগিয়ে দেব।

জাগিয়ে দেবে ভাই! তা হলে তোমাকে খুব লক্ষ্মী ছেলে বলব।

বলেই নির্মাল্য মিশ্র আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলেন।

শেষ রাতে উঠবার জন্য নির্মাল্য মিশ্র আজ তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে শুয়ে পড়লেন। তবু তাঁর ঘুম ভাঙল না। কেবিনের দরজায় করাঘাতের শব্দেই তাঁর ঘুম ভাঙল। জেগেই তার মনে পড়ল বাদলের কথা। বাদল তাঁকে জাগিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাই বাদল তাঁকে ডাকতে এসেছে ভেবে তিনি ধড়মড় করে উঠেই দরজা খুলে দিলেন। আর দরজা খুলে দিয়েই লজ্জা পেলেন অপরিমিত। নিজের বেশ বাস ঠিক করতে করতে বললেন ঃ আপনি।

গুরবক্স সিং সোহলও খানিকটা লজ্জিত হয়েছিলেন। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ আপনি দূরে থেকে আন্দামান দেখতে চেয়েছিলেন তো?

নির্মাল্য মিশ্র কোন রকমে বললেন ঃ হ্যাঁ।

এইবারে দেখা যাবে। আপনি আসুন।

বলে ভদ্রলোক আর অপেক্ষা না করে ফিরে গেলেন।

কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিলেন নির্মাল্য মিশ্র। ভাবলেন যে আন্দামান বোধহয় এখনও দেখা যাচ্ছে না। মিস্টার সোহল বলে গেলেন যে এইবারে দেখা যাবে। অর্থাৎ এখুনি বেরিয়ে না পড়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েই বেরোনো ভাল। কিন্তু ভদ্রলোক নিজে কি সারারাত জেগে কাটিয়েছেন! কী করে বুঝলেন যে এইবারে আন্দামান দেখা যাবে! জল দেখেও কি কিছু বোঝা যায়! না অন্ধকারেও কিছু দেখতে পেয়েছেন তিনি!

নির্মাল্য মিশ্র খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলেন। তারপর বেরিয়ে পড়লেন দরজা খুলে।

বাইরে বাতি জ্বলছে। কিন্তু চারিধারেই অন্ধকার। আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নির্মাল্য মিশ্র খানিকটা এগিয়ে গিয়ে চারি ধারে তাকাতেই মিস্টার সোহলকে দেখতে পেলেন। এক জায়গায় তিনি একা দাঁড়িয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে চেয়ে। স্থির হয়ে আছেন ছবির মতো, বোধহয় অন্যমনস্ক হয়েই আছেন। নির্মাল্য মিশ্রর পায়ের শব্দ তিনি পেলেন না।

তাঁর কাছে এসে নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আমার খুব দেরি হয়ে গেল, তাই না?

নির্মাল্য মিশ্র যে এত কাছে এসে গিয়েছিলেন, গুরবন্ত্ সিং সোহল তা বুঝতে পারেননি। তাই তাঁর কথা শুনে চমকে উঠলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে হেসে বললেন ঃ একটুও না।

বলেই সামনের দিকে দেখিয়ে দিলেন।

নির্মাল্য মিশ্র দেখলেন যে একটু একটু করে স্বচ্ছ হয়ে আসছে অন্ধকার। আর এই অন্ধকারই যেন এক জায়গায় বেশ ঘন হয়ে আছে, আর কোন দিকে কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। গভীর বিস্ময় নিয়ে নির্মাল্য মিশ্র প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি কি সারারাত জেগেই কাটিয়েছেন?

মিস্টার সোহল হাসলেন একটুখানি, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তাই নির্মাল্য মিশ্র আবার বললেন ঃ আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়েছি।

মিস্টার সোহল এইবারে বললেন ঃ আমার সঙ্গে একটি ছোট ফোল্ডিং টাইমপিস আছে। তাতে অ্যালার্ম দিয়ে বালিসের তলায় রেখেছিলাম।

নির্মাল্য মিশ্র যেন আঁৎকে উঠলেন।

তাই দেখে মিস্টার সোহল বললেনঃ আপনি কি ভয়ের কথা ভাবছেন?

মাথা নেড়ে সমর্থন করলেন নির্মাল্য মিশ্র।

মিস্টার সোহল হেসে বললেনঃ না, ভয় করল না। আপনার নামেই সাহস পেয়ে গেলাম আমি।

কিন্তু—

কী করবেন ডাক্তার সাহেব! মারপিট! ওতে ভয় পাই নে। কিন্তু আপনাকে তো খুশী করতে পেরেছি!

বলে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রর দিকে।

নির্মাল্য মিশ্রর কানের পাশ দুটো লাল হয়ে উঠল। অন্ধকারে মিস্টার সোহল নিশ্চয়ই তা দেখতে পেলেন না।

চারি দিকের অন্ধকার এখন স্বচ্ছ হয়ে আসছে। আরও ঘন দেখাচ্ছে খানিকটা জায়গা। নির্মাল্য মিশ্র প্রশ্ন করলেনঃ ঐ কি আন্দামান?

না।

ও একটা দ্বীপ নয়?

মিস্টার সোহল বললেনঃ কোকো আইল্যান্ডস্।

অনেকগুলো দ্বীপ?

দুটো গ্রেট কোকো ছাড়িয়ে এসেছি, দেখতে পাই। এটা লিট্‌ল কোকো। আরও আছে কিনা জানি নে। তবে ও দ্বীপগুলো আমাদের নয়, বার্মার অধীন। আমরা ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছি।

দেখতে না দেখতেই সেই অস্পষ্ট দ্বীপ মিলিয়ে গেল। রোমাঞ্চ হয়েছিল নির্মাল্য মিশ্রর শরীরে। বললেনঃ কী অপরূপ মনে হচ্ছিল, তাই না!

নির্মাল্য মিশ্রর মনে হয়েছিল যে এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। সমুদ্র থেকে মাটি দেখতে যে এমন ভাল লাগে, এর কোন ধারণাই তাঁর ছিল না। ঠিক এই সময়ে দুপদাপ করে বাদল ছুটে এল উপরে। প্রথমে তাঁর কেবিনের দিকে গেল। দরজা খোলা দেখে ছুটে এল এই দিকে। বললঃ আপনি উঠে পড়েছেন নির্মাল্যদি? এই দ্বীপের নাম কোকো আইল্যান্ড।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেনঃ জানি।

তারপরেই বাদল মিস্টার সোহলকে দেখে বললঃ আপনি আছেন! তবে আর নির্মাল্যদির কোন ভাবনা নেই। আপনি তো সবই জানেন।

মিস্টার সোহল বললেন ঃ যতটুকু জানি, বলব।

তাহলে আমি আর ওপরে আসব না।

বলে বাদল তেমনি করেই ছুটে নেমে গেল।

কোকো চ্যানেল পেরিয়ে জাহাজ এগিয়ে চলল নর্থ আন্দামানের দিকে। চারিদিক তখন ফর্সা হতে আরম্ভ করেছে। মিস্টার সোহল বললেন ঃ বেলা দশটার আগে পৌঁছনো যাবে বলে মনে-হচ্ছে না।

এত সময় লাগবে ?

জাহাজঘাটায় ভিড়তে অনেক সময় লাগে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ এখন আর কিছু বিরক্তিকর বলে মনে হচ্ছে না।

মিস্টার সোহল বললেন ঃ এই হল নিয়ম। গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারছি জানতে পারলে নতুন উৎসাহ পাওয়া যায়।

তাই তো দেখছি।

মিস্টার সোহল বললেন ঃ আমরা এবারে নর্থ আন্দামানের পাশ দিয়ে যাব। তার আগেই পাব ঈষ্ট আইল্যান্ড আর ল্যান্ডফল আইল্যান্ড, তারপরে পিকক্ আইল্যান্ড। নর্থ আন্দামানের পরেও ছোট ছোট অনেক দ্বীপ আছে। তার মধ্যে টার্টল্ আইল্যান্ডস্ আমি চিনি। পোর্ট-ব্লেয়ার থেকে রস আইল্যান্ড দেখতে নিশ্চয়ই যাবেন। অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে। ভালো লাগবে আপনার !

তারপরে বললেন ঃ নর্থ আন্দামানের দক্ষিণে মিড্ল আন্দামান। তারপরেই সাউথ আন্দামান।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ এত নাম আপনি মনে রাখতে পেরেছেন !

একবারে কি আর পেরেছি ! বারে বারে যাতায়াত করে শুনেছি এই সব নাম। পোর্ট-ব্লেয়ার তো সাউথ আন্দামানে ! তাই আমরা আরও অনেক দ্বীপ দেখতে পাব E-লং আইল্যান্ড, গীটার আইল্যান্ড, বার্ট্ল আইল্যান্ডস্, হেনরি লরেন্স, ঈস্টার ইংলিস, পীল হ্যাড্লক—এই সব নাম।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন ঃ একটা নামও কিন্তু আমার মনে থাকবে না।

তা আপনি বলতে পারেন না। মন এমন জিনিষ যে আপনার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপরে কিছুই নির্ভর করে না। কী মনে থাকবে আর কী থাকবে না। তা আপনি জানেন না। জানে আপনার মন।

নির্মাল্য মিশ্র মেনে নিলেন এই কথা, বললেন ঃ তা সত্যি !

মিস্টার সোহল একসময়ে বললেন ঃ আমার অনুরোধটা কি আপনি ভেবে দেখেছেন ?

কোন অনুরোধ ?

ভুলে গেছেন ! কাল সন্ধ্যেবেলায় যে আপনাকে বললাম। একটি সন্ধ্যা আমাদের সঙ্গে—

না না, সে কথা ভুলে যাব কেন ! কিন্তু কী জানেন ?

জানি।

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ জানেন আপনি ?

জানি। ডাক্তার সাহেবের ভয়েই আপনি কথা দিতে পারছেন না।

কিন্তু তিনি আমার অভিভাবক নন।

মিস্টার সোহল বললেন ঃ তাও জানি। কিন্তু তাঁকে রাজী করাতে পারলে আপনার আপত্তি হবে না তো ?

নির্মাল্য মিশ্র সাগ্রহে বললেন ঃ পারবেন তাঁকে রাজী করাতে !

চেষ্টা করব। আর চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তাহলে আর আমার আপত্তি কিসের ! তবে আমাদের দলে কিন্তু আরও সাতজন আছেন।

মিস্টার সোহল খুশী হয়ে বললেন ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনাদের সবাইকে নিয়ে যাব। আর সবার যাতে ভাল লাগে, তার ব্যবস্থা করব !

নির্মাল্য মিশ্র খুশী হলেন এই ভদ্রলোকের আন্তরিকতায়। কিন্তু কোন কথা বললেন না।

মিস্টার সোহলও অনেকক্ষণ নীরবে রইলেন। তারপর বললেন ঃ একটা কথা আমি এখনই বলে রাখি।

বলুন।

এই ব্যবস্থা করতে আমার দু-চার দিন দেরি হতে পারে।

তাতে ক্ষতি নেই।

কেন, সে কথা জিজ্ঞেস করলেন না ?

হয়তো কোন অসুবিধা আছে।

মিস্টার সোহল বললেন ঃ অসুবিধা নয়। এখানে শুনে গিয়েছিলাম যে আগামীকাল ভোরে কার নিকোবরের জাহাজ ছাড়তে পারে। যদি ছাড়ে, তবে আমাকে দু তিন দিনের জন্যে বাইরে যেতে হবে।

নির্মাল্য মিশ্র কৌতূহলী হয়ে ফিরে তাকালেন।

মিস্টার সোহল বললেনঃ এ দিকে জাহাজ চলাচলের তো কোন ঠিক ঠিকানা নেই! লিট্‌ল আন্দামান বা কার নিকোবরে কাজ থাকলে ভারি অসুবিধে! হাত-পা আমাদের বাঁধা।

নির্মাল্য মিশ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কী ভাবে যাবেন আপনি?

মিস্টার সোহল বললেনঃ জাহাজ ছাড়লে অসুবিধা কিছু নেই। টিকিট কেটে উঠে পড়ব। সারাদিন লিট্‌ল আন্দামানে কাটবে, রাতে জাহাজ ছেড়ে পরদিন সকালেই পেঁছিব কার নিকোবরে।

তারপর?

সেই জাহাজেই পোর্ট-ব্লেয়ারে ফিরে আসব।

নির্মাল্য মিশ্র বলে উঠলেনঃ আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন?

পরম বিস্ময়ে মিস্টার সোহল তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেনঃ আপনি কি সত্যিই যেতে চান?

মিথ্যে বলব কেন?

মিস্টার সোহল বললেনঃ আন্দামানে বহু যাত্রী আসেন। কিন্তু পোর্ট-ব্লেয়ার থেকে বাইরে যেতে কেউ চান না। নিকোবর দেখতে চেয়েছেন, এমন কাউকে আমি দেখিনি।

নির্মাল্য মিশ্র যেন একটু লজ্জা পেলেন। বললেনঃ আপনি তো মাঝে মাঝেই যাতায়াত করেন, তাই না?

ব্যবসার খাতিরে করতেই হয়।

তবে তো টেন ডিগ্রী চ্যানেল পেরোবার অভিজ্ঞতা আপনার আছে!

মিস্টার সোহল বললেনঃ মাঝে মাঝে বেশ ভয় করে। এ দিকের জাহাজগুলো খুব পুরনো তো, ডুবে যাবারই ভয়। কিন্তু ডোবে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি কার নিকোবরে পেঁছে গেছি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, তাই না!

অ্যাড্‌ভেঞ্চার বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু আপনি আমার একটা কথা রাখবেন।

বলুন।

এ কথা আপনি আর কাউকে বলবেন না।

মিস্টার সোহল আশ্চর্য হয়ে বললেনঃ কী ভাববেন সবাই?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আমি হারিয়ে গেছি বলে ভাববে তো! তা ভাবুক। যদি পারেন তো পরে কাউকে দিয়ে খবর পাঠাবেন।

মিস্টার সোহল হেসে বললেন : বেশ। জাহাজের খবর নিয়ে আমি বিকেলের দিকে আপনাকে জানাব।

পূর্বাকাশে প্রভাতের আলো তখন ঝলমল করছে। নির্মাল্য মিশ্র হঠাৎ দেখতে পেলেন যে খানিকটা তফাতে বসে ডাক্তার মৈত্র গম্ভীরভাবে চুরট টানছেন। তাঁদের দুজনকে যে একসঙ্গে দেখতে পেয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাছে আসেননি। মিস্টার সোহল সরে না গেলে তিনি এ দিকে আসবেন না। মিস্টার সোহলও তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন। বললেন : এখনও তো অনেক সময় আছে! আসুন না, কিছু খেয়ে আসা যাক।

নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারছেন যে তাঁর সঙ্গে যেতে দেখলে ডাক্তার মৈত্র আরও চটবেন। কিন্তু মিস্টার সোহলকে সে কথা বলতে পারলেন না। তাই অন্য ভাবে বললেন : স্নানটা আমি জাহাজেই সেরে নেব ভাবছি। আপনি বরং খেয়ে নিন।

বলে নিজের কেবিনে চলে গেলেন। বাইরে রেখে গেলেন মিস্টার সোহল ও ডাক্তার মৈত্রকে।

॥ বারো ॥

নির্মাল্য মিশ্র স্নান সেরে একা গিয়ে ব্রেকফাস্ট করলেন। তারপর বেরিয়ে এসে দেখলেন যে জাহাজ পোর্ট-ব্লেয়ারের দিকে এগোচ্ছে। প্রায় সমস্ত দ্বীপেই নারিকেল ও সুপারীর বন। এ যে কত অসংখ্য তা ধারণা করা যায় না।

নির্মাল্য মিশ্র ডাক্তার মৈত্রকে দেখতে পেলেন না। তাঁর বদলে মিস্টার সোহল এগিয়ে এলেন। বললেন : ঐ দেখুন রস আইল্যান্ড। এই দ্বীপের কথাই আমি আপনাকে বলেছি। ইংরেজ শুনেছি এখানেই প্রথমে এসেছিল। নেতাজীও এসেছিলেন এই দ্বীপে। এর ইতিহাসটাও কারও কাছে জেনে নেবেন।

পোর্ট-ব্লেয়ার এসে গেছি। ভিতরের দিকে অ্যাবার্ডিন জেটি। যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু মিস্টার সোহল শান্তভাবে বললেন : কখনও গোয়ায় গেছেন?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ   না।

আন্দামানের অনেক জায়গায় আপনার গোয়ার কথা মনে পড়বে। বিশেষ করে বৌতম থেকে ওল্ড গোয়ার পথ।

আরও স্পষ্ট হচ্ছে পোর্ট-ব্লেয়ার। দ্বীপের মাঝখান দিয়ে ব্যাথাম জেটি ছাড়িয়ে জাহাজ এগিয়ে যাবে। হ্যাডো জেটিতে ভিড়বে এই এম. ভি. আন্দামান্স।

মিস্টার সোহল জিজ্ঞাসা করলেন ঃ   কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ   একটা পাহাড়ের মাথায়—

ঠিকই দেখেছেন। ঐ হল আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেল। তার পাশেই হাসপাতাল আর অফিস বাড়ি।

নির্মাল্য মিশ্র সেইদিকেই তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

মিস্টার সোহল বললেন ঃ   এখানকার পথ খুব উঁচু নিচু। আর চারিদিকে নারকেল আর সুপারি গাছ।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ   অপূর্ব দৃশ্য !

যথাসময়ে কিছুক্ষণ টানা-পোড়েনের পর জাহাজ ভিড়ল পোর্ট-ব্লেয়ারের হ্যাডো জেটিতে। জাহাজঘাটায় ভিড়ের শেষ নেই। সব জায়গাতেই একই রকম অবস্থা। কোথাও লোকে আত্মীয় বন্ধুদের তুলে দিতে আসে, কোথাও আসে নামিয়ে নিতে। এক জাহাজ ভর্তি যাত্রীকে নামিয়ে নিতে প্রায় আর এক জাহাজ লোক এসেছে। তাদের উল্লাস ও উত্তেজনায় মুখর হয়ে উঠেছে চারি দিক। নিজেদের লোক দেখতে পেয়েই আনন্দে প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠছে। এখানে এই আনন্দ ও উত্তেজনা অন্য জায়গার চেয়ে বেশি বলে মনে হল নির্মাল্য মিশ্রর কাছে। ঠিক এ রকমটি যেন আর কোথাও তিনি দেখেননি।

বাদলদের ছোট দলটি একত্র হয়েছে। তাদের নেবার জন্য কেউ আসেনি। কেউ আসবে না। আসবার কথা নয়। তারা ট্যুরিস্ট। দেশী ট্যুরিস্টদের অভ্যর্থনার কোন ব্যবস্থা নেই এ দেশে। ট্রাভেল এজেণ্ট নিয়োগ করলে তাদের প্রতিনিধিরা আসে রিসিভ্ করতে। তারাই সব ব্যবস্থা করে। কোন রকমের দুর্ভাবনা পোহাতে হয় না ট্যুরিস্টদের।

নির্মাল্য মিশ্র ইতিমধ্যে বাদলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকবেন, তাঁর জন্যে যেন আলাদা কোন ব্যবস্থা করা না হয়। বাদল বেশ আশ্চর্য হয়েছিল, বলেছিল ঃ আপনার ব্যবস্থা তো খুব ভাল জায়গায় হয়েছিল।

নির্মাল্য মিশ্র ধমক দিয়ে বলেছিলেনঃ কোন্‌টা ভাল জায়গা আর কোন্‌টা নয়, তা আমি তোমার চেয়ে ভাল বুঝি।

বাদলও তা বুঝতে পেরেছিল। ডাক্তার মৈত্র যেমন একা থাকতে চাইছেন, তেমনি নির্মাল্য মিশ্রও তাঁকে এড়িয়ে চলতে চান। আসল কথা হল যে ডাক্তার মৈত্র কোন সঙ্গী চান না। আর নিজেও সঙ্গী হতে পারেন না কারও। এই ব্যবস্থায় বিন্দু খুশী হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। বলেছিল, এ ভালই হল। নির্মাল্যদির সঙ্গে বেড়ালে অনেক কিছু জানা যাবে।

জেটির বাইরে এসে নির্মাল্য মিশ্র তারাপদর দিদির পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর বাদল ডাক্তার মৈত্রকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিল। ডাক্তার মৈত্র আগে থেকেই চারি ধারে চেয়ে দেখছিলেন। বললেনঃ আমি একা যাব?

বাদল বললঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

আর সবাই কোথায় থাকবে!

আমরা দু নম্বর টুরিস্ট রেস্ট হাউসে যাচ্ছি।

ডাক্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেনঃ সবাই এক জায়গায়!

সেই ব্যবস্থাই হয়েছে।

তাহলে আমার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করলে কেন?

বাদল গম্ভীরভাবে বললঃ আপনি একটু নিরিবিলি থাকতে চান কিনা তাই।

হুঁ।

বলে ডাক্তার মৈত্র ট্যাক্সির দরজাটা দুম করে বন্ধ করলেন। আর বাদল ড্রাইভারকে বলে দিল টুরিস্ট বাংলোয় যেতে।

ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল।

দূরে দাঁড়িয়ে নির্মাল্য মিশ্র সবই দেখলেন। হঠাৎ ঐ মানুষটার জন্য তাঁর কেমন একটা বেদনা বোধ হল। ভদ্রলোকের বাহিরটা যেমন শক্ত, ভিতরটা তেমন নয়। কী চান তা মুখ ফুটে বলতে পারেন না, যা বলেন তা হয়তো তিনি বলতে চান নি। একটা নিঃশ্বাস ফেলে নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

কিন্তু তাঁর মুখের ভাব দেখে মনে হল না যে সত্যিই তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। বরং কোন অজানা আশঙ্কায় যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, তা তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল। তারাপদর দিদি হয়তো কিছু সন্দেহ করেছিলেন। বললেনঃ ডাক্তারবাবুকে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হল না।

নির্মাল্য মিশ্র এ কথার উত্তর দেবার অবকাশ পেলেন না। তার আগেই বাদল দুখানা ট্যাক্সি ধরে চেঁচিয়ে উঠল : উঠে পড়ুন নির্মাল্যদি!

ডাক্তার মৈত্রর কথা নির্মাল্য মিশ্র ভুলে গেলেন। বললেন : জিনিষপত্র তোলা হোক আগে।

হ্যাডো জেটিতে ট্যাক্সির কোন স্ট্যান্ড নেই, দরকারও নেই। জাহাজ জেটিতে লাগবার খবর পেলেই বাজারের স্ট্যান্ড থেকে ট্যাক্সি ছুটে আসে। এই বাড়তি ভাড়া যাত্রীদেরই দিতে হয়। না দিয়ে উপায় নেই। আপত্তি করলে জেটির বাইরেই বসে থাকতে হবে।

গাড়ির পিছনে ও ভেতরে মালপত্র তুলে সবাই গাড়িতে উঠলেন। তারপর শহরের প্রধান রাজপথ ধরে অগ্রসর হল ট্যাক্সি। এই রাস্তার ধারেই এক নম্বর ট্যুরিস্ট বাংলো। ভাড়া একটু বেশি বলে বাদল দু নম্বরে ব্যবস্থা করেছিল। ডর্মিটরি আছে সেখানে। বড় রাস্তা. ছেড়ে খানিকটা ভিতরে গিয়ে এই ট্যুরিস্ট বাংলো পাওয়া গেল।

নির্মাল্য মিশ্রর জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করল বাদল। তারপরেই তাড়া দিয়ে বলল : এখানে বসে সময় নষ্ট করলে চলবে না নির্মাল্যদি। চটপট আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন : কোথায়?

বাদল বলল : দেশটা দেখতে হবে না!

তবু ভাল।

কেন, আপনি কী ভেবেছিলেন?

নির্মাল্য মিশ্র সকৌতুকে বললেন : ভেবেছিলাম, হয়তো ডাক্তারবাবুর কাছে টেনে নিয়ে যাবে।

বাদলের মুখ কিছু বিমর্ষ হয়ে গেল। তা লক্ষ্য করে নির্মাল্য মিশ্র বললেন : তোমার আবার কী হল?

বাদল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল : মানুষটা অসহায় হয়ে গেলেন!

কেন?

গেলেই দেখতে পাবেন।

কিন্তু গেলে যে ক্ষেপে উঠবেন!

ওটা ওঁর স্বভাব। আসলে মানুষটা ঠিক অন্যরকম।

তারাপদর দিদি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন : তবে ওঁকে ওখানে পাঠিয়ে দিলে কেন?

নির্মাল্যদির জন্যে।

আমার জন্যে!

বলে নির্মাল্য মিশ্র সবিস্ময়ে তাকালেন বাদলের মুখের দিকে।

বাদল একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল: ডাক্তারবাবুর জন্যেও। ওঁরও একটু বোঝা উচিত। সবাই তো বাদল নয় যে যা বললেন তাই মেনে নেবে!

নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে বাদল দুদিকই সামলাবার চেষ্টা করছে। বললেন: কোথায় যাবে ঠিক করেছ কি?

তারাপদর দিদি বললেন: এ বেলায় আর বেরোনো যাবে না।

কেন?

সমুদ্রের ওপরে দুলতে দুলতেই তো এসেছি, আজ খেয়ে দেয়ে শক্ত মাটির ওপরে শুয়ে একটু ঘুমনো যাবে।

বাদল তৎপরভাবে বলল: আমি তাহলে ডাক্তারবাবুকে একবার দেখে আসি!

বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে চেয়ে তারাপদর দিদি একটুখানি হাসলেন। কিন্তু কোন কথা বললেন না। নির্মাল্য মিশ্রর মনে হল যে এই হাসিটা বোধহয় বাদলের কাণ্ড দেখে নয়, তারাপদর দিদি বোধহয় তাঁকেই উপহাস করে ভিতরে চলে গেলেন।

ঠিক এই সময়টায় তাঁর কিছু করবার নেই। আহারের দেরি আছে। জাহাজের বাথরুমেই নির্মাল্য মিশ্র স্নান সেরে নিয়েছিলেন। গল্প করে সময় কাটানোর মতো একজন সঙ্গীও নেই এই দলে। বিন্দুর কথা তাঁর মনে এল। খোঁজ নিয়ে দেখলেন যে বিন্দু এখন স্নানের উদ্যোগ করছে। দলের কেউই জাহাজে স্নান করেনি। তাই সবাই এখন ব্যস্ত।

নির্মাল্য মিশ্র খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন বাইরে। তারপর পথে বেরিয়ে পড়লেন। পথ মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে। খানিকটা এগোলেই যে বড় রাস্তায় পেঁছিনো যাবে। নির্মাল্য মিশ্র তা জানেন। সেই দিকেই তিনি এগিয়ে চললেন হন হন করে।

আন্দামানের পথঘাট কলকাতার মতো নয়। সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো উঁচু-নিচু পথ। সমগ্র দ্বীপটা যেন একটা পাহাড়ের উপত্যকা। বনজঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন হয়েছিল এককালে। ধীরে ধীরে তারই উন্নতি হয়ে এখন একটি শহরে পরিণত হয়েছে। শহর হয়েও ঠিক শহরের মতো

নয়। ঘর বাড়িরও বৈশিষ্ট্য আছে এখানে। ঠিক এ রকমটি নির্মাল্য মিশ্র বুঝি এর আগে কোথাও দেখেননি।

কিন্তু তিনি বোধহয় আরও কিছু ভাবছিলেন। বড় রাস্তা ধরে খানিকটা এগোবার পরেই তাঁর সমুদ্রের কথা মনে পড়ল। কোন একটা রাস্তায় ঢুকে পড়লে বোধহয় তার শেষ প্রান্তেই সমুদ্র দেখা যাবে। এ কথা মনে হতেই নির্মাল্য মিশ্র একটা শাখা পথে ঢুকে পড়লেন। আর খানিকটা এগিয়েই থমকে দাঁড়ালেন।

না, ভুল হয়নি তাঁর। ওধার থেকে ডাক্তার মৈত্র আসছেন বাদলের সঙ্গে। বেশ কাছাকাছি এসে গেছেন। পিছন ফিরে পালিয়ে যাবার আর উপায় নেই। এক রকমের অদ্ভুত লজ্জায় নির্মাল্য মিশ্রর মাথা যেন হেঁট হয়ে গেল।

কিন্তু বাদল উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ঃ নির্মাল্যদি!

নির্মাল্য মিশ্র সামলে নিলেন নিজেকে। বললেন ঃ সামনে এগোলে সমুদ্র দেখতে পাব, তাই না?

ডাক্তার মৈত্র কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন। বললেন ঃ বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে। তার চেয়ে—

বলেই থেমে গেলেন। মনে হল, তিনিও যেন লজ্জা পেয়েছেন খানিকটা।

বাদলের উৎসাহ আর ধরে না। বলল ঃ আসুন নির্মাল্যদি। দাঁড়িয়ে আর সময় নষ্ট করবেন না।

বলে নির্মাল্য মিশ্রকেও সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগল। সমুদ্রের দিকে নয়, দু নম্বর রেস্টহাউসের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা সেখানে পেঁছে গেলেন।

আহারের পর একখানা আরামচেয়ারে বসে ডাক্তার মৈত্র গম্ভীর মুখে চুরট টানছিলেন। আর মাঝে মাঝে চারি দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। না, কাছে আর কেউ নেই। কারও ওপরে মনের বিরক্তি প্রকাশ করবেন, না অন্য কিছু করতে চান, তা বোঝা যাচ্ছে না। বাদল তাঁকে এই রেস্টহাউসে টেনে এনে খাইয়েছে। ডাক্তার মৈত্র নিঃশব্দে সবার সঙ্গে খেয়েছেন। তারাপদর দিদি তাঁর সঙ্গে দুএকটা কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। ডাক্তার মৈত্র এমনভাবে উত্তর দিয়েছেন যেন নিতান্ত অনিচ্ছাতেই তাঁকে এখানে আসতে হয়েছে। নির্মাল্য মিশ্র খেতে বসেছিলেন নিজের ঘরে। তিনি একরকম জোর করেই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। বাদলের বা দলের আর কারও ওজর আপত্তি শোনেননি। ব্যাপারটা সবাই বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু

বুঝেছেন নিজের মতো করে। কেউ ভাবলেন যে নির্মাল্য মিশ্র জাহাজের অপমানের শোধ নিলেন, আবার কেউ ভাবলেন যে এও একরকমের অভিমান। আর বাদল আশ্চর্য হল এই ভেবে যে দুজনেই দুজনের দিকে এগিয়ে আসছিলেন বেশ! তারাপদর দিদিই শুধু কৌতুক বোধ করছিলেন এই দুটি মানুষকে দেখে।

আহারের পর বাদল ডাক্তার মৈত্রকে ফিরে যেতে দেয়নি। বলেছিল : এইখানেই একটু বিশ্রাম করুন ডাক্তারবাবু। একসঙ্গে আমরা সেলুলার জেল দেখতে যাব।

ডাক্তার মৈত্র এ কথার কোন উত্তর দেননি, ফিরেও যাননি। বাদল একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলেছিল : বসুন এখানে।

ডাক্তার মৈত্র বিরক্ত মুখেই বসেছিলেন। তারপর থেকে এই চুরট ধরিয়ে টানছেন অল্প অল্প করে, আর ফিরে ফিরে দেখছেন সব দিকে।

নির্মাল্য মিশ্রর ঘরে বিন্দুর গলা শোনা যাচ্ছিল। মনের আনন্দে গল্প করছিল নির্মাল্য মিশ্রর সঙ্গে। নির্মাল্য মিশ্র হঠাৎ প্রশ্ন করলেন : ডাক্তারবাবু ফিরে গেছেন তো!

বিন্দু তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে তাকাতেই ডাক্তার মৈত্রকে দেখতে পেল। ফিরে এসে বলল : না নির্মাল্যদি। বাইরে বসে চুরট খাচ্ছেন।

কে আছে তাঁর কাছে?

কেউ না।

তারপরেই প্রশ্ন করল : আপনি যাবেন নাকি?

নির্মাল্য মিশ্র ঠোঁট উল্টে বললেন : পাগল!

কিন্তু বেশিক্ষণ তাঁরা গল্প করবার সুযোগ পেলেন না। দরজার বাইরে থেকে বাদল হাঁক দিয়ে বলল : শিগগির তৈরি হয়ে নিন নির্মাল্যদি। বেরোবার সময় হয়েছে আমাদের।

খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল বিন্দুর মুখ। বলল : আমি তাহলে আসি নির্মাল্যদি। তাড়াতাড়ি না করলে আমাকে ফেলেই চলে যাবে।

বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

নির্মাল্য মিশ্র এই মেয়েটির পায়েও আনন্দের ধ্বনি শুনতে পেলেন। তারপরে ভাবলেন নিজের কথা। তাঁর নিজের হৃদয় যেন স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে!

বাইরে বাদল ডাক্তার মৈত্রর সঙ্গে কথা বলছিল। জিজ্ঞাসা করল : বাসে যেতে আপনার কষ্ট হবে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ আর সবাই কী ভাবে যাবে ?

বাদল বলল ঃ আমরা বাসেই যাব ।

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ তাহলে আমার একার জন্যে আলাদা ব্যবস্থার দরকার নেই ।

বাদল বলল ঃ নির্মাল্যদিকেও একবার জিজ্ঞেস করে দেখি ।

ডাক্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ তিনি কি আলাদা যাবেন নাকি ?

কথাটা তিনি জোরেই বলেছিলেন । তাই নির্মাল্য মিশ্রর কানেও এ কথা পেঁছিল । বাদল বলল ঃ নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যাবেন !

কিন্তু ডাক্তার মৈত্র খুব আশ্বাস পেলেন বলে মনে হল না ।

বাদল তখন নির্মাল্য মিশ্রর ঘরের সামনে পেঁছে গেছে । বলল ঃ আসতে পারি নির্মাল্যদি ?

স্বচ্ছন্দে ।

বলে নির্মাল্য মিশ্র শক্ত হয়ে বসলেন ।

ঘরে ঢুকে বাদল বলল ঃ আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে বাসে যাবেন !

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আমি আজ জেলখানা দেখতে যাব না ।

এরকম উত্তর শোনবার জন্যে বাদল প্রস্তুত ছিল না । বলল ঃ সেকি নির্মাল্যদি !

অমন আশ্চর্য হচ্ছ কেন ?

সেলুলার জেল দেখবেন না ? ঐ জেল দেখবার জন্যেই তো লোকে আন্দামানে আসে । আপনিও—

বলে থেমে গেল ।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ যাবার আগে নিশ্চয়ই দেখব । কিন্তু আজ নয় । আজ আমি সমুদ্র দেখব ।

বলে নির্মাল্য মিশ্র শক্ত হয়ে বসে রইলেন । আর বাদল এর পরে কী বলবে ভেবে পেল না ।

বাদলের মুখের দিকে চেয়ে নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন ঃ দাঁড়িয়ে রইলে কেন ! তোমরা ঘুরে এসো ।

বিন্দুর কথা বাদলের মনে পড়েছিল । নির্মাল্যদি সঙ্গে থাকলে অনেক কথাই জানা যায় । নির্মাল্যদি যাবেন না শুনলে সে-ই নিরাশ হবে সবচেয়ে বেশি । কিন্তু বাদল কোন প্রতিবাদ করবার সাহস পেল না । ঘর থেকে বেরোতেই ডাক্তার মৈত্র তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ কী হল ?

বাদল বিমর্ষভাবে বলল : উনি বেরোবেন না।

বেরোবেন না মানে!

জেলখানা উনি আজ দেখতে যাবেন না।

ডাক্তার মৈত্র যেন গর্জন করে উঠলেন, বললেন : যাবেন না বললেই হল! ডাকো তাঁকে। ডেকে নিয়ে এসো বাইরে।

বাদল বুঝতে পারছিল যে নির্মাল্য মিশ্রর কানে সব কথাই পেঁাছেছে। বারান্দা আর ঘরের মাঝখানে তো একটিমাত্র পর্দার আড়াল। আর ডাক্তার মৈত্র রেখে ঢেকে কিছু বলেননি। কিন্তু বাদল এইবারে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

ঠিক এই সময়ে নির্মাল্য মিশ্র নিজেই বেরিয়ে এলেন। বললেন : কী বলতে চান বলুন।

ডাক্তার মৈত্র যেন এক মুহূর্তে চুপসে গেলেন। থতমত খেয়ে বললেন : হ্যাঁ, না, মানে—

মানে কী?

মানে বলছিলাম কি, জেলখানা যদি দেখতে না চান তো অন্য কোথাও চলুন। আপনি একা ঘরে বসে থাকবেন, সেটা কি ভাল হয়!

হেসে ফেললেন নির্মাল্য মিশ্র। বললেন : আপনিও দেখছি ওদের দলে যোগ দিয়েছেন।

বাদলকে দেখে মনে হল যে ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছেড়েছে। বলে উঠল : সত্যি নির্মাল্যদি, আপনি আর আপত্তি করবেন না।

তারাপদর দিদি বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। বাদলকে ধমক দিয়ে বললেন : ওঁদের নিয়ে অমন করছ কেন বলতো! ওঁরা দুজনেই যাবেন। আর সবাইকে তাড়া দিয়ে বার কর।

নির্মাল্য মিশ্র দেখতে পেলেন যে ডাক্তার মৈত্রর চোখ এখন অপরিসীম প্রসন্নতায় ভরে গেছে। আশ্চর্য মানুষ! এই মানুষটাকে চিনতে বোধহয় তাঁর আরও সময় লাগবে।

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর গুরবন্ত্ সিং সোহলের কথা মনে পড়ে গেল, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে যাবার কথাও। একটু পরেই হয়তো মিস্টার সোহল এসে উপস্থিত হয়ে বলবেন, সত্যিই একটা জাহাজ ছাড়ছে। এই সময়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেলে এমন একটা সুযোগ তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাবে। জীবনে আর এ সুযোগ আসবে না।

নির্মাল্য মিশ্র তাঁর মনটাকে শক্ত করে ফেললেন পরের মুহূর্তেই। তিনি তাঁর বিচার-বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পারলেন যে দলভ্রষ্ট হয়ে তাঁর এখন এখানেই অপেক্ষা করা উচিত। পরে আবার এই দলে যোগ দেওয়া কঠিন কাজ হবে না। তাই তিনি তারাপদর দিদির কথার কোন প্রতিবাদ না করেই নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

বিন্দু তাঁকে ডাকতে এলে খুব মোলায়েম সুরে বললেন ঃ বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে ভাই, এখন একটু বিশ্রাম করতে দাও।

এই খবর পেয়ে ডাক্তার মৈত্রই এলেন সবার আগে। বললেন ঃ দেখি, কী হয়েছে ?

বলে নির্মাল্য মিশ্রর কব্জির দিকে হাত বাড়াতেই তিনি তাঁর হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন ঃ কিছু হয়নি।

তবে ?

এবেলায় একটু বিশ্রাম নিলেই কাল ঠিক হয়ে যাবে।

সদানন্দবাবু এসেছিলেন ডাক্তার মৈত্রর পিছনে। তিনি বললেন ঃ সেই ভাল। কয়েকদিন ধরে শরীরের ওপর দিয়ে যে ধকল গেল, সবারই একটু বিশ্রামের দরকার। চলে আসুন ডাক্তারবাবু।

বাদল খুব অভিনিবেশ সহকারে নির্মাল্য মিশ্রের মুখের দিকে তাকাল। সে মুখে ছলনার কোন ইঙ্গিত না পেয়ে বলল ঃ আমরা তাহলে কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসছি নির্মাল্যদি। কাল সবাই মিলে একসঙ্গে সেলুলার জেল দেখতে যাব। আপনি হয়তো ভুলে গেছেন, কিন্তু আমি ভুলিনি।

কী ?

বলে নির্মাল্য মিশ্র বাদলের মুখের দিকে তাকালেন।

বাদল বলল ঃ শুধু এই জেল দেখবার জন্যেই আপনি এখানে আসতে চেয়েছিলেন।

নির্মাল্য মিশ্র কোন উত্তর না দিয়ে হাসলেন।

॥ তেরো ॥

বাদলরা চলে যাবার পর নির্মাল্য মিশ্র এসে বাইরের বারান্দায় বসলেন। বেলা তখন পড়ে এসেছে। একটু পরেই বোধহয় দিনের আলো নিববে। এখানে অন্ধকার নামবে কখন, নির্মাল্য মিশ্র তা জানেন না। ভারতের

মানচিত্রটা তিনি মনে করবার চেষ্টা করলেন। এ জায়গাটা কয়েক ডিগ্রী পূর্বে বলেই তাঁর মনে হল। তার মানে সূর্য এখানে আগে উঠবে, ডুববেও আগে।

সত্যিই যদি নিকোবরে যাওয়া হয়, তাহলে নির্মাল্য মিশ্র কী করবেন! সবাইকে বলে যাবেন, না লুকিয়ে চলে যাবেন কাউকে না জানিয়ে! বলে গেলে বাধা আসতে পারে নানারকম। আর না বলে পালিয়ে যেতে পারলে একটা বিরাট সারপ্রাইজ দেওয়া সম্ভব হবে। প্রথমে সবাই ভাববে, তিনি তাঁদের দল ছেড়ে চলে গেছেন। তারপর খুঁজে বেড়াবে সমস্ত রেস্টহাউস, ট্যুরিস্ট বাংলো ও হোটেলগুলোয়। তারপর কোনখানে হদিস না পেয়ে কী ভাবতে পারে!

হঠাৎ তাঁর জারোয়াদের কথা মনে পড়ে গেল। জারোয়ারা কি মানুষ চুরি করে না। বাদলরা কি ভাববে না যে জারোয়ারা তাঁকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

ঠিক এই সময়েই গুরবন্ত্ সিং সোহল এসে উপস্থিত হলেন। ভারি প্রসন্ন তাঁর মুখ। হাসতে হাসতেই নির্মাল্য মিশ্রর দিকে এগিয়ে এলেন।

তাঁর ভাব দেখেই নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে ভাল খবর আছে। হয়তো নিকোবর যাত্রার খবর। তাই সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন: কাল জাহাজ ছাড়ছে বুঝি?

মিস্টার সোহল বললেন: খুব ভোরে। অন্ধকার থাকতেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। পারবেন অত সকালে উঠতে?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আমার কাছে তো অ্যালার্ম ঘড়ি নেই।

আমার আছে তো! আমি আপনাকে জাগিয়ে দিতে পারব। খুব তাড়াতাড়ি আপনাকে রেডি হয়ে নিতে হবে।

তা খুব পারব।

দুটো রাত বাইরে কাটবে। আশা করছি তৃতীয় দিন সকালেই আমরা ফিরতে পারব।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: খুব মজা হবে তাহলে। আমি আজ রাতেই সব গুছিয়ে রাখব। ভাড়ার টাকাটা আপনাকে দিয়ে দিই?

মিস্টার সোহল বললেন: কাল জাহাজে উঠে দেবেন। আমি এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাব।

তারপরেই যেন কিছু বিষণ্ণ হয়ে বললেন: ডাক্তারসাহেব কোন ঝামেলা করবেন না তো।

সে ভয় নেই।

কেন?

তিনি এখানে থাকবেন না।

মিস্টার সোহল বললেন: ও হ্যাঁ, তিনি তো অন্য জায়গায় আছেন। কিন্তু আপনার দলের লোকেরা?

মিস্টার সোহল একখানা চেয়ার সংগ্রহ করে এনে তাঁর পাশে বসলেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: ওদের একটা সারপ্রাইজ দেবার ইচ্ছা হচ্ছে।

কী রকম?

আপনি ভরসা দিলে বলতে পারি।

মিস্টার সোহল সানন্দে বললেন: এ সব কাজে আমার খুব উৎসাহ। যা বলবেন, তাতেই রাজী হয়ে যাব।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এখানে আপনার চ্যালা চামুণ্ডা নিশ্চয়ই আছে।

অনেক আছে।

তবে কাজটা তাদের দিয়েই করতে হবে।

কী কাজ?

আপনি খুব চুপচাপ এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যাবেন। কেউ যেন জানতে না পারে।

বেশ।

তারপর আপনাকে একটা নাটক তৈরি করতে হবে।

মিস্টার সোহল তার পরের কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আর নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এরা নিশ্চয়ই আমাকে খোঁজাখুঁজি করবে— প্রথমে রেস্ট হাউস আর ট্যুরিস্ট বাংলোয়, তারপর হোটেলে মোটেলে—

করবেই।

পুলিশেও খবর দিতে পারে।

খুঁজে না পেলে তাই করবে।

কিন্তু আপনার সঙ্গে যে বাইরে গেছি, এ কথা যেন প্রকাশ না পায়। দরকার হলে রাষ্ট্র করে দেবেন যে জারোয়ারা এসে ধরে নিয়ে গেছে।

হা-হা করে হেসে উঠলেন গুরবক্স্ সিং সোহল। বললেন: এ আর এমন শক্ত কাজ কী। সকালবেলাতেই আমার কোন চ্যালা এসে জারোয়ার গল্প শুনিয়ে যাবে।

কী গল্প?

বলবে, কাল রাতে একদল জারোয়া পোর্ট-ব্লেয়ারে হানা দিয়েছিল। কী কী করেছে, তার একটা গল্প বানিয়ে বলে চলে যাবে।

নির্মাল্য মিশ্র বলে উঠলেন: চমৎকার আইডিয়া!

তার পরেই একটু চিন্তিতভাবে বললেন: কিন্তু পুলিস কোন গোলমাল করবে না তো।

মিস্টার সোহল বললেন: সে সব ভাবনা আমার। পুলিশে আমার অনেক বন্ধু আছে। তাদের আমি আজই বলে রাখব। তারা আরও ভয় পাইয়ে দেবে।

একটু থেমে বললেন: যদি অনুমতি দেন তো ডাক্তারসাহেবের সঙ্গেও একটু ইয়ার্কির ব্যবস্থা করতে পারি।

কী করবেন?

এক ঢিলে দু পাখি মারবার ব্যবস্থা। ভয়ও দেখাব, আবার পার্টিতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও করব।

নির্মাল্য মিশ্র ভয়ে ভয়ে বললেন: যে রকম রাগী মানুষ, কোন গোলমাল হবে না তো!

সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বলে হাসতে হাসতে গুরবক্স্ সিং সোহল ফিরে গেলেন।

ভদ্রলোক ফিরে যেতেই নির্মাল্য মিশ্রের চিন্তার ধারা একটা নতুন খাতে বইতে লাগল। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এম. ভি. আন্দামান্‌স্ জাহাজে। তাঁর পরিচয় তিনি জানতে চান নি। তাঁর দরকার মনে করেননি। ডাক্তার মৈত্রর কাছে শুনেছিলেন যে ভদ্রলোকের ব্যবসা আছে আন্দামানে। কিসের ব্যবসা তা বলেননি বলে ডাক্তার মৈত্র তাকে পছন্দ করেননি। এতে নির্মাল্য মিশ্রর কিছু এসে যায় না। কিন্তু এবারে কিছু না জেনেই তিনি এই অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে নিকোবর ভ্রমণে রাজী হয়েছেন। শেষ রাতে এসে তিনি তাঁকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু—

এইবারে নির্মাল্য মিশ্রর গরম বোধ হতে লাগল। মনে হল যেন অল্প অল্প ঘামছেন তিনি। কিন্তু বাতাসে উষ্ণতা নেই। সমুদ্রের দিক থেকে শীতল বাতাস আসছে, কিংবা সমুদ্রের দিকেই এই বাতাস বয়ে যাচ্ছে। তাতে উষ্ণতার বদলে শীতলতা ছিল একটু আগে। এইবারে হঠাৎ যেন বাতাসটা গরম হয়ে উঠল।

নির্মাল্য মিশ্রের মনে হল, গুরবক্স্ সিং সোহল লোকটা সত্যিই এখানকার

একজন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক এবং নিজের ব্যবসার কাজেই যাচ্ছেন নিকোবর দ্বীপে ? না, তাঁকে এইভাবে নিকোবর দেখাবার নামে শেষ রাতে বার করে নিয়ে যেতে চান ? আর তিনিও নিতান্ত ছেলেমানুষের মতোই কোন খোঁজ খবর না নিয়ে এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন ! শুধু রাজী হওয়া নয়, সবাইকে সারপ্রাইজ দেবার জন্যে এমন ব্যবস্থা করলেন যে কেউ তাঁর সম্বন্ধে সত্য কথাটা জানতেই পারবে না। নিজে উকিল হয়ে এমন কাঁচা কাজ তিনি করলেন কেমন করে। এখন কি পিছিয়ে আসবেন। ধরিয়ে দেবেন গুরবক্স্ সিং সোহলকে !

আর একটা কিন্তু হঠাৎ একটা বিরাট আকার নিয়ে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। নিকোবর যাবার প্রস্তাব তো গুরবক্স্ সিং সোহল নিজে করেননি। নির্মাল্য মিশ্রই এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন ভদ্রলোককে। তাঁর ইচ্ছা দেখেই তো ভদ্রলোক এই খবর দিতে এসেছিলেন এবং তাঁরই অনুরোধে সব ব্যবস্থা করতে রাজী হয়েছেন !

নির্মাল্য মিশ্র জাহাজে এই ভদ্রলোকের আচরণ মনে করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আশ্চর্য ! ভদ্রলোকের এমন কোন আচরণ মনে পড়ছে না যা ভয় পাবার মতো। তাঁর ব্যবহারে কোন অসৌজন্য প্রকাশ পায়নি, ডাক্তার মৈত্রর সম্বন্ধেও কোন আপত্তিকর মন্তব্য করেননি। বরং নির্মাল্য মিশ্রর মনে হল যে তিনি সবরকম সৌজন্য রক্ষার জন্যই সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে যদি নিকোবর যাত্রার প্রস্তাব না করতেন, তবে তাঁকে সন্দেহ করবার কোন কারণ ছিল না।

তবে হঠাৎ এমন করে তাঁর ধারণা পাল্টে গেল কেন ! এইটুকু সময়ের মধ্যে এমন কী ঘটল যে তিনি ভদ্রলোককে সন্দেহ করতে আরম্ভ করলেন ! অনেক ভেবেই তিনি এর কোন কারণ খুঁজে পেলেন না।

শুধু একটা অসাবধানতার জন্যে তাঁর আপশোস হল। ভদ্রলোকের সম্পূর্ণ পরিচয় ও ঠিকানা জেনে নেওয়া উচিত ছিল। তাহলে এখনই তিনি তাঁর সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারতেন। অনায়াসে তিনি তাঁর খোঁজ নিতে পারতেন অন্যের কাছে। নিজে চলে যেতে পারতেন, কিংবা টেলিফোনেও হয়তো তাঁর খোঁজ নিতে পারতেন। এসব ব্যাপারে এখনও তিনি কাঁচা আছেন বলে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলেন।

দিনের আলো তখন নিবে গেছে, অন্ধকার হতে আরম্ভ করেছে। আর একটু পরেই বোধহয় অন্ধকারে চারি দিক ঢেকে যাবে। তখন হয়তো তাঁর আরও বেশি ভয় করবে।

এর পরেই তাঁর মনে হল যে ফেরার পথ এখনও তার খোলা আছে। তিনি যাবেন বলেছেন, কিন্তু এখনও যাননি। পা বাড়াবেন বলেছেন, কিন্তু কোন ফাঁদে পা দেননি। ইচ্ছে করলেই তিনি তাঁর পা গুটিয়ে নিতে পারেন। শেষ রাতে গুরবন্ত্ সিং সোহল যখন তাঁকে নিতে আসবেন, তিনি তখন অনায়াসেই যাব না বলতে পারেন। ভদ্রতা রক্ষার জন্য শরীর খারাপের অজুহাত দেওয়া যেতে পারে। আজ যেমন করে তিনি দলের সঙ্গে না বেরিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন মিস্টার সোহলের জন্যে, কাল মিস্টার সোহলকেও ঠিক তেমনিভাবেই বলতে পারেন, খুবই দুঃখিত, আমি যেতে পারছি না। কিংবা বাদলকে ডেকে বলতে পারেন, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, তুমি আমাকে জাহাজে তুলে দিয়ে এসো। তাতে তাকে নিকোবর যাত্রার খবরটাও দেওয়া হবে, আবার গুরবন্ত্ সিং সোহলের কোন বদ মতলব থাকলে তাও ধরা পড়ে যাবে।

বাধাও আছে একটা। গুরবন্ত্ সিং সোহলের যদি কোন বদ মতলব না থাকে, তবে তাকে কিছু অপদস্থ করা হবে। সে ভদ্রলোক সবাইকে সারপ্রাইজ দেবার জন্যে যে সব ব্যবস্থা করে যাবেন, তার জন্য তাঁকে লজ্জা পেতে হবে অনেক। নির্মাল্য মিশ্রর সততায় তিনি বিশ্বাস হারাবেন, ভাববেন যে এই-ভাবে তাঁকেই অপদস্থ করা হল।

তবে নির্মাল্য মিশ্র কী করবেন? ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসবেন, না বীরের মতো এগিয়ে যাবেন? স্কুল কলেজের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। সবাইকে তিনি তাঁর সাহসের কথা বলতেন। বলতেন যে উকিল বা ব্যারিস্টার হয়ে তিনি টেক্কা দেবেন পুরুষদের ওপর। মেয়েরা ভীরু, তাই তারা পুরুষের অধীন হয়ে আছে। পুরুষ-শাসিত সমাজ বলে মেয়েরা দুঃখ করে, কিন্তু পুরুষের শাসনমুক্ত হবার জন্যে কোন চেষ্টা কখনও করে না। বিদ্রোহ করে তো লাভ নেই। সাহস সঞ্চয় করতে হবে আগে, তারপর পুরুষকে অগ্রাহ্য করতে হবে। শাসনমুক্ত হবার জন্য বিদ্রোহ নয়। নিজের সাহস ও শক্তিতে জয় করতে হবে পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে। এই সব পুরনো কথা মনে হতেই নির্মাল্য মিশ্রর মনে যেন নতুন সাহসের সঞ্চার হল। অ্যাড্‌ভেঞ্চারে ভয় পেলে তাঁর চলবে না।

নির্মাল্য মিশ্রর চোখের সামনে আবার এক অকূল সমুদ্র ভেসে উঠল। যে সমুদ্র পেরিয়ে এসেছেন, সে সমুদ্র নয়। টেন ডিগ্রী চ্যানেল পেরিয়ে আর এক সমুদ্র। কলকাতা থেকে যে ট্যুরিস্টরা আসে, তারা এই সমুদ্র

দেখে না। এই সমুদ্রের কোন দ্বীপও তারা দেখতে পায় না। টেন ডিগ্রী চ্যানেল না পেরোলে এই সমুদ্র দেখা সম্ভব নয়।

গুরবন্ত্ সিং সোহলের কাছে শুনেছেন যে কয়েকখানা পুরনো জাহাজ আন্দামান থেকে নিকোবরের মধ্যে যাতায়াত করে। সাউথ আন্দামান থেকে লিট্‌ল আন্দামান, সেখান থেকে কার নিকোবর। এই জাহাজ নানকৌরি ও গ্রেট নিকোবরে যাবে কিনা তা তিনি জানেন না। একবার কোন-রকমে টেন ডিগ্রী চ্যানেল পার হলে সে সব দ্বীপে যাওয়া কঠিন নয়। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপ দেখতে পেলেও তিনি নিজেকে কৃতার্থ ভাববেন।

আজ তাঁর নিকোবর দেখবার ডাক এসেছে গুরবন্ত্ সিং সোহলের কাছ থেকে। ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলে তাঁর বলবে না। নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে হবে তাঁকে। পুরুষদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলবার সংকল্প নিয়েছেন তিনি। পুরুষকে তিনি কেন ভয় পাবেন। পুরুষের সঙ্গে তিনি শক্তির মোকাবেলা করবেন। দেহের শক্তিই তো বড় নয়, শক্তি হল বুদ্ধির। তার জন্যে মনের শক্তি চাই আগে। মন শক্ত না হলে বুদ্ধি কোন শক্তি যোগায় না। নির্মাল্য মিশ্রর মন শক্ত করতে হবে সকলের আগে।

বাদলরা এখনও ফেরেনি। এই সময়েই তাঁকে যাত্রার আয়োজন করে ফেলতে হবে। সবাই ফিরলে সবার সামনে তা করা সম্ভব হবে না। দুতিন দিনের উপযোগী প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিলেই চলবে। যত হাল্কাভাবে যাওয়া যায়, ততই ভাল। নির্মাল্য মিশ্র উঠে পড়লেন। ঘরে গিয়ে গুছিয়ে নিলেন সব কিছু। তারপরে আবার বেরিয়ে এলেন বাইরে।

আজ তাঁকে সন্ধ্যেবেলাতেই শুয়ে পড়তে হবে। প্রথম রাতেই ঘুমিয়ে নিতে হবে। তার জন্যে শরীর খারাপেরই অজুহাত দিতে হবে সবাইকে। নির্মাল্য মিশ্র ভাবলেন যে বাদলরা ফিরলেই তিনি সামান্য কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়বেন। তাই তাদের জন্যেই অপেক্ষা করতে লাগলেন।

খানিকক্ষণ পরেই বাদলরা হৈ চৈ করতে করতে ফিরে এল। বিন্দু ছুটে এসে বলল ঃ এখন কেমন লাগছে নির্মাল্যদি ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তেমন ভাল নয়। ভাবছি এখনই শুয়ে পড়ব। তাই অপেক্ষা করছি তোমাদের জন্যে।

বাদল উদ্বিগ্ন হয়ে বলল ঃ রাতে খাবেন না আমাদের সঙ্গে ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ না ভাই, কিছু না খেলেই ভাল।

তারাপদর দিদি বললেন ঃ সেকি, না খেয়ে সারা রাত থাকবেন কেন! বাদল তো অনেক কিছু কিনে এনেছে। তাই খেয়ে শুয়ে পড়বেন।

ভানুর হাতের থলের ভিতরে ছিল তাদের রাতের আহার। সে আসছিল সদানন্দবাবুর সঙ্গে। বারান্দায় নির্মাল্য মিশ্রকে দেখতে পেয়েই সদানন্দবাবু বললেন ঃ রাতে ঘর থেকে বেরোবেন না যেন! ডাক্তারবাবুর হুকুম।

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ কেন?

সদানন্দবাবু বললেন ঃ জারোয়ারা এই দ্বীপেই থাকে, মাঝে মাঝেই হামলা করে রাতে।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন ঃ ভয় নেই আমাকে তারা চুরি করতে আসবে না। কিন্তু ডাক্তারবাবু বলেছেন, না, সাবধান হওয়া ভাল।

নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে গুরবক্স্ সিং সোহল তাঁর কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

॥ চোদ্দ ॥

রাতে সামান্য কিছু খেয়ে সবার আগে শুয়ে পড়েছিলেন নির্মাল্য মিশ্র। রাত ভোর হবার আগেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরের বাতি জেলে তিনি ঘড়ি দেখলেন, তারপর আর আলস্য না করে উঠে পড়লেন। মুখ হাত ধুয়ে বেরোবার জন্যে তৈরি হতে তাঁর বেশি সময় লাগল না। কী সতর্কতা অবলম্বন করবেন, মনে মনে তা ঠিক করে নিয়েছিলেন। ভদ্রতাও থাকে আবার বিপদের ঝুঁকি কমে, এইরকমের একটা মধ্য পন্থা। দলের কাউকে তিনি কোন কথা জানাননি।

নির্মাল্য মিশ্র যখন ভাবছিলেন যে ঘরের দরজা খুলে অন্ধকার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবেন কিনা, ঠিক সেই সময়েই তিনি দরজার উপরে খুব মৃদু করাঘাত শুনতে পেলেন। এই সংকেত তাঁর কাছে খুবই স্পষ্ট। নির্মাল্য মিশ্র দরজা খুলেই গুরবক্স্ সিং সোহলকে দেখতে পেলেন। নিঃশব্দে তিনি নমস্কার করে বললেন ঃ জেগেই আছেন!

নির্মাল্য মিশ্র খুব সতর্কভাবে বললেন ঃ জাহাজের টিকিট পেয়েছেন তো?

পেয়েছি।

বলে বোধহয় নির্মাল্য মিশ্রর জিনিষপত্র দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু

নির্মাল্য মিশ্র 'দেখি' বলতেই থমকে গেলেন। তাঁর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই সহাস্যে বললেন: দেখুন।

বলে নিজের এক হাতের ওপরে ব্রীফ কেসটা রেখে অন্য হাতে সেট খুলে ফেললেন। তারপর একটা পকেট থেকে দুখানা টিকিট বার করে নির্মাল্য মিশ্রর হাতে দিলেন। নির্মাল্য মিশ্র এক নজরে সব দেখে নিয়েই বললেন: ভাড়া তো খুব বেশি নয়!

কিন্তু গুরবন্ত্ সিং সোহল এ কথার উত্তর না দিয়ে শুধু একটুখানি হাসলেন। তারপরে ঘরের ভিতরে ঢুকে নির্মাল্য মিশ্রর জিনিষপত্র হাতে তুলে নিয়ে বললেন: আসুন।

নির্মাল্য মিশ্র তাঁর হাসির অর্থ কিছুটা বুঝতে পেরে লজ্জা পেয়েছিলেন। আর সেই লজ্জা ঢাকবার জন্যে গুরবন্ত্ সিং সোহলের হাত থেকে তাঁর ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে বললেন: চলুন।

বলে ঘরের বাতি নিবিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

গুরবন্ত্ সিং সোহলের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল রেস্টহাউসের বাইরে রাস্তার উপরে। নিঃশব্দে দুজনে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। ড্রাইভার গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিল। কোন কথা না বলে সে রওনা হয়ে গেল।

পথে যেতে যেতে নির্মাল্য মিশ্র বললেন: কী ভাবছেন?

মিস্টার সোহল বললেন: আপনার কথাই ভাবছি।

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন: আমার কথা!

মিস্টার সোহল সংক্ষেপে বললেন: হ্যাঁ।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র ছেড়ে দিলেন না, বললেন: কী ভাবছেন বলুন তো।

মিস্টার সোহল বললেন: দোষটা আমারই।

আপনার দোষ!

হ্যাঁ। নিজের পরিচয় আপনাকে দিই নি তো, মনে একটু খট্‌কা থাকা স্বাভাবিক!

লজ্জায় নির্মাল্য মিশ্রর মাথা যেন হেঁট হয়ে গেল। তবু তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে বললেন: জাহাজের ভাড়াটা দেখে নিলাম।

গুরবন্ত্ সিং সোহল কোন প্রতিবাদ না করে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি যা বোঝবার তা ঠিকই বুঝেছেন।

জাহাজঘাটায় পেঁছিতে তাঁদের বেশি সময় লাগল না। গাড়ি থেকে

তাঁরা নেমে পড়লেন। গুরবন্ত্ সিং সোহল তাঁর ড্রাইভারকে বললেন: জাহাজের খবর নিয়ে সময়মতো এসো।

নির্মাল্য মিশ্র লক্ষ্য করলেন যে ভদ্রলোকের প্রসন্ন মেজাজটি যেন কেমন থমথম করছে। আশ্চর্য এই ভদ্রলোকের মন! এঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে বোধহয় বেশ বেগ পেতে হবে।

তাঁরা যখন জাহাজে উঠলেন, অন্ধকার তখন স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। নির্মাল্য মিশ্র দেখলেন যে তাঁরা পাশাপাশি দুটি কেবিন পেয়েছেন। খুব সেকেলে ব্যবস্থা। কিন্তু তার জন্যে নির্মাল্য মিশ্র একটুও বিচলিত হলেন না। ভাবলেন যে, এই ব্যবস্থা যে আছে, একেই সৌভাগ্য বলে মেনে নিলে মনে কোন দুঃখ থাকবে না। নিজের কেবিনে জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে নির্মাল্য মিশ্র বেরিয়ে এসে দেখলেন যে গুরবন্ত্ সিং সোহল বাইরে তাঁর অপেক্ষা করছেন। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্রই আগে-ভাগে বললেন: ক্যান্টিন খুলেছে কিনা, দেখে আসা যাক।

মিস্টার সোহল বললেন: চা খাবেন?

পেলে মন্দ হত না।

কিন্তু জাহাজের চা তো ভাল লাগবে না, আমার সঙ্গে ভাল চা আছে।

বলে নিজের কেবিন থেকে একটা বড় ফ্লাস্ক্ বার করে আনলেন। বললেন: আসুন, ঐখানে বসে চা খাওয়া যাক।

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন: আপনি আবার এ সব ব্যবস্থা করেছেন কেন?

মিস্টার সোহল বললেন: নিজের জন্যেই করেছি।

চা খেতে খেতে নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আপনার লোকেরা বোধহয় কাল থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছে!

কেন বলুন তো!

আমার দলের লোকেরা রেস্টহাউসে ফিরেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল, রাতে যেন ঘর থেকে না বেরোই। মাঝে মাঝেই জারোয়ারা নাকি হামলা করে রাতে।

কিন্তু এ কথা তো আমার লোক আপনার দলের কাউকে বলেনি!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: নিশ্চয়ই বলেছে। তারা ফিরে এসেই আমাকে সতর্ক হতে বলেছে।

মিস্টার সোহল বললেন: কাকে বলা হয়েছিল আমি জানি। তিনি রেস্টহাউস থেকে বেরিয়েই দল ছেড়ে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু এই কথা শোনবার পরে—

দলের লোকের মারফৎ খবরটা আপনাকে পাঠিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু সতর্ক থাকতে বলা হয়েছিল তাঁকেই। তিনি যেন রাতে ঘর ছেড়ে না বেরোন। তার মানে রাতে ঘর ছেড়ে বেরোলে এই রকমের যে একটা বিপদ হতে পারে, তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।

তারপরেই বললেন ঃ এই জাহাজটার নাম আপনি দেখতে পেয়েছেন ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ না।

এই জাহাজের নাম টি. এস. এস. জারোয়া।

বলেন কি !

মিস্টার সোহল বললেন ঃ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপ-গুলোর মধ্যে যে তিনখানা জাহাজ চলাচল করে, তাদের নাম এই অঞ্চলের উপজাতিদের নামে।

আর দুখানার নাম ?

টি. এস. এস. চোলুন্‌গা ও এম. ভি. ওঙ্গে। আন্দামান থেকে নিকোবরে যেতে হলে এই সব জাহাজের একখানায় আপনাকে উঠতেই হবে। তা না হলে টেন ডিগ্রী চ্যানেল পেরোতে পারবেন না। কিন্তু আমাদের অসুবিধা কী জানেন ?

না।

এই সব জাহাজ চলাচলের কোন নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নেই। কাজ যত জরুরিই হোক না, আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে। জাহাজের খবর রাখতে হবে, আর জাহাজ ছাড়ছে শুনলেই আপনার হাজার অসুবিধা থাকলেও বেরিয়ে পড়তে হবে। তার কারণ, পরের জাহাজ কবে কখন ছাড়বে আপনি জানেন না।

সত্যিই অসুবিধার কথা !

মিস্টার সোহল বললেন ঃ কিন্তু কাছাকাছি দ্বীপে যাতায়াতের তত অসুবিধা নেই। ফেরি বোট আছে অনেক। সেগুলো কতকটা নিয়মিত যাতায়াত করে।

তাদের নামও কি ঐ রকমের ?

না। তারা হল গঙ্গা যমুনা নর্মদা চিতল—

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বুঝেছি।

কিন্তু উপজাতিরা এ সবের ধার ধারে না। তারা নিজেরা নৌকো তৈরি

করে, আর সেই নৌকোয় নিজেদের কাজ চালিয়ে নেয়। এমন নির্ভয়ে তারা সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় যে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। ঢেউ-এর ধাক্কায় আমরা বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাব।

এক সময়ে জাহাজ ছাড়ল। স্থির সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এল খোলামেলা সাগরে। জাহাজ দুলছে। অনেক কালের পুরনো জাহাজ। তবু এখনও ঝড়ের দাপটে ভেঙ্গে পড়েনি। বন্ধ হয়ে যায়নি জাহাজের ইঞ্জিন। পুরনো দিনের জাহাজ বলেই বোধহয় এখনও চলছে।

খানিকটা দমকা বাতাস এসে ডেকের উপরে আছড়ে পড়তেই গুরবন্ত্ সিং সোহল যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। রেলিঙের ধারে গিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন খানিকক্ষণ। তারপর ফিরে এসে বললেন ঃ লক্ষণটা ভাল নয়।

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ কেন?

আকাশে মেঘ উঠেছে।

ঝড়ের লক্ষণ নাকি?

ঝড় না হলেও বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।

নির্মাল্য মিশ্র খুশী হয়ে বললেন ঃ সমুদ্রের ওপরে বৃষ্টি আমি দেখিনি। ভারি সুন্দর দেখাবে নিশ্চয়ই!

মিস্টার সোহল এবারে হেসে বললেন ঃ সুন্দর তো দেখাবেই। কিন্তু বৃষ্টি না থামলে জাহাজ থেকে আমরা নামতে পারব না।

নির্মাল্য মিশ্র ছেলেমানুষের মতো বললেন ঃ নামব না তাহলে!

আপনার না নামলে চলবে, কিন্তু আমি তো নামবার জন্যেই যাচ্ছি। নামতে না পারলে আমার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

আবার আসবেন!

আপনার পরামর্শটা ভাল। কিন্তু আমার পক্ষে কী ভাল জানেন?

না।

জাহাজ যদি বৃষ্টি না ছাড়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে, মানে এক দিনের বদলে দু'দিন কিংবা তিনদিন দাঁড়িয়ে থাকে জেটিতে, তাহলেও মন্দ হয় না। আমি তাহলে কাজ সেরেই ফিরতে পারব।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ সর্বনাশ! আমার দলের সবাই তাহলে আমাকে ফেলে রেখেই ফিরে যাবে।

তারপরেই তাঁর নজর পড়ল জাহাজের খালাসিদের দিকে। ডেকের

ধারে ধারে যে দড়ি ঝুলছিল, তাই তারা একসঙ্গে টেনে ধরল। নির্মাল্য মিশ্র বলে উঠলেন : কী করছে ওরা ?

দেখবেন ?

বলে মিস্টার সোহল তাঁকে সেদিকে ডেকে নিয়ে গেলেন। কাছে গিয়ে নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে গেলেন। জেলেদের মতো খালাসিরাও মাছ ধরছে। নানা রঙের মাছ। বেশ বড় বড় মাছও আছে।

মিস্টার সোহল বললেন : এই মাছই আমরা খাব।

কেমন করে ?

খালাসিরা ক্যান্টিনে বেচবে, আর তা রেঁধে বেড়ে আমাদের খাওয়াবে ক্যান্টিন।

একসময়ে শিপশিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। নির্মাল্য মিশ্রর ভারি ভাল লাগছিল এই বৃষ্টি দেখতে। বাতাসেরও বেগ বাড়ছিল। তাই দেখে মিস্টার সোহল বললেন : আর দেরি করলে হয়তো বিপদে পড়তে হতে পারে।

কী বিপদ ?

বাতাসের দাপটে জাহাজ দুলতে শুরু করলে আমাদের গড়াগড়ি দিতে হবে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আমার বমি হয় না।

কিন্তু ব্রেকফাস্ট খেতে পারবেন না।

কেন ?

সব জিনিষ গড়িয়ে আপনার কোলে এসে পড়বে। চলুন তাড়াতাড়ি।

মিস্টার সোহলের তাড়ায় নির্মাল্য মিশ্র ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলেন বাতাস জোরে বইবার আগেই। শেষের দিকে বুঝতে পারছিলেন যে মিস্টার সোহল মিথ্যা ভয় দেখাননি।

মিস্টার সোহল বললেন : এক কাজ করুণ। কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। জাহাজের দুলুনি কমলে বেরিয়ে আসবেন।

বলে একরকম জোর করেই নির্মাল্য মিশ্রকে কেবিনে পাঠিয়ে দিলেন। নিচে নামবার সময় তিনি বললেন : এ আমার ওপর আপনি অত্যাচার করলেন !

মিস্টার সোহল বললেন : কেন করলাম, তা একটু পরেই বুঝতে পারবেন।

নির্মাল্য মিশ্র পিছন ফিরে বললেন : আপনি কী করবেন ?

আমার অভ্যেস হয়ে গেছে বলেই সাহস পাচ্ছি। তা না হলে আপনার মতোই কেবিনে আশ্রয় নিতাম।

বৃষ্টি তখন জোরে জোরে পড়ছে। আর দূরের সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে, আর নামছে। মনে হচ্ছে যে এই জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে ছুটে আসছে একটার পর একটা ঢেউ। জাহাজ সেই ঢেউয়ে উঠছে আর নামছে। ঢেউ-এর ওপরে দিনের আলোয় ঝিকমিক করছে বৃষ্টির ধারা। অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু জাহাজ এমন দুলছে যে নির্মাল্য মিশ্রর দু'পা টলছে। কোনরকমে কেবিনে ঢুকে তিনি শুয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল যে গুরুবন্ত্ সিং সোহল জোর করে তাঁকে কেবিনে পাঠিয়ে ভালই করেছেন। এখন বোধহয় তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না। কোন কিছু শক্ত করে ধরে না থাকলে কেউই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

নির্মাল্য মিশ্র শুয়ে শুয়ে দোল খেলেন অনেকক্ষণ। কেউ যেন দোলনায় দোলাচ্ছে তাঁকে। মন্দ লাগছে না দোল খেতে। তাঁর মনে হল যে জাহাজ বোধহয় এখন টেন ডিগ্রী চ্যানেল পার হচ্ছে। তাইতেই এই দুলুনি। সমুদ্র বুঝি সারাক্ষণ এখানে অশান্ত হয়ে থাকে।

এক সময়ে দুলুনি থামল। নির্মাল্য মিশ্রর মনে হল যে বাইরের পৃথিবী বুঝি শান্ত হয়ে গেছে। আরও একটু অপেক্ষা করে তিনি উঠে বেরিয়ে এলেন। তারপর উঠে এলেন ডেকের উপরে। দেখলেন, গুরুবন্ত্ সিং সোহল একখানা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন।

পায়ে পায়ে নির্মাল্য মিশ্র এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। পাশে বসেই বললেন : টেন ডিগ্রী চ্যানেল আমরা পেরিয়ে এলাম তো !

গুরুবন্ত্ সিং সোহল এইবারে হা হা করে হেসে উঠলেন। আর নির্মাল্য মিশ্র লজ্জা পেয়ে বললেন : আপনি হাসছেন যে ?

মিস্টার সোহল বললেন : টেন ডিগ্রী চ্যানেল সম্বন্ধে আপনার ধারণা দেখে।

মানে এর চেয়ে খারাপ ? কিংবা ভয়ঙ্কর ?

মিস্টার সোহল বললেন : এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। কিন্তু আকাশে মেঘ এখনও রয়ে গেল।

টেন ডিগ্রী চ্যানেল কি এখনও আমরা পেরিয়ে আসিনি ?

মিস্টার সোহল মাথা নেড়ে বললেন ঃ না। সমুদ্রের ও জায়গাটা আমরা রাতে পেরোব। কপাল নিতান্ত মন্দ না হলে সে সময়টা আমরা ঘুমিয়ে থাকব।

নির্মাল্য মিশ্র বোধহয় আরও কিছু শোনবার জন্যে গুরবন্ত্ সিং সোহলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাই দেখে মিস্টার সোহল বললেন ঃ এখন আমরা লিট্ল আন্দামানের কাছাকাছি এসে গেছি। এই দ্বীপেই আমরা সারাদিন কাটাব। তারপর এখান থেকে যাত্রা করব রাত দশটা নাগাদ।

তারপর ?

সকালবেলায় কার নিকোবর। টেন ডিগ্রী চ্যানেল এই দুই-এর মাঝে। একটা ক্ষ্যাপা সমুদ্র। জলের নিচে কী আছে কে জানে, সারাক্ষণ তোলপাড় করছে জল। জল পাক খাচ্ছে না ঝড় জলের দাপট, তা আজও জানতে পারিনি। যারা জানে, তারা বলতে চায় না কাউকে। কিন্তু বিপদে কোন দিন পড়িনি।

মিস্টার সোহলের শেষ কথায় খানিকটা আশ্বস্ত হলেন নির্মাল্য মিশ্র। বললেন ঃ আগে জাহাজ ডুবি হত বলে শুনেছি।

মিস্টার সোহল বললেন ঃ আমিও তাই শুনেছি। এই সব দ্বীপের অনেক আদিবাসী নাকি এমনি জাহাজডুবির যাত্রী। জাহাজ ডুবে যাবার পরে তারা ভাসতে ভাসতে এই সব দ্বীপে এসে উঠেছে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তখন বোধহয় এ রকম জাহাজ ছিল না। লোহা দিয়ে তৈরি হত না জাহাজ। সমুদ্রের দাপটে কাঠের জাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

একটু থেমে বললেন ঃ আশ্চর্য মানুষ ! ভয় পেত না কিছুতেই।

গুরবন্ত্ সিং সোহলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দূরের দিগন্তে। হঠাৎ এক-সময়ে বলে উঠলেন ঃ কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?

নির্মাল্য মিশ্র সেই দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ও কি, সমুদ্রের মাঝে নারকেল আর সুপুরি গাছ দেখছি না !

মিস্টার সোহল বললেন ঃ ঠিকই দেখেছেন। কিন্তু ঐ সব গাছ সমুদ্রে নয়, ও সব লিট্ল আন্দামানের গাছ। এবারে ঐ দ্বীপেই আমাদের জাহাজ ভিড়বে।

আনন্দে উচ্ছলিত হলেন নির্মাল্য মিশ্র।

॥ পনের ॥

জারোয়া এইবারে লিট্‌ল আন্দামানে ভিড়বে। লিট্‌ল আন্দামান বললে এই দ্বীপ সম্বন্ধে যে রকম ধারনা হয়, নির্মাল্য মিশ্রর তা মনে হল না। কাল তিনি ছোট দ্বীপ অনেক দেখেছেন। সেগুলো সত্যিই ছোট। কিন্তু এই দ্বীপ তাঁর কাছে একটি বিরাট ভূখন্ড বলে মনে হল। নারকেল ও সুপুরি গাছের দীর্ঘ সারির দিকে চেয়ে চেয়ে নির্মাল্য মিশ্র একসময়ে বলে উঠলেন: এই দ্বীপকে লিট্‌ল আন্দামান বলেছে কেন?

গুরবন্ত্‌ সিং সোহল বোধ হয় অন্য কিছু ভাবছিলেন। তাই প্রশ্নটা ঠিকমতো ধরতে না পেরে বললেন: এ একটা নাম।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: সাউথ আন্দামানের দক্ষিণে লিট্‌ল আন্দামান, অথচ দ্বীপটাকে ছোট বলে তো মনে হচ্ছে না!

মিস্টার সোহল এইবারে বুঝতে পেরে বললেন: সাহেবরা আন্দামানকে দু ভাগে ভাগ করেছিল—গ্রেট আন্দামান ও লিট্‌ল আন্দামান। গ্রেট আন্দামানে যে পাঁচটি প্রধান দ্বীপ তার তিনটি হল নর্থ মিড্‌ল ও সাউথ আন্দামান, আর ছোট দুটো দ্বীপের নাম বারাটঙ্গ ও রাটল্যান্ড। তারপর এই দ্বীপটার নাম রেখেছিল লিট্‌ল আন্দামান। অন্য কোন নাম রাখলেই বোধহয় ভাল হত।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এখানেও আপনার কাজ আছে?

সামান্য কাজ।

একটু থেমে বললেন: সারাদিন সময় পাওয়া যায় বলেই কিছু কাজ করে যাই।

তবে তো কিছু ধারনাও আছে এই দ্বীপ সম্বন্ধে।

মিস্টার সোহল বললেন: তা আছে। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন?

বলুন।

আপনাকেও যখন সারা দিন এই দ্বীপেই কাটাতে হবে, তখন আপনি নিজের চোখেই কিছু দেখুন। তারপর যা জানতে চাইবেন, তা আমার জানা থাকলে বলব। আর না জানা থাকলে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেব।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এই দ্বীপটা ঘুরে দেখবার কোন ব্যবস্থা আছে?

মিস্টার সোহল বললেন: চেষ্টা করে কিছু পাবেন কি না বলতে পারি না।

তারপরেই হেসে বললেনঃ নিজের পায়ের ওপরেই ভরসা রাখবেন। যতটা যেতে পারবেন, তাতেই আপনার সব দেখা ও জানা হয়ে যাবে বলে মনে হয়। সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি?

তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেনঃ ঐটে এখানকার যাত্রী-নিবাস। ঐ পর্যন্ত গেলেই অনেকের দেখা পেয়ে যাবেন। কথা বলার মতো কাউকে পেলে জানতেও পারবেন অনেক কিছু।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ সবাই বুঝি কথা বলার মতো নয়?

মিস্টার সোহল হেসে বললেনঃ কথা সবাই বলে। কিন্তু সবার কথা আপনি বুঝতে পারবেন না।

কোন্ ভাষায় কথা বলে এরা?

এটা তো পোর্ট-ব্লেয়ার নয় যে ভারতের প্রায় সব ভাষা জানা লোকই আছে। এখানে আপনি হল্‌চু দেখবেন, আর—

বাধা দিয়ে নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ হল্‌চু কারা? এ নাম তো কোন বই-এ পাইনি!

পাবেন না। তার কারন এটা ভাল নাম নয়। নিকোবরীদের ডাক নাম হল হল্‌চু। এই অঞ্চলে হল্‌চু নামেই তারা পরিচিত। নিকোবরী তাদের ভাষা। যদি কোন হিন্দী বা ইংরেজী জানা হল্‌চুর দেখা পান, তবে তা সৌভাগ্য বলে মনে করবেন। শিক্ষিত হল্‌চু এ দিকে বড় একটা আসে না।

আন্দামানের স্থানীয় লোক?

যাত্রী নিবাসে তাদের পাবেন না।

তবে আর কার দেখা পাব বলছিলেন?

হ্যাঁ। ভাগ্য ভাল হলে বাঙালীর দেখা পেয়ে যাবেন।

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেনঃ বাঙালী!

মিস্টার সোহল বললেনঃ আশ্চর্য হচ্ছেন কেন! লিট্‌ল আন্দামানে বাঙালীর সংখ্যা কারও চেয়ে কম নয়। তবে তারা থাকে অনেক দূরে।

জারোয়া তখন জাহাজঘাটায় ভিড়েছিল। মিস্টার সোহল বললেনঃ এখন একটু তাড়া আছে। ফিরে এসে বাঙালীদের গল্প বলব। আর ভাল কথা, ক্যান্টিনে আমি খাবার অর্ডার দিখে রেখেছি। দুজনের জন্যেই আমি যাত্রীনিবাসে আপনার খোঁজ করে এখানে আসব। আপনি যেন অন্য কোথাও চলে যাবেন না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আমার জন্য আপনি ভাবছেন কেন?

মিস্টার সোহল বললেন : আপনি যে আমার গেস্ট্। শুধু সঙ্গে করে আনিনি। ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্বও আমার।

বলে এগিয়ে গেলেন।

নির্মাল্য মিশ্র অপেক্ষা করলেন খানিকক্ষণ। যারা নামবে, তাদের মধ্যে ব্যস্ততা ছিল। কিছু যাত্রী বোধহয় এখানেই যাত্রা ভঙ্গ করবে। এখান থেকেই পোর্ট-ব্লেয়ারে গিয়েছিল, এখন ফিরছে। আবার কিছু যাত্রীর কাজ আছে এখানে। যারা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে জাহাজে আবার ফিরে আসবে। তাদেরই তাড়া বেশি। কিন্তু যারা কার নিকোবরে যাবে, তারা নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে। নির্মাল্য মিশ্র ভাবলেন যে যারা কিছু জিনিষ পত্র হাতে নিয়ে নামছে, তাদের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়াই ভাল। তারা হয়তো এখানকার অধিবাসী। পোর্ট-ব্লেয়ার থেকে ফিরছে নিজের বাড়ি। তাই একটু খুঁজে পেতে এই রকমের জন কয়েক যাত্রীর সঙ্গে মিশে গেলেন। ভাগ্য প্রসন্ন হলে এইখানেই কথা বলার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে।

জাহাজ থেকে নামবার সময় কারও সঙ্গে কথা বলতে পারলেন না নির্মাল্য মিশ্র। কিন্তু লক্ষ্য করেছিলেন অনেককে। ধুতির উপরে শার্ট পরা এক ভদ্রলোককে দেখে তাঁকে বাঙালী বলে সন্দেহ হয়েছিল। তাঁর হাতে একটা বড় থলে ছিল, আর বগলে সতরঞ্চি জড়ানো একটা বালিশ। জাহাজ থেকে নেমেই তিনি হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র তরতর করে এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন : ও মশাই, শুনছেন?

পিছনে ডাক শুনে ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। আর নির্মাল্য মিশ্র দ্রুত পায়ে তাঁর কাছে এসে বললেন : নমস্কার।

ভদ্রলোক বেশ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন : নমস্কার।

তারপর নির্মাল্য মিশ্রর আপাদমস্তক দেখে বললেন : আমাকে ডাকছেন?

নির্মাল্য মিশ্র সগৌরবে বললেন : হ্যাঁ, আপনাকেই তো!

ভদ্রলোক আরও আশ্চর্য হলেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : অমন আশ্চর্য হচ্ছেন কেন! বাঙালী বলে সন্দেহ হয়েছিল, তাই দু-চারটে কথা বলার জন্যে ডেকেছি।

ভদ্রলোক বললেন : আপনাকে তো কখনও দেখিনি!

তা দেখবেন কী করে! আমি পোর্ট-ব্লেয়ারেও থাকি না, লিট্‌ল আন্দামানেও নয়।

তবে?

আমি আসছি কলকাতা থেকে।

এখানে? কেউ আছে আপনার? কারও কাছে শুনিনি তো? আর কেমন লোক তিনি যে আপনি আসছেন জেনেও আপনাকে নিয়ে যেতে আসেননি? আপনি যাবেন কেমন করে?

একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন শুনে নির্মাল্য মিশ্র হাসলেন সকৌতুকে। বললেন: আপনি কেমন করে যাবেন?

আমরা তো হেঁটেই যাতায়াত করি।

তা আমি হাঁটতে পারব না ভাবছেন?

কার বাড়ি যাবেন বলুন?

এইবারে নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আমি কারও বাড়ি যাবার জন্যে আসিনি। এসেছি বেড়াতে। যদি কিছু দেখতে পাই তো তাই দেখে জাহাজে গিয়ে উঠব।

তাই বলুন।

বলে ভদ্রলোক একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: যদি আপত্তি না থাকে তো আপনাদের কথা কিছু বলুন। কখন এসেছেন এখানে, কেমন আছেন—এই সব কথা।

ভদ্রলোক বললেন: আমি আসিনি, আমার বাবা এখানে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন আমাদের নিয়ে।

কেন?

উদ্বাস্তু সমস্যার কথা শোনেন নি? ভারত স্বাধীন হবার পর দলে দলে বাঙালী উদ্বাস্তু যখন দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসে, তখন পশ্চিমবঙ্গে তাদের স্থান হয়নি। সরকার জোর জবরদস্তি করেই বাঙালী উদ্বাস্তুদের পাঠিয়েছিল দণ্ডকারণ্য আর আন্দামানে। বাবার কাছে শুনেছি, পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের তারা জোর করে কোথাও পাঠাতে পারেনি। তারা দিল্লী ও তার আশেপাশেই জবরদখল করে বসেছিল। এখন নাকি তারাই নিজেদের রাজ্য গড়ে তুলেছে।

নির্মাল্য মিশ্র এখানে কিছু বলতে আসেননি, এসেছেন দেখতে ও শুনতে। তাই এই ভদ্রলোকের কথার উত্তরে বললেন: সত্যি নাকি!

ভদ্রলোক বললেন: আমরা আর কতটুকু জানি! আমরা ছিলাম নিতান্ত শিশু। এ সব বোঝবার সময় আমাদের হয়নি। শুনেছিলাম যে তিন হাজারেরও বেশি উদ্বাস্তু পাঠানো হয়েছিল আন্দামানে ১৯৪৭-এর পর থেকে

১৯৪৯-এর মধ্যে। তারপরেও পাঠানো হয়েছে অনেক। কিন্তু আমরা তার কোন হিসেব রাখিনে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এখানে কত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু আছেন?

পূর্ববঙ্গের!

বলে ভদ্রলোক যেন কৌতুকের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন: আপনারা উদ্বাস্তু শুনলেই ভাবেন পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। কিন্তু পূর্ববঙ্গ বললে কী বোঝাত জানেন?

কী?

পদ্মাপারের দেশ। যশোর-খুলনা কোন কালেই পূর্ববঙ্গে ছিল না। পুরনো ম্যাপের বই-এ দেখেছি যে প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের জেলাগুলিকে চিরকালই পশ্চিমবঙ্গ বলা হত। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, যশোহর আর খুলনা জেলাকে নিয়ে প্রেসিডেন্সী ডিভিসান। দেশ বিভাগের সময় চব্বিশ-পরগণা পুরোপরি রইল ভারতে। আর যশোর খুলনা গেল পাকিস্তানের হাতে। এখন সে অঞ্চল হয়েছে বাঙলাদেশ। সেখানে আর বোধহয় পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ নেই। কিন্তু চব্বিশ-পরগণার লোক এখন যশোর খুলনাকেও বলে পূর্ববঙ্গ। আমরা সেই অঞ্চলের লোক, তাই আপনাদের কাছে পূর্ববঙ্গেরই উদ্বাস্তু।

নির্মাল্য মিশ্র লজ্জিতভাবে বললেন: আমার ভুল হয়েছে।

কিন্তু ভদ্রলোক তখনই বললেন: না না, এ আপনার ভুল নয়। এ ভুল আজকাল সবাই করে। আমরাও অনেকে নিজেদের পূর্ববঙ্গেরই উদ্বাস্তু ভাবি। কলকাতার লোকেও শুনেছি যশোর খুলনার লোককেও আজকাল বাঙাল বলে।

তারপরেই হেসে বললেন: আমার বাবা নাকি পূর্ববঙ্গের লোককে বাঙাল বলতেন। এখন নিজে বাঙাল হয়েছেন।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এখানে আপনারা সুখেই আছেন তো?

সুখে!

বলে ভদ্রলোক হাসলেন। তারপরে বললেন: সুখ বলতে যদি দুবেলা পেট পুরে খাওয়া বোঝেন, তাহলে এখানে আমরা প্রায় সবাই খুব সুখেই আছি।

নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে তিনি হয়তো কোন দুঃখের স্থানে

আঘাত দিয়ে ফেলেছেন। তাই কোন কথা না বলে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ভদ্রলোক বললেন : বুঝতে পারলেন না তো!

না।

প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ধান আর সব্জি হয় এখানে। সমুদ্রে মাছেরও কোন অভাব নেই। এই নিয়েই সুখী হতে পারলে এখানে আমাদের সুখের শেষ নেই। বাবারা যখন উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন, তখন পরিবার পিছু পাঁচ একর ধানের জমি আর পাঁচ একর বুনো পাহাড়ী জমি পেয়েছিলেন। বনের গাছ কেটে জমি সমতল করে এখন তার সবটাতেই আমাদের চাষ হয়। বাড়ি করবার জন্যে বনের অপর্যাপ্ত কাঠ আর টিন পেয়েছিলেন। তাই ঘরবাড়িও আছে। এখন পরিবার বাড়ছে। এখানেই আমরা কয় হাজার পরিবার আছি বলতে পারব না। রবীন্দ্র নগর, নেতাজী নগর গড়েছি, গড়েছি রামকৃষ্ণ নগর, বিবেকানন্দ নগর। ছেলে-মেয়েদের বিয়ের জন্যে আর দূরে যেতে হয় না। উত্তর আন্দামানের দিঘলিপুর থেকে এই লিট্‌ল আন্দামান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে আমাদের উদ্বাস্তু কলোনি। কত সুন্দর সুন্দর নাম—ক্ষুদিরামপুর, স্বদেশনগর, ফেরারগঞ্জ, নেবুতলা, গুপ্তপাড়া, বকুলতলা, মানপুর, মথুরা—এ সব আমাদেরই দেওয়া নাম। কোন্ দ্বীপে আমরা নেই!

নির্মাল্য মিশ্র ভয়ে ভয়ে বললেন : আপনাদের অভাব কিসের?

অভাব! সরকার আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে স্কুল করে দিয়েছেন। কোথাও কো-অপারেটিভ। কোথাও—

বলে থামলেন একটুখানি। তারপরে বললেন : কিন্তু কারও অসুখ করলে? হ্যাঁ, ডিসপেনসারি আছে একটা। কখনও কম্পাউণ্ডার আছে, কখনও নার্স আছে। যদি ডাক্তার থাকে তো বলবেন, এই ওষুধটা পোর্ট-ব্লেয়ার থেকে কিনে আনুন।

বলে থলের ভেতর থেকে একটা ওষুধের শিশি বার করে দেখালেন। বললেন : এই ওষুধ নিতে কেউ আসেনি! বোধহয় আর দরকার নেই।

ভদ্রলোকের দু' চোখে জল ভরে এল। নির্মাল্য মিশ্র কোন কথা বলতে পারলেন না।

ভদ্রলোক নিজেই বললেন : দোষ কারও নয় বুঝলেন! দ্বীপের মানুষ চিরকালই এইভাবে বাঁচার জন্যে যুদ্ধ করেছে। মরে মরে শেষ হয়ে

গেছে এখানকার আদিবাসীরা, তাদের বদলে আমরা এসেছি। আমাদের বদলে একদিন হয়তো আর কেউ আসবে।

নির্মাল্য মিশ্র ভয়ে ভয়ে বললেন: কিন্তু এইভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। বাঁচার পথ খুঁজে বার করতে হবে আমাদেরই। বেঁচে থাকবার জন্যে যুদ্ধ শিখতে হবে।

ভদ্রলোক বললেন: কার সঙ্গে যুদ্ধ করব। বনে আর হিংস্র পশু নেই, আদিবাসীরা হিংসা করবে কাকে। তারা আমাদের চেয়েও অসহায়। প্রকৃতি ক্ষেপে ওঠে ঠিকই, কিন্তু নিজেই শান্ত হয়ে দাক্ষিণ্যে ভরে দেয় আমাদের ভাণ্ডার। আমাদের শত্রু কে, কোথায় তারা! তাদের চিনতে পারলে তো যুদ্ধের কথা ভাবব!

নির্মাল্য মিশ্র বলতে পারলেন না যে সরকারের কাছে তদ্বির করুন। কেমন এক রকমের লজ্জায় তাঁর মাথা নিচু হয়ে গেল।

ভদ্রলোক নিজেই বললেন: একদিন ইংরেজ এই দেশের রাজা ছিল। তারা ছিল আমাদের শত্রু। তাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বললেই বিপদ ছিল। বিচারে ফাঁসি হত তাদের, দ্বীপান্তর হত এখানে। এখন আমাদের নিজেদের সরকার। এ সরকার তো শত্রু নয়, এ আমাদের ভালোটাই চায়। এ সরকারের প্রজা হয়ে থাকবার জন্যে আমরা দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলাম। এই সরকার ভক্তির জন্যেই আমাদের দ্বীপান্তর হয়েছে। কিন্তু এ তো আমাদের শত্রু সরকার নয় যে আমরা এই সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করব। আর যুদ্ধ করবই বা কী করে। সরকার তো চীনের প্রাচীরের মতো। মাথা ঠুকে ফাটল ধরাতে পারি, এমন শক্তি আমাদের কোথায়।

বড়রকমের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল ভদ্রলোকের। নির্মাল্য মিশ্র স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভদ্রলোক বললেন: অনেক বাজে কথা বললাম আপনাকে। অথচ আপনারা কেমন আছেন তা জানতে চাইলাম না। আপনারা বোধহয় ভাল আছেন!

নির্মাল্য মিশ্র এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন: আপনারা কি আমাদের কথা জানেন না?

জানব কী করে! খবরের কাগজ নাকি বেরোয়, রেডিওতেও নাকি খবর প্রচারিত হয়। আরও কত কি হয়েছে শুনতে পাই। কিন্তু আমাদের জন্যে তো কিছু নেই! আকাশে যতক্ষণ সূর্য আছে, ততক্ষণই আমরা

পৃথিবীটাকে দেখি। তারপর সব অন্ধকার। বিজলি তো নেই, কখন-সখনও কেরোসিন পেলে বিপদ আপদের জন্যে তুলে রাখি।

নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে কথা বাড়ালে আরও অনেক দুঃখের কথা শুনতে হবে। তাই বললেন: আপনার বোধহয় খুব দেরি করে দিলাম, তাই না!

ভদ্রলোকের হাসি ঠিক কান্নার মতো দেখাল। বললেন: না। ওষুধের জন্যে তাড়া থাকলে এখানে কেউ অপেক্ষা করত। এ ওষুধ বোধহয় সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে হবে।

নির্মাল্য মিশ্র সাহস করে জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না কার অসুখ, কী অসুখ, রোগী বেঁচে নেই বলে কেন মনে করছেন। তাই নীরবে রইলেন। ভদ্রলোকও আর কোন কথা না বলে বিদায় নিলেন। বিড়বিড় করে বোধহয় বললেন: নমস্কার।

॥ ষোল ॥

নির্মাল্য মিশ্র আর গ্রামের দিকে এগোলেন না। তাঁর পা আর চলছে না। আন্দামান দেখার বাসনা বুঝি সহসা শেষ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, আর কিছু দেখবার নেই, জানবার নেই আর কিছু। লিট্‌ল আন্দামানের মাটিতে পা দিয়েই তাঁর সব কিছু জানা হয়ে গেছে।

নির্মাল্য মিশ্ররা দল বেঁধে আন্দামান দেখতে এসেছেন। আন্দামান দেখে ফিরে যাবেন তাঁরা। নিত্যকার কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে ভাল লেগেছে তাঁদের। নানা জিনিষ দেখে আরও ভাল লাগবে। এই আশা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ট্যুরিস্ট তাঁরা। তাঁদের জন্যেই দেশের সরকার কত ব্যবস্থা করেছেন। আরও কত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আশা করছেন তাঁরা। এই কথা ভেবে নির্মাল্য মিশ্রর আজ হাসি পেল। তিনি সামনের দিকে না এগিয়ে জাহাজেই ফিরে এলেন।

গুরবন্ত্‌ সিং সোহল লাঞ্চের আগেই ফিরে এলেন। নির্মাল্য মিশ্রকে ডেকে বসে থাকতে দেখে খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কত দূরে গিয়েছিলেন?

নির্মাল্য মিশ্র তন্ময় হয়ে কিছু ভাবছিলেন। চমকে উঠে বললেন: না, কোথাও যাইনি।

কিন্তু আপনাকে তো আমি জাহাজ থেকে নামতে দেখেছি।

তা দেখেছেন।

তবে।

মাটিতে পা দিয়েই জাহাজে উঠে এসেছি।

মিস্টার সোহল বেশ আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ সে কি!

এক নজরেই সব দেখা হয়ে গেল কিনা!

কিন্তু মিস্টার সোহলের এ কথা বিশ্বাস হল না। নির্মাল্য মিশ্রর মুখ দেখে অন্য কিছু সন্দেহ হচ্ছে। থমথম করছে তাঁর মুখ। বুঝতে পারলেন যে তিনি কোন বেদনার কথা লুকোতে চাইছেন। তাই মিস্টার সোহল আর কোন প্রশ্ন না করে বললেন ঃ আমারও কোন কাজ হল না।

কেন?

যার সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম, তাকে পেলাম না। খবর না দিয়ে এলে এইরকমই হয়।

খবর দিয়ে আসেন না কেন?

কথাটা বলেই নির্মাল্য মিশ্র লজ্জা পেলেন। আর হাসলেন গুরুবক্স সিং সোহল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বিকেলের দিকে আর একবার খোঁজ নেবেন বোধহয়?

লাভ নেই।

কেন?

তিনি আজ ভোরবেলায় দূরে কোথাও গেছেন। ফিরতে তাঁর দেরি হবে। বৃষ্টি নামলে হয়তো ফিরতেও পারবেন না।

রাতে থাকবেন কোথায়?

দূরে দূরে উদ্বাস্তু কলোনি আছে। কোথাও আশ্রয় নেবেন।

তারপরেই বললেন ঃ আন্দামানের সম্পদ আমরা ভোগ করতে পারছি না।

কেন?

যোগাযোগের ব্যবস্থার অভাবটাই সব চেয়ে বড় অন্তরায়। এখানকার বনে এমন সব কাঠ আছে যা অন্য জায়গায় সোনার মতো দামী। গুরজান হল প্লাই উড, পাপিতা ম্যাচ উড, পাদাউক রেড উড। পাদাউককে পেডোক, আর গুরজানকে আপনারা গর্জন কাঠ বলেন। এছাড়া চাগলাম টাঙ্গপেয়ি মার্বেল প্রভৃতি দুশো জাতের কাঠ পাওয়া যায় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ-

পুঞ্জের দ্বীপগুলোতে। এইসব গাছ কেটে কাঠ সরাবার কাজে হাতিকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। পোর্ট-ব্লেয়ারে যে স-মিল আছে, তা লোকে এদিকের অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় করাত কারখানা বলে। প্লাই উড ও ম্যাচ উডের চাহিদা ভারতে অসম্ভব। দ্বীপের লোকেরা কাঠ কেটে চালান দিতে রাজী, আমরা হা-পিত্তেশ করে বসে আছি। কিন্তু কিছুই করতে পারছি না।

কেন?

করব কী করে? চালান দেব কেমন করে? এই সব দ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগই বা রক্ষা করব কী দিয়ে?

একটু থেমে বললেন: এখানকার চাষীদের কথা শুনেছেন?

নির্মাল্য মিশ্র কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

মিস্টার সোহল বললেন: ঘর ভর্তি ধান চাল। শোবার জায়গা নেই, বসবার জায়গা নেই। কিন্তু কিছু যে এখান থেকে চালান দিয়ে দু পয়সার মুখ দেখবে, তার উপায় নেই। আর আমাদের অবস্থা ভাবুন, আলুর মতো সামান্য জিনিষের জন্যেও আমরা কলকাতার মুখাপেক্ষী হয়ে আছি। কেরালা নারকেলের ছোবড়া থেকে খোলা পর্যন্ত বেচে বড়লোক হয়ে গেল। আমাদের নারকেল আর সুপুরি খেয়ে শেষ হয় না। অপর্যাপ্ত কাজু বাদাম হতে পারে। কেরালার মতো রবার, চা, কফি, কোকো, মশলা, পাতি—সব হতে পারে এখানে। আর মালয়ের মতো বেত বাজার গড়ে তুলতে পারলে এই দ্বীপগুলোতে সোনা ফলানো সম্ভব।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: কোন উদ্যোগ নিশ্চয়ই হচ্ছে।

খুব ধীরে ধীরে। করাত কলের মতো নারকেল তেলের কল বসেছে। প্লাই উড আর দেশলাই ফ্যাক্টরি। কটেজ ইন্ডাস্ট্রির মতো ছোট ছোট ব্যাপার, বড় কোন প্ল্যান বা ডেভেলপ্মেন্টের কথা শুনতে পাই নে।

কেউ হয়তো ভাবছেন?

আমার ভেবে তো লাভ নেই। আমাদের ভাবনা আমাদের ঘরের বাইরে যাবে না। ফুর্তির কথা বাইরে পৌঁছয়, কবরে চাপা পড়ে ঘরের হাহাকার।

নির্মাল্য মিশ্র চমকে উঠলেন। এ ভদ্রলোকও যে সেই একই সুরে কথা কইছেন। বক্তব্য একই, ভঙ্গিটা আলাদা।

মিস্টার সোহল বললেন: সরকার বলছেন, সমবায় গড়, শক্তি বাড়বে। আমরা সমবায় গড়েছি, শক্তি বেড়েছে। তারপর? তারপর কী করব! এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে?

নির্মাল্য মিশ্র এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না।

মিস্টার সোহল বললেনঃ তার চেয়ে চলুন! লাঞ্চটা সেরে নেওয়া যাক। রাতে তো ভাল ঘুম হয়নি। একটু ঘুমিয়ে নেবেন খাবার পর।

সময় কাটাবার জন্য ঘুমই সবচেয়ে ভাল উপায়। ঘুম এলে আর কোন ভাবনা নেই। সব কষ্টের শেষ, সব দুশ্চিন্তার অবসান। মুমূর্ষুর কাছে মৃত্যুর মতো ক্লান্ত মানুষের কাছে ঘুমই পরম কাম্য। নির্মাল্য মিশ্র আজ বেশ ক্লান্ত মনে করছিলেন। তাই লাঞ্চ সেরে এসে নিজের কেবিনে ঢুকে শুয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ পরেই ঘুমে দু চোখ জড়িয়ে এল।

নির্মাল্য মিশ্রর ঘুম যখন ভাঙল, তখন অন্ধকার নেমেছে। প্রথমে তার মনে হয়েছিল যে সকাল বুঝি হয় নি। তার পরেই মনে পড়ল যে—রাতের ঘুম নয়, তাঁর দুপুরের ঘুম ভাঙল। কিন্তু কেবিন এমন অন্ধকার কেন!

তিনি উঠে বাতি জ্বাললেন। তারপর ঘড়ি দেখলেন। আশ্চর্য ব্যাপার! বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। নির্মাল্য মিশ্র যে এমন অকাতরে ঘুমিয়েছেন তা বুঝতেই পারেন নি। এক রকমের লজ্জা এল তাঁর। তিনি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে ডেকে চলে এলেন।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল অবিচ্ছিন্ন ভাবে। কখন এই বৃষ্টি নেমেছিল কে জানে। চারি দিক থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ আসছিল। বৃষ্টির জল নানা জায়গায় পড়ে নানা রকমের শব্দ আসছে। নির্মাল্য মিশ্র ডেকের উপরে খানিকটা ঘুরে বেড়ালেন। গুরবন্ত্ সিং সোহলকে কোথাও দেখতে পেলেন না। ক্যান্টিনে গিয়ে চা চেয়েছিলেন। তারপরেই বললেনঃ চা নয়, কফি দাও।

কফির পেয়ালা নিয়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলেন।

কিন্তু সময় আর কাটতে চায় না। কোন কাজ নেই। কোন বইপত্র সঙ্গে নেই যে তা পড়ে খানিকটা সময় কাটাবেন। কোন মহিলা যাত্রীও তিনি দেখতে পেলেন না। যাঁরা জাহাজ থেকে নামেননি, তাঁরা কী ভাবে সময় কাটাচ্ছেন তা দেখেই তিনি আরও কিছু সময় কাটিয়ে দিলেন। তারপর একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন।

এই সময়ে এক ভদ্রলোক এসে তাঁর কাছাকাছি বসলেন। ভদ্রলোক লুঙ্গির মতো করে সাদা ধুতি পরেছিল। তার উপরে একটা হাত কাটা

বুশ সার্ট। গায়ের রঙ কালো, গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ বিজলির আলোয় বেশ চক চক করছে। নির্মাল্য মিশ্র তাঁর দিকে তাকাতেই দু হাত জুড়ে বললেন : নমস্কারম্।

নির্মাল্য মিশ্রও তাঁকে নমস্কার করলেন।

তারপরেই ভদ্রলোক তাঁর পাশের চেয়ারে উঠে এসে ইংরেজীতে বললেন : কী বিশ্রী বৃষ্টি নেমেছে দেখেছেন। এইভাবে বৃষ্টি চললে কাল আমাদের কোন কাজ হবে না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : কার নিকোবর তো অনেক দূরে। সেখানে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হচ্ছে না।

গুড্ গড্। অনেক দূর কোথায়! মাত্র আশি মাইল, মানে—

বুঝেছি।

কত কিলোমিটার বলুন তো!

মাইলেই ভাল বুঝি।

মাইল তো আমাদের জন্যে। আপনারা এখন—

বলে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে বয়সে তিনি প্রবীণ। তাই পুরনো নিয়মে তিনি মাইলে হিসেব করেন, নবীন নির্মাল্য মিশ্রর বোধ হয় কিলোমিটারে না বললে দূরত্ব বুঝতে অসুবিধা হবে।

তারপরেই তিনি গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন : সর্দারজী আপনার কে হয়?

নির্মাল্য মিশ্র সংক্ষেপে বললেন : কেউ নয়।

গুড্ গড!

গডকে তিনি গাডের মতো উচ্চারণ করছেন বার বার। কিন্তু এবারে আর তার বেশি কিছু বললেন না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বললেন : কোথা থেকে আসছেন আপনারা।

পোর্ট-ব্লেয়ার থেকে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সর্দারজীকে সেখানে দেখেছি মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে তো দেখিনি!

এই উক্তির উত্তর এড়িয়ে যাবার জন্যে নির্মাল্য মিশ্র বললেন : সর্দারজীকে কোথায় দেখেছেন?

মনে হচ্ছে অ্যাবার্ডিন বাজারে। সেখানে অনেক সর্দারজী আছে।

নির্মাল্য মিশ্র এইবারে জেরা আরম্ভ করলেন : আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ম্যাড্রাস থেকে।

কাজ কোথায়? পোর্ট ব্লেয়ারে, না কার নিকোবরে।

কাজ দু জায়গাতেই।

কী কাজ?

এ দিকে বিজনেস প্রস্পেক্টস কী রকম, তাই দেখতে এসেছি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আপনার কিসের বিজনেস?

ভদ্রলোক সচকিত হয়ে উঠলেন। বললেন: নানান রকম।

কোন মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আছে?

কেন বলুন তো!

যদি আলাপ থাকে তো খোলাখুলি বলি।

স্টেটের এক মিনিস্টার আমার রিলেটিভ।

সেণ্টারে কেউ আছেন?

ধরবার মতো লোক আছে।

নির্মাল্য মিশ্র খুব উৎসাহ পাবার ভান করে বললেন: তবে কথাটা খুলেই বলি। আমিও একই ধান্দায় কলকাতা থেকে এসেছি। এখানে ট্রান্সপোর্টের বিজনেসটা খুব ভাল চলবে। সরকারের কাছ থেকে একখানা মালবাহী জাহাজ বাগাতে পারেন? আর কয়েকটা ট্রাক?

ট্রাক কটা?

যটা দ্বীপে বিজনেস করবেন, ততগুলো ট্রাক, আর কয়েকটা বেশি থাকলেই ভাল।

ভদ্রলোক তাঁর চেয়ার ঘুরিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসলেন, বললেন: কী করতে হবে বলুন তো!

এই ট্রান্সপোর্টের বিজনেস করেই আপনি লাল হয়ে যাবেন। খুব অনেস্ট বিজনেস। মার খাবার একেবারে ভয় নেই। আপনার আর কোন ক্যাপিটাল লাগবে না। মানে, সামান্য কিছু রানিং ক্যাপিটাল থাকলেই চলবে। ডিজেল কেনার পয়সা, আর ড্রাইভার ক্লিনার আর মেকানিকদের মাইনে দেবার পয়সা। তারপর মাছের তেলেই মাছ ভাজুন। আন্দামান নিকোবরের সব ধান্দাবাজ আসবে আপনার মুঠোর মধ্যে। এমনকি সর্দারজীও।

ভদ্রলোক ডানে-বাঁয়ে তাঁর মাথাটা নাড়লেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন: কথাটা ভাল বলেছেন। এর জন্যেই এখানে প্রাইভেট বিজনেস

হচ্ছে না। স-মিল, প্লাই উড, আর ম্যাচ ফ্যাক্টরি চালাচ্ছে সেণ্টার। তাদেরই জিনিষপত্র আসা যাওয়া করছে। বাকি সবাই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে।

তাই দেখলেন বুঝি ?

দেখলাম আর কোথায়, নিজের বুদ্ধিতে বুঝলাম যে বড় বিজ্ঞনেসে এগ্রিমেন্ট করতে সবাই ভয় পায়। বলে এখানে জিনিষপত্রের দরকার অনেক, কিন্তু মার্কেট ছোট।

এ আবার কী রকম কথা ?

মানে পোর্ট-ব্লেয়ারের বাইরে কোন মার্কেট নেই। দরকার তো সেখানে !

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আর এখানকার জিনিষের মার্কেট বাইরে কেমন হবে ?

খুব ভাল। কিন্তু এরা মাল পাঠাতে চাইছে না।

কেন ?

ভদ্রলোক বললেন : ঠিক আপনি যা বললেন, সেই কথা। কিন্তু আপনার এ লাইনের এক্সপীরিয়ান্স কত দিনের বলুন তো !

এক দিনের।

উত্তেজিতভাবে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, বললেন : আমার সঙ্গে আপনি জোক্ করবেন না। বলুন, এক দিনেই প্রবলেমটা ধরে ফেলেছেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : স্থির হয়ে বসুন। আর একটা কথা বলছি।

ভদ্রলোক আবার বসে বললেন : বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আপনি তো দক্ষিণ দেশের লোক।

ইয়েস, সাউথ ইণ্ডিয়ান। নর্থ ইণ্ডিয়ায় কখনও যাইনি। এমন কি কাশীতেও না।

দিল্লীতেও না ?

না।

দিল্লী না গেলে জাহাজ জোগাড় করতে পারবেন না। এখান থেকে ফিরে একবার দিল্লী চলে যাবেন আপনার মন্ত্রী রিলেটিভের চিঠি নিয়ে। বলবেন, এই অঞ্চলের উন্নতির জন্যেই জাহাজ চাই, কিংবা জাহাজ কেনবার টাকা।

তারপরেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন : লাক্ষা দ্বীপে গেছেন—লাক্ষা মিনিকয় আমিন ডি ভি আইল্যাণ্ড্স ?

না।

শুনেছি, সেখানকার অবস্থা নাকি আরও খারাপ। সেখানকার বিজনেস প্রস্পেক্টও আপনার দেখে আসা দরকার। যদি মনে করেন, সেখানকার প্রস্পেক্ট আরও ভাল তবে কম্পিটিটর কম পাবেন। সেটাও সুবিধের।

ভদ্রলোক দু চোখ বিস্ফারিত করে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি ঘুরে এসেছেন নাকি?

ভাবছি, যাব।

যাবেন?

তাই ঠিক করেছি। এখানে কিছু করবার আগে সেখানটাও ঘুরে আসব। তবে—

তবে কী?

দূর একটু বেশি হয়ে যাবে। কলকাতা থেকে কেরালায় যেতে হবে। বোধহয় কালিকটে। সেখান থেকে কাভারাত্তি সোয়াশো মাইলের কম হবে না। দূরের দ্বীপগুলো শুনেছি প্রায় দুশো মাইল দূরে।

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন: আপনি তো ও দিকের খবরও রাখেন দেখছি। কিন্তু কেরালায় গিয়ে বিজনেস করতে পারবেন কি?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: পারতেই হবে। দূর দেখলে কি বিজনেস চলে? না, ভয় পেলে কোন কাজ হয়?

কিন্তু আপনি যাই বলুন, সর্দারজীদের সঙ্গে কারবার করবেন না। ডুবিয়ে দেবে আপনাকে। এখন ওরা সবার চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরে।

তাই নাকি!

দেখছেন না আপনি! কী ভাবে দিল্লী থেকে আমাদের তাড়াচ্ছে। যারা ফিরে আসছে, তারা সবাই বলছে এক কথা, দিল্লী নাকি তাদের, তাড়াও সব সাউথ ইন্ডিয়ানকে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আমাদেরও তো সবাই তাড়াচ্ছে—আসাম থেকে, বিহার থেকে, উড়িষ্যা থেকে। দিল্লী থেকে আপনারাই আমাদের তাড়িয়ে দিলেন! তাই না?

ভদ্রলোক বললেন: আমাদের দোষ দিচ্ছেন কেন! আমরা কাউকে তাড়াতে যাই নে। যাই নিজের পেটের ধান্দায়।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আমরাও এখন পেটের ধান্দায় চারি দিকে ছুটে বেড়াচ্ছি। দরকার হলে প্যাক্ট করছি সকলের সঙ্গে।

ভদ্রলোক নির্মাল্য মিশ্রের কানের কাছে মুখ এনে বললেন: আমার

সঙ্গে প্যাক্ট করতে পারেন। আমি আপনার শেয়ার মারব না। কিন্তু সর্দারজীদের সঙ্গে কিছুতেই যাবেন না, বুঝলেন। আর মালয়ালীদের সঙ্গেও না।

বলেই লাফিয়ে উঠলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

একটু পরেই নির্মাল্য মিশ্র দেখলেন যে গুরবন্ত সিং সোহল ধীর পদক্ষেপে এই দিকে আসছেন। নির্মাল্য মিশ্রের কাছাকাছি এসে বললেন: বৃষ্টিতে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। তবু একটু ভিজেছি। আসছি কাপড় ছেড়ে।

ভদ্রলোকের হাতে ছাতা ছিল। তবু ভিজে গেছেন বেশ খানিকটা। তাঁকে আসতে দেখেই যে দক্ষিণের ভদ্রলোক পালিয়ে গেছেন, তা বুঝতে নির্মাল্য মিশ্রর অসুবিধা হল না।

বাইরের বৃষ্টি এখন বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আকাশে মেঘ জমে আছে কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। দিগন্তে তারা নেই একটাও, মাথার উপরে আছে কিনা কে জানে!

॥ সতেরো ॥

লিটল আন্দামান থেকে জারোয়া জাহাজ ছাড়ল রাত দশটার পরে। টেন ডিগ্রী চ্যানেল পেরিয়ে এই জাহাজ কার নিকোবর দ্বীপে পৌঁছবে সকাল-বেলায়। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রধান ঘাঁটি এইখানেই। এই দ্বীপ থেকেই অন্যান্য দ্বীপের শাসন পরিচালনা করা হয়।

নির্মাল্য মিশ্র টেন ডিগ্রী চ্যানেলের সম্বন্ধে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করে-ছিলেন। দশ ডিগ্রীর অক্ষরেখা তো একটা কল্পিত রেখামাত্র। বিষুব রেখা থেকে উত্তরে এই রেখা পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে বলে কল্পনা করা হয়। এই দশ ডিগ্রীর অক্ষরেখা শুধু বঙ্গোপসাগরের এই অংশে নয়, অন্যান্য সমুদ্রের উপরেও আছে। কিন্তু সে সব জায়গায় সমুদ্র ভয়াবহ নয়। লিটল আন্দামান ও কার নিকোবরের মাঝে দশ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা সমুদ্রের যে অংশের ওপর দিয়ে গেছে, সমুদ্র শুধু সেখানেই নাকি ভয়ংকর। কেন, তা কেউ জানে না। কী হয়, তা কেউ বলে না। শুধু মুখে মুখেই প্রচারিত হয়েছে যে সমুদ্র সেখানে ভয়ংকর, জাহাজ নিয়ে খেলা করে সমুদ্র।

নির্মাল্য মিশ্র যাত্রীদের অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জাহাজেরও

অনেক কর্মীকে। কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর কেউই দিতে পারেন নি। জাহাজ দোলে, ভীষণ রোল করে, অস্বস্তি বোধ হয়, মাথা ঘোরে, বমি হয় অনেকের। আবার অনেকে ঘুমিয়ে এই জায়গাটা পার হয়ে যায়, কিছু জানতেই পারে না।

কেউ বললেন, অন্য জায়গায় যে এ রকম হয় না তা নয়। সমুদ্রের যে কোন জায়গায় ঝড় উঠলে এই রকমই হয়। এই জায়গাটায় ঝড়-জল বেশি হয় বলেই সমুদ্রের একটা দুর্নাম রটে গেছে।

নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পেরেছেন যে কোন প্রাকৃতিক কারণে হয়তো বা সমুদ্রের নিচে এই দুই দ্বীপপুঞ্জের সংযোগকারী পাহাড়ের কোন বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থানের জন্যই নিচের জল আবর্তিত হয়ে উপরেও ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করে। কিংবা আবহাওয়ায় একটা বিশেষ চাপ সৃষ্টি করে বলেই ঘূর্ণি ঝড়ে সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রকৃত কারণটি সমুদ্রের জলে না উপরের আবহাওয়ায়, বিশেষজ্ঞরাই তা সঠিক বলতে পারবেন।

যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা বললেন ঃ খেয়ে দেয়ে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন। একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু জেগে থাকলেই কষ্ট পাবেন।

নির্মাল্য মিশ্রও এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন। রাতের আহার তাড়াতাড়ি সেরে একটা অ্যাভোমিন জাতীয় ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়াই সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু আজ দুপুরে তিনি এত ঘুমিয়েছেন যে চট্ করে ঘুম আসবে না। ঘুমেরও একটা সীমা আছে, ইচ্ছামতো যখন তখন এত খুশি ঘুমনো যায় না। ঘুম আসে নিজের ইচ্ছেয়, ঘুম ভাঙেও ঘুমের ইচ্ছায়। তাই নির্মাল্য মিশ্র ঘুমোতে চাইলেই যে ঘুম আসবে, তার কোন স্থিরতা নেই।

নির্মাল্য মিশ্রর আবার জেগে থাকতেও ইচ্ছা করছে। সমুদ্রের উপরে হাল্কা বৃষ্টি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, ঝড়ের দৃশ্য এখনও দেখেননি। সে বোধহয় আরও সুন্দর, আরও আকর্ষণীয়। সুন্দরের এ রকম রুদ্ররূপ দেখার সুযোগ আসতে পারে জেনেও তিনি জেগে না থেকে ঘুমিয়ে পড়বেন! এ রকমের সুযোগ তো জীবনে দ্বিতীয়বার হয়তো আসবে না! শরীরের আরামের জন্য তিনি এই সুযোগ কি হেলায় হারাবেন! ঘুম তো রোজই ঘুমোন, কিন্তু সমুদ্রের ভয়ংকর রূপ দেখার সৌভাগ্য থেকে তিনি নিজেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করবেন! ছি ছি, এমন কাজ করলে সারা জীবন হয়তো তাঁকে অনুতাপ করতে হবে। নির্মাল্য মিশ্র তাঁর মনটাকে স্থির করলেন।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলেন ঠিকই, সময়মতো অ্যাভোমিনও খেয়ে নিলেন। কিন্তু কেবিনে ঢুকে শয্যা গ্রহণ করবার আগে সমস্ত ডেকটা ঘুরে দেখলেন। সব যাত্রীকে দেখলেন মনোযোগ দিয়ে। কেবিনের যাত্রীরা সবাই শুয়ে পড়েছেন, কেউ আর বাইরে বসে নেই। ফাঁকা হয়ে গিয়েছে চেয়ারগুলো।

এক জায়গায় নির্মাল্য মিশ্র কয়েকজন নিকোবরীকে দেখতে পেলেন। এরা লিট্‌ল আন্দামান থেকে জাহাজে উঠেছে, যাচ্ছে কার নিকোবরে। সন্ধ্যে-বেলায় যখন এরা জাহাজে উঠেছিল, নির্মাল্য মিশ্র তখন তাদের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এদের চেহারা ও বেশভূষা দেখে মনে হয়েছে এরা গ্রামের লোক। কেউ হাতে মুর্গি ঝুলিয়ে এসেছে। কারও পিঠে বাঁধা ছিল এক রকমের ঝুড়ি। উৎকট গন্ধে বোঝা যাচ্ছিল যে ঝুড়িতে শুঁটকি মাছ আছে। নির্মাল্য মিশ্র জানবার চেষ্টা করেছিলেন, এরা এই দ্বীপে থাকে, না কার নিকোবরে ফিরে যাচ্ছে। যদি এই দ্বীপের মানুষ হয় তো কার নিকোবরে এই সব জিনিষ কেন নিয়ে যাচ্ছে, আর কার নিকোবরের মানুষ হলে কেন এখানে এসেছিল। এই প্রশ্নের উত্তর পেলে তিনি আরও একটা প্রশ্ন করতেন, যে সব জিনিষ নিয়ে যাচ্ছে তা কি কার নিকোবরে পাওয়া যায় না, না কোন আত্মীয়ের কাছে যাচ্ছে বলে উপহার নিয়ে যাচ্ছে!

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্রর দুর্ভাগ্য যে কেউ তাঁর কথা বুঝতে পারল না। হিন্দী ও ইংরেজী ভাষা এ দিকে অচল বলে নির্মাল্য মিশ্র নিরস্ত হলেন। একজন শিক্ষিত যাত্রী তাঁকে নিরাশ হতে দেখে বললেন: হল্‌চুরা নিজেদের ভাষা ছাড়া আর কিছু জানে না।

হল্‌চু?

এরা যে হল্‌চু, তা জানেন না বুঝি?

হল্‌চু নামটা শুনেছি, কিন্তু এরাই যে হল্‌চু তা বুঝতে পারি নি।

নিকোবরী নাম শুনেছেন তো?

শুনেছি।

তাদের কেউ হল্‌চু বলে। হল্‌চু আর শম্পেন—এরাই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রধান অধিবাসী।

নির্মাল্য মিশ্র প্রশ্ন করে জানলেন যে ইনিও হল্‌চুদের ভাষা জানেন না। হল্‌চুদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও খুব সীমিত।

এক সময়ে নির্মাল্য মিশ্র কেবিনে এসে শুয়ে পড়লেন এবং বোধহয়

ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। জাহাজের দুলুনিতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। জাহাজ ভীষণ দুলছে। মনে হল, দুরন্ত সমুদ্র বুঝি খেলা করছে এই পুরনো জাহাজখানা নিয়ে। ঢেউ দিয়ে উপরে তুলে আছড়ে ফেলছে নিচে। ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাইছে ঝরঝরে জাহাজখানা।

নির্মাল্য মিশ্র শক্ত হাতে বিছানা আঁকড়ে রইলেন খানিকক্ষণ। ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলেন। কিছুটা ধাতস্থ হবার পরে বুঝতে পারলেন যে ঝড় উঠেছে সমুদ্রে, ঝড়ের দাপটেই জাহাজ এই রকম বাঁকছে। শুধু ঝড়, না সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে ঝড়ের দাপটে ?

কেবিনের কাচের জানালার দিকে তাঁর নজর পড়ল। অন্ধকারেও এই জানালাটা দেখা যাচ্ছে। এই জানালা দিয়ে বাইরের সমুদ্র দেখা যায়। নির্মাল্য মিশ্র কোন রকমে উঠে এই জানালার ধারে চলে গেলেন। তার পরেই বাইরের দৃশ্য দেখে ভয়ে ও আনন্দে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিছু দেখা যাচ্ছে না। বাতাসও না। কিন্তু ক্ষ্যাপার মতো মাতামাতি করছে অশান্ত সমুদ্র। কালো কালো ঢেউ পাগলা হাতির মতো ছুটে এসে জাহাজের ওপরেই যেন আছড়ে পড়ছে ! একদিক থেকে নয়, মনে হচ্ছে চারি দিক থেকে এই রকমের উঁচু ঢেউ জাহাজটাকে মোচার খোলার মতো ডুবিয়ে দেবার জন্যেই বুঝি ক্ষেপে উঠেছে। ঢেউ-এর ধাক্কাতেই জাহাজ উঠছে, আর নামছে। এগোতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না।

নির্মাল্য মিশ্রর মনে পড়ে গেল রবার্ট ব্রাউনিঙের সেই বিখ্যাত কবিতা **The Last Ride Together.** শেষ লাইনটি তাঁর মনে পড়ছে।

Who Knows but the world may end to night। কে জানে, আজই পৃথিবীর শেষ কিনা !

কিন্তু এই ভাবে পৃথিবীর শেষ হয় না। কোনও দিনই বোধহয় পৃথিবীর শেষ হয় না। প্রলয়-ট্রলয় কথাগুলো বুঝি মানুষকে ভয় দেখানোর জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। প্রলয় বলে যা মনে হয়, তার পরেও সূর্য ওঠে আকাশে। আলোর নিচের পৃথিবী ঝলমল করে হেসে ওঠে।

ঘুম থেকে জেগে উঠে নির্মাল্য মিশ্র মনে করতে পারলেন না, রাতের সেই প্রলয় নৃত্য কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল। কতক্ষণ তিনি জানালা দিয়ে সেই নৃত্য দেখেছিলেন, সে কথাও সহসা মনে করতে পারলেন না। পৃথিবীর শেষ হয়ে যাচ্ছে ভাবতে ভাবতেই তিনি বোধহয় আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তারপর এই জারোয়া জাহাজ টেন ডিগ্রী চ্যানেল অতিক্রম

করে চলে এসেছিল না সমুদ্র শান্ত হয়ে গিয়েছিল, তা তিনি জানতে পারেন নি। রাতে কতক্ষণ তিনি জেগে ছিলেন, তাও মনে করতে পারলেন না।

কেবিনের ভিতরে এখন আর অন্ধকার নেই। বেশ আলো হয়ে গেছে। নির্মাল্য মিশ্র বিছানা ছেড়ে উঠে শাড়ি জামা সামলে নিলেন। তারপর বাথরুমের দিকে পা বাড়ালেন।

ডেকে এসে নির্মাল্য মিশ্রর বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। সমুদ্রে জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, চলছে বলে মনে হল না। নির্মাল্য মিশ্র চারি দিকে ঘুরে দেখলেন—এক দিকে অকূল সমুদ্র, অন্য দিকে একটি দ্বীপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দ্বীপের নারকেল গাছগুলি যেন সমুদ্রের বেলাভূমি পর্যন্ত নেমে এসেছে। জাহাজ দুলছে এমন ভাবে যে এতক্ষণ তিনি বুঝতেই পারেননি যে তা এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে।

ডেকে যাত্রী বেশি নেই। যাঁরা আছেন তাঁদের মুখ অপ্রসন্ন, বিমর্ষ ভাবে তাঁরা দাঁড়িয়ে বা বসে আছেন। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। দক্ষিণ ভারতের সেই ভদ্রলোককে নির্মাল্য মিশ্র দেখতে পেলেন। তিনি স্নান করে বোধহয় পুজো পাঠ করছেন ডেকের এক ধারে। গুরবন্ত সিং সোহলকে তিনি দেখতে পেলেন না।

নির্মাল্য মিশ্রর মনে পড়ল যে গতকাল থেকেই মিস্টার সোহলকে তিনি স্বাভাবিক দেখছিলেন না। খুব চিন্তিত ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল তাঁকে। কোন অজানা আশংকায় অস্থিরতা বোধ করছিলেন বলে তাঁর মনে হয়েছিল। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র কোন প্রশ্ন করতে পারেননি। সংকোচ হয়েছিল তাঁর। এখন তাঁকে দেখতে না পেয়েও চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

জাহাজ কেন এগোচ্ছে না তা একজন যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু কোন সদুত্তর পেলেন না। একজন খালাসিকে দেখতে পেয়ে তার কাছেও তিনি জানতে চাইলেন। সে বলল : হাওয়া উল্টো দিকে বইছে।

তবে ?

সেই জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

হাওয়া সোজা দিকে না বইলে কি আমরা এগোব না ?

কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য খালাসি দাঁড়িয়ে ছিল না। সংক্ষেপে তার আগের প্রশ্নের জবাব দিয়েই সে নিজের কাজে চলে গিয়েছিল।

নির্মাল্য মিশ্রর মনে তখন আরও অনেক প্রশ্ন এসেছে। সামনের ঐ দ্বীপটাই কি কার নিকোবর ! কিন্তু কোন জাহাজ ঘাটা দেখতে পাচ্ছেন না

কেন! কার নিকোবরই তো এ অঞ্চলের প্রধান দ্বীপ। এখানে নিশ্চয়ই একটা জেটি থাকবে। জাহাজ এসে ভিড়বে সেই জেটিতে। নির্মাল্য মিশ্রর মনে হল যে এই দ্বীপ তাহলে কার নিকোবর নয়। কিংবা জেটিতে জাহাজ ভেড়াবার জন্য অন্য দিকে যেতে হবে।

কিন্তু এ সব কথা জেনে নেবার জন্য কোন যাত্রীকে তিনি পেলেন না। অনেকেই এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি। রাতে ভাল ঘুম হয়নি বলে এখনও বোধহয় তাঁরা ঘুমিয়ে আছেন। জাহাজ দুলছে জেনে অনেকে হয়তো জেগেও নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন।

এখন কী করবেন, নির্মাল্য মিশ্র সেই কথাই ভাবছিলেন। ঘড়িতে দেখলেন যে বেলা অনেক হয়েছে। গতকাল যাত্রীদের কথায় তাঁর মনে হয়েছিল যে ভোরবেলাতেই তাঁরা কার নিকোবরে পেঁছে যাবেন। কিন্তু এখন আর কারও মধ্যে পেঁছবার জন্য কোন ব্যস্ত ভাব দেখছেন না।

সহসা তাঁর গত রাত্রির হলচুদের কথা মনে পড়ে গেল। তারা তো নিকোবরেরই অধিবাসী! তাঁরা কী করছে দেখা দরকার। তাড়াতাড়ি তিনি হলচুদের খোঁজে এগিয়ে গেলেন। দেখতেও পেলেন তাদের। তারা এক জায়গায় জড়ো হয়ে দ্বীপের দিকে তাকিয়ে আছে।

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে দূরে তীরের কাছে খান কয়েক নৌকো দেখা যাচ্ছে। সরু লম্বা আকারের নৌকো। মানুষজনও দেখা যাচ্ছে। তারা বোধহয় অপেক্ষা করছে জাহাজের।

এই সময়ে নির্মাল্য মিশ্র গুরবন্ত সিং সোহলকে দেখতে পেলেন। ভদ্রলোক স্নান করে তাঁর ভিজে চুল দাড়ি এক ফালি লাল কাপড় দিয়ে বেঁধে এসেছেন। নির্মাল্য মিশ্রকে নমস্কার করে বললেনঃ আপনি উঠে পড়েছেন!

নির্মাল্য মিশ্র এ কথার উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলেন।

গুরবন্ত সিং সোহল বললেনঃ আমরা এখন এইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকব শুনছি।

কেন?

প্রতিকুল হাওয়ার জন্যে জাহাজ এগোতে পারছে না।

সেকি!

এর জন্যে এরাই দায়ী।

বলে হলচুদের দেখিয়ে বললেনঃ অনেকেই বলে যে আজও এরা

কার-নিকোবরে জেটি তৈরি করতে দেয় নি। মহা আপত্তি এদের।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: কিসের আপত্তি?

জানি নে। জাহাজকে বোধহয় আজও ভয় পায়।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন: ওদের দেখতে পাচ্ছেন? ডোঙা নিয়ে অপেক্ষা করছে ইসারার জন্যে!

ডোঙা!

ঐ নৌকোকেই ওরা ডোঙা বলে। জাহাজ এগিয়ে আসছে কিনা তাই দেখছে। এগোতে পারবে না। বুঝলেই ডোঙা নিয়ে ছুটে আসবে জাহাজের হলচুদের নামিয়ে নিতে। কিন্তু আপনাকে বা আমাকে

নেবে না।

কেন?

বাইরের লোককে এখনও ওরা ভাল চোখে দেখে না। ওরা এখনও চায় না যে বাইরের লোকজন ওদের দ্বীপে আসে।

হিংস্র নয় তো?

তা মোটেই না। শান্তিপ্রিয় জাত অতিথিবৎসল। কিন্তু নিজেদের নিয়েই থাকতে চায়।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: তাহলে কি আমরা এখন এই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকব?

মিস্টার সোহল বললেন: না থেকে উপায় কী! হাওয়ার বেগ দেখছেন তো! এই হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে জাহাজ এগোবে না। বোধহয় বম্বের আবহাওয়া অফিসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। ওরা ভরসা দিলে অপেক্ষা করবে। না দিলে এখান থেকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

সেকি!

এই নিয়ম। এই ভাবেই এখানে কাজ কর্ম চলে।

হঠাৎ একজন হলচুকে ছুটে আসতে দেখা গেল। সে এসেই গড়গড় করে কিছু বলল তার সঙ্গীদের। তারা হাত তুলে ইসারায় কিছু জানান তীরে অপেক্ষামান হলচুদের। দেখা গেল যে সঙ্গে সঙ্গে সেই হলচুরা তাদের ডোঙা সমুদ্রে ঠেলে দিয়ে জাহাজের দিকে আসতে লাগল।

সমুদ্রের জল ওঠানামা করছে। তোলপাড় করছে জাহাজের ধারে। কিন্তু হলচুরা নির্ভয়। সমুদ্রকে তারা ভয় পায় না। তাদের এই লম্বা লম্বা নৌকো গুলো এক একটা গাছ কেটে কুঁড়ে তৈরি করা হয়। গাছ

যত মোটা, নৌকো ততটাই প্রশস্ত। লম্বায় এত বেশি যে ভারি অদ্ভুত দেখতে। ডোঙাগুলো সমুদ্রে ওঠা-নামা করতে করতেই এক সময়ে জাহাজের কাছাকাছি এসে গেল। কিন্তু জাহাজের গায়ে এসে ভিড়তে পারল না।

নির্মাল্য মিশ্র ডেকের ধারে এগিয়ে গিয়ে জাহাজ থেকে যাত্রী অবতরণের এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। জাহাজের গায়ে বাঁধা কাছি ধরে ঝুলতে লাগল আরোহী যাত্রীরা, আর নিচে ডোঙা নিয়ে ঢেউ-এর সঙ্গে মাতামাতি করতে লাগল স্থানীয় হুলুচুরা। তারপর অদ্ভুত এক কায়দায় এক একজন করে যাত্রীকে ডোঙার উপরে নামিয়ে নিতে লাগল। দু পক্ষই এ কাজে সমান দক্ষ। সমুদ্রের জলে কেউই পড়ে গেল না।

দু চোখে প্রবল বিস্ময় নিয়ে নির্মাল্য গুরবক্ত সিং সোহলের মুখের দিকে তাকালেন। মিস্টার সোহল বললেনঃ আমরা ও রকমের দুঃসাহসের কাজ পারব না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ সমুদ্রের জলে কেউ পড়ে গেলে কী হবে?

কিছুই হবে না।

কিছু হবে না!

মিস্টার সোহল বললেনঃ এরা কেমন সাঁতার জানে, তেমনি নৌকো বাইতেও জানে। সমুদ্র এদের কাছে ডাঙার মতো। মাটিতে পা দিয়ে আমরা যেমন নির্ভয়ে থাকি, সমুদ্রের জলে এরাও তেমনি নির্ভয়।

হঠাৎ তাঁদের দুজনেরই দৃষ্টি পড়ল দক্ষিণ ভারতীয় সেই ভদ্রলোকের উপরে। তিনি নামতে চাইছেন। কিন্তু তাঁকে কেউ ডোঙায় নিতে রাজী নয়। নিচের ডোঙা থেকে অস্বীকার করছে সবাই। কেন করছে, তা বোঝা গেল না। ভদ্রলোক ইংরেজীতে বলছেন, পয়সা খরচ করে এসেছি, মাটিতে পা না দিয়েই ফিরে যাব!

এই সময়ে রেডিও অফিসারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি ঘোষণা করলেনঃ যাঁরা এই জাহাজে ফিরে যেতে চান, তাঁরা জাহাজ থেকে নামবেন না। আমরা আবহাওয়ার খবরের জন্য অপেক্ষা করছি। হাওয়ার গতির দিক পরিবর্তন হলে কার নিকোবরে ভিড়ব, তা না হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে। হাওয়ার বেগ আরও বাড়লে আমাদের এখান থেকেই ফিরতে হবে।

খুব স্পষ্ট ঘোষণা। দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক ভয় পেয়ে পিছিয়ে

এলেন। বললেন ঃ পয়সাটা জলে গেল।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন ঃ প্রাণটাও বেঁচে গেল।

কিন্তু স্থানীয় যাত্রীরা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে একে একে নেমে গেল হলচুদের ডোঙায়। সব ডোঙাগুলোই যাত্রীতে ভর্তি হয়ে কার-নিকোবরের দিকে যাত্রা করল সারিবদ্ধ ভাবে। সেও এক সুন্দর দৃশ্য।

॥ আঠারো ॥

অনেক বেলায় আবহাওয়া দপ্তরের খবর পৌঁছল জাহাজে। ভাল খবর যে নিশ্চয়ই নয়, তা বোঝা গেল খালাসিদের আচরণে। তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল। ব্যস্ততা দেখা গেল জাহাজের ছোট বড় সব কর্মীদের মধ্যে।

দক্ষিণ ভারতের সেই ভদ্রলোক খবর আনলেন, জাহাজ ছাড়ছে এখুনি। তবে কার-নিকোবরের দিকে যাবে না, এখান থেকেই পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরবে।

কেন ?

দুর্যোগের আভাষ পাওয়া গেছে। ঝড় উঠতে পারে আবার। টেন ডিগ্রী চ্যানেল আবার ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে পারে। তাই অনুকূল হাওয়ায় তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া সুবিবেচনার কাজ হবে।

বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে। নির্মাল্য মিশ্রকে বললেন ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন।

গুরবক্স সিং সোহল নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে তাকালেন।

নির্মাল্য মিশ্র কোন সদুত্তর না দিয়ে বললেন ঃ কী বলেছিলাম বলুন তো!

দক্ষিণ ভারতের ভদ্রলোক বললেন ঃ এখানে ধান্দার নানা অসুবিধা। মাটিতে যদি নামা না যায় তো জাহাজে বসে কী ধান্দা করব!

মিস্টার সোহল হাসলেন।

এই হাসি দেখে চটে উঠলেন দক্ষিণ ভারতের ভদ্রলোক। বললেন ঃ আপনি তো হাসবেনই। ধান্দার জন্যে দেশ ছেড়ে এইখানে এসে বাস করছেন! আপনার কী! একবারের বদলে বার বার এখানে আসবেন! দরকার হলে থেকেই যাবেন এখানে। আমাদের দেশ আছে, ঘর বাড়ি আছে, ফ্যামিলি আছে। আমাদের কি খামখেয়ালি হলে চলে ?

মিস্টার সোহল একটুও রাগ করলেন না। বললেন ঃ ঠিক বলেছেন।

আমাদের দেশ নেই, ঘরবাড়ি নেই, ফ্যামিলি নেই। তাই আমাদের খামখেয়ালি হলে বেশ চলে।

তারপর নির্মাল্য মিশ্রর দিকে ফিরে বললেন ঃ আসুন। কোথায় ?

দুপুরের আহারটা তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়া যাক। ঝড়ের মধ্যে পড়ে গেলে খেতে অসুবিধা হবে। আর খাবার পরেই ঝড় এলে কষ্ট হবে আরও বেশি। অল্প-স্বল্প খেয়ে নিলে নিশ্চিন্তে গল্প করা যাবে।

নির্মাল্য মিশ্র তাঁর সঙ্গে খেয়ে এসে গল্প করতে বসলেন। প্রথমেই বললেন ঃ আপনি তো অনেকবার এই দ্বীপে এসেছেন। আপনার নিশ্চয়ই এই দ্বীপের সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে।

মিস্টার সোহল বললেন ঃ মোটামুটি ধারণা আছে।

অন্য দ্বীপেও গেছেন বোধহয় ?

কাজের জন্যে যেতে হয়েছে।

নির্মাল্য মিশ্র উৎসাহিত হয়ে বললেন ঃ তাহলে আর আমার আপশোস নেই।

কিসের আপশোস ?

নামতে না পারার। একটুখানি ঘুরে বেড়িয়ে যা দেখতে পেতাম, তার চেয়ে বেশি জানতে পারব আপনার সঙ্গে কথা বলে।

অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে কি নিজের চোখে দেখার আনন্দ পারেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ নিজের চোখে তো অনেক কিছুই দেখলাম। বাকিটা শুনব আপনার কাছে। আর দেরি না করে বলতে আরম্ভ করুন।

মিস্টার সোহল বললেন ঃ আন্দামানের মতো এই দ্বীপপুঞ্জে বেশি দ্বীপ নেই। এর মধ্যে বারোটি দ্বীপে মানুষের বাস আছে, সাতটিতে জনমানব নেই। সবচেয়ে বেশি লোকের বাস এই কার নিকোবর দ্বীপে, জনসংখ্যা হাজার দশেক। সকলের দক্ষিণে গ্রেট নিকোবর দ্বীপ, কিন্তু সেখানে মাত্র শ দুই লোকের বাস। এই দুই দ্বীপের দূরত্ব প্রায় একশো ষাট মাইল। শুনে আশ্চর্য হবেন যে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে আমরা এখন দেড়শো মাইল দক্ষিণে দাঁড়িয়ে আছি। আর গ্রেট নিকোবরের পিগমেলিয়ান থেকে সুমাত্রা দ্বীপের অচিন হেড মাত্র একানব্বুই মাইল দূরে। এই দ্বীপটি ইন্দোনেশিয়ার এত কাছে বলে আজকাল সামরিক গুরুত্বের জন্যে উন্নতির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আপনি কি মনে করেন যে আন্দামানের উত্তরাংশ বার্মার আরাকানের সঙ্গে ও নিকোবরের দক্ষিণাংশ ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের সঙ্গে যুক্ত ছিল ?

মিস্টার সোহেল বললেন ঃ আমি কেন, ভূগোলে তো এই কথাই আছে। ধনুকের আকারে একটি পর্বতশ্রেণী দিয়ে বার্মা ও ইন্দোনেশিয়া যুক্ত ছিল। কোন প্রাকৃতিক কারণে নিম্নভূমি জলে ডুবে গেছে, যা জেগে আছে তারই নাম আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

এ কত দিন আগের কথা ?

মিস্টার সোহেল হেসে বললেন ঃ পণ্ডিতদের মতো মাত্র পনের কোটি বছর আগে এই দ্বীপগুলোর জন্ম হয়েছে। তবে কার নিকোবর নাকি একটি প্রধান দ্বীপ। মাটি কয়েক ফুট খুঁড়লেই প্রবাল পাথর পাওয়া যাবে।

এইবারে তাহলে কার নিকোবর দ্বীপের কথাই বলুন।

এই দ্বীপটি কত বড় জানেন ?

না।

এর আয়তন পঞ্চাশ বর্গ মাইলের মতো। উপকূল থেকে দু তিন মাইল পর্যন্ত শুধু নারকেল গাছের সারি, তার পর গ্রাম। সব শুদ্ধ পনেরটি গ্রাম এই দ্বীপটিকে ঘিরে আছে, আর এই সব গ্রাম সংযোগ করে আছে বত্রিশ মাইল দীর্ঘ একটি পথ। আমরা যে গ্রামের সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছি, তার নাম টিটপ। উত্তর উপকূলের এই গ্রামটি খুব ছোট। কিন্তু বেলাভূমি এখানে বাঁকা বলে সমুদ্র বেশ নিরাপদ। চারি দিকের সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও এখানে জাহাজ নোঙর করে মাল বোঝাই ও খালাস করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমাদের কপাল দেখুন ?

তাইতো দেখছি।

এখানে নামতে পারলে আপনার খুব ভাল লাগত। এখানকার বেলাভূমিটি সৌন্দর্যের জন্যেই বিখ্যাত। অনেকেই এখানে এসে সমুদ্রে স্নান ও পিকনিক করে। পি. ডবু. ডি.-র একটা রেস্ট হাউসও আছে।

নির্মাল্য মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই দ্বীপে একটিও পাকা জেটি নেই ?

আছে বৈকি। পূর্ব-উপকূলের মালাক্কা গ্রামেই আমি পাকা জেটি দেখেছি। মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত জাহাজ সেইখানেই নোঙর করা হয়। এক মাইল জায়গা জুড়ে দ্বীপের হেড কোয়ার্টার সেখানে—সরকারী দপ্তর ও সরকারী লোকের বাসস্থান। সরকারী কর্মচারীদের জন্যে একটি গেস্ট হাউসও আছে—সুন্দর দোতলা বাড়ি, সমুদ্রের দিকে মুখ। মালাক্কাকে এখন আর গ্রাম বলা চলে না, শহরই বলতে হয়। অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনারের দপ্তর, ট্রেজারি, থানা, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, হাসপাতাল,

সমবায় ক্যান্টিন, সমষ্টি কল্যানকেন্দ্র, আরও নানা ঘরবাড়ি আছে। অন্য ধারে একটি এয়ারপোর্ট ও ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্সের সেণ্টার। এই সব দেখে নিকোবরীরা এই গ্রামকে বলে ডিল্লী।

তার পরেই বললেন: কিছুদিন আগে এলে আপনাকে আমি এখানে একটি আশ্চর্য জিনিষ দেখাতে পারতাম। কী?

একটি ছোট গুহা। ভাবছেন, গুহা আবার দেখবার জিনিষ কী? ঠিক তা নয়। এয়ার পোর্টে যাবার পথের ধারেই এই গুহা। লম্বায় এক শো কুড়ি গজ। চুনা পাথরের গুহা। ভিতরে পাথর কেটে ঝুরি নেমেছে। লোকে বলে যে অতীতে বামনের আকার মানুষ এই গুহায় বাস করত। বাইরের লোকের অত্যাচারে তারা মাটির নিচে অদৃশ্য হয়েছে।

এ সব নিশ্চয়ই তৈরি গল্প।

কিন্তু তৈরি গল্প নয়, এমন কথাও আছে।

বলুন।

জাপানীরা যখন এই দ্বীপ অধিকার করে ও বিশপ রিচার্ডসনকে গ্রেপ্তার করতে চায়, তখন তিনি এই গুহার মধ্যেই আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারেন নি, ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর জাপানীরা এই গুহার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র রাখত।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: বিশপ রিচার্ডসনও তো এই দ্বীপেরই মানুষ।

মিস্টার সোহল বললেন: হ্যাঁ, এই দ্বীপেরই একটি গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল। আর ইংরেজের আমলে সেই গ্রামেই ছিল এই অঞ্চলের হেড কোয়ার্টার। ওখানকার প্রথম গির্জা আর স্কুল স্থাপিত হয় এই গ্রামেই। খেলার মাঠটিও ভাল বলে ইণ্টার ভিলেজ ফুটবল খেলা এখনও এইখানে হয়। এখানকার জেটিও বোধহয় তৈরি হয়ে গেছে।

গ্রামের নামটা কী?

মিস্টার সোহল হেসে বললেন: নামটা বলতে চাইছিলাম না।

কেন?

সঠিক উচ্চারণটা জানি না। মাস বলব না মুস বলব তা জানি না। ইংরেজী ইউ-এর উচ্চারণ তো দুরকমেই হয়। পড়া বিদ্যা আর শোনা কথায় তফাৎ এইখানেই।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: গ্রামের একজন মানুষ এত নাম করেছিলেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

মিস্টার সোহল বললেন : শুনেছি যে এর পেছনে বেদাপুন সলোমন নামে একজন ভারতীয় মিশনারীর অবদান আছে। গত শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি এখানকার এজেন্ট হয়ে এসেছিলেন। তিনিই এখানকার চার্চ ও স্কুল স্থাপন করেন। ছাত্রদের মধ্যে রিচার্ডসনও ছিলেন, তাঁকে সলোমনই বার্মায় পাঠিয়ে উচ্চ শিক্ষা দিয়ে এনে স্কুলের শিক্ষক করেছিলেন। সলোমন বুঝতে পেরেছিলেন যে স্থানীয় অধিবাসী চেষ্টা না করলে এই দ্বীপপুঞ্জে খ্রীষ্টধর্ম প্রসার লাভ করবে না। জাপানী আমলে রিচার্ডসন অনেক কষ্ট স্বীকার করেন এবং বিশপ হন ১৯৫০ সালে।

নির্মাল্য মিশ্রর কৌতূহল লক্ষ্য করে মিস্টার সোহল বললেন : তবে বড় লাপাটি নামে যে গ্রাম আছে, তা নিকোবরের আদি গ্রাম বলে স্বীকৃত। নিকোবরীরা নাকি সেখান থেকেই অন্যান্য দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই কিছু দিন আগে পর্যন্ত সেখান থেকেই তাদের সর্দার নির্বাচিত হত। গ্রামের সম্মান এখনও আছে। কোন ভি. আই. পি. এদিকে এলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয় এই গ্রামে। এখানেও একটি মাধ্যমিক স্কুল আছে, অনেক সরকারী দপ্তর আছে এবং নানা রকমের উন্নয়নমূলক কাজ হয় এই গ্রামে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : অন্য দ্বীপের কথা বললেন না ?

মিস্টার সোহল বললেন : আপনার কি ভাল লাগবে ?

লাগবে বৈকি !

বাকানা নামে একটি গ্রামের সমুদ্র বেলায় দাঁড়ালে একটি ছোট্ট দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায়। তার নাম বাত্তি মানব। কিন্তু সেই দ্বীপে কোন মানুষের বাস নেই।

কেন ?

তা বলতে পারব না। তবে কার নিকোবরের লোকেরা সেখানে যাতায়াত করে।

নির্মাল্য মিশ্র আবার প্রশ্ন করলেন : কেন ?

মিস্টার সোহল বললেন : এ কথার উত্তর দিতে হলে চাওড়া দ্বীপের কথা আগে বলতে হয়।

তা বলুন না।

চাওড়াও একটি খুব ছোট দ্বীপ। তার আয়তন তিন বর্গ মাইলেরও কম। কিন্তু এই দ্বীপে গ্রাম আছে পাঁচটি, লোক সংখ্যাও বারো শোর কম হবে না ! অথচ এই দ্বীপে জলের অভাব, নারকেল গাছ কম। কিন্তু

লোকেরা চালাক আর পরিশ্রমী। বুদ্ধির জোরে এরা বেশ ভাল আছে।

কেমন করে?

সমস্ত দ্বীপের আদিবাসীরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাদের কুসংস্কারকে মূলধন করেই এরা করে খাচ্ছে। মানে, এরা জাদু জানে বলে নানা রকমের গল্প চালু করে কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে আছে। চাওড়ার ওঝারা এখনও রাজত্ব করছে, পরিশ্রমী বলে এরা ভাল নৌকো তৈরি করে, আর মাটির ঘড়া। নৌকোর কাঠ আর ঘড়ার মাটিও আনতে হয় অন্য দ্বীপ থেকে। নিকোবরীরা বিশ্বাস করে যে চাওড়ায় তৈরি ডোঙা সমুদ্রে ডুববে না। তাই সেখান থেকেই ডোঙা কিনতে হবে। তা না হলে অন্যখানে তৈরি ডোঙা ভাসাতে হলে চাওড়ার পুরুত এনে তার আশীর্বাদ নিতে হবে। আর পুজো পার্বন। তাতে তো চাওড়ার তৈরি মাটির বাসন চাই-ই। তাই তা না হলে কোন খাবার জিনিষ রাধাই যাবে না। বুঝুন ব্যাপারটা।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: তার মানে চাওড়া হল নৌকো ও মাটির বাসনের বাজার, পুরুত আর ওঝারও আস্তানা সেখানে।

কাজেই সারা শীতকাল সমুদ্র যখন শান্ত থাকে, তখন সমস্ত দ্বীপের নিকোবরীরা ডোঙায় চেপে আসে চাওড়ায়। কার নিকোবর থেকে আশি মাইল দক্ষিণে। চাল কাপড় চোপড় ছুরি এমন কি শুয়োর পর্যন্ত আনে ডোঙা আর ঘড়া কিনতে। তা ছাড়া বছরে অন্তত একবার গুরুকে প্রণাম করবার জন্যে আসতেই হয়। তারপর ছেলেকে প্রথম বারে আনবার সময় ঘটা করে উৎসব করতে হয়। চাওড়ার লোকেরাও আবার অন্য দ্বীপে গিয়ে চাষ আবাদের কাজ করে রোজগার করে। কিন্তু দু মাসের বেশি কোথাও থাকে না। দিনের হিসেব কী ভাবে রাখে জানেন?

না।

একটা লাঠিতে দাগ কেটে। ষাটটি দাগ পড়বার পরে আর কেউ তাদের ধরে রাখতে পারবে না। জাহাজ না পেলে নৌকো করেই সমুদ্রে নেমে পড়বে। তাদের ধারনা যে এর বেশি দেরী হলে কেউ পরের ঘরে চলে যেতে পারে।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে উঠলেন।

তাই দেখে মিস্টার সোহল বললেন: আপনি হাসছেন! তারা কিন্তু সত্যি সত্যিই ভয় পায়।

তারপরেই বললেন: এই বারে বাস্তি মালবের কথা বলি। এই দ্বীপটি

কার নিকোবর ও চাওড়ার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়, কতকটা কার নিকোবরেরই কাছে। চাওড়া যাতায়াতের পথে সমুদ্র অশান্ত দেখলে এরা বাত্তি মালবে আশ্রয় নেয়। প্রচুর পায়রা আর পাখি আছে এই দ্বীপে, কিন্তু মানুষ নেই। কার নিকোবরের লোক বলে যে একটা ছোট পাখি কার নিকোবরের একটা অংশ রাতের অন্ধকারে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। ভোর হতে দেখেই ভয় পেয়ে যায় ধরা পড়বার। তাই ঠোঁট থেকে দ্বীপের সেই অংশটা সমুদ্রে ফেলে দেয়।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: বেশ সুন্দর গল্প তো!

এবারে মিস্টার সোহল হাসলেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: তারপর?

তারপর টেরেসা ও বমপুকা দ্বীপ পাশাপাশি। এরও দক্ষিণে নানকাটোরি কামোরটা ট্রিংকেট ও কাচাল দ্বীপ খুব কাছাকাছি, এদের সদর কামোরটার জেটির পাশে। কার নিকোবর থেকে এদের দূরত্ব প্রায় নব্বুই মাইল। নানকাটোরি দ্বীপে থাকেন এখানকার উপজাতিদের রানী লক্ষ্মী। কাচাল দ্বীপের রানী চাঙ্গা ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপদেষ্টা কমিটির সভ্য।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: দুই রানীতে ঝগড়া হয় না তো!

ঝগড়ার কথা শুনি নি।

রাজারা কী করেন?

রাজা আছেন কিনা তা জানি নে।

রানী আছেন। অথচ রাজা নেই—এতো হতে পারে না!

মিস্টার সোহল সহাস্যে বললেন: ইংলণ্ডের রানীর মতো হতে পারেন।

তার পরে কী আছে বলুন।

সকলের দক্ষিণে চারটি দ্বীপ—গ্রেট নিকোবর লিট্‌ল নিকোবর পুল্লো-মিল্লো আর কোন্দুল। এই কোন্দুলেও ভাল ডোঙা তৈরি হয়।

গুরবন্ত সিং সোহল থামতেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন: খুব সংক্ষেপে বললেন বলে মনে হচ্ছে।

মিস্টার সোহল বললেন: বেশি কিছু তো জানি নে!

একটু ভেবে দেখুন।

ওদিকটায় আমি কখনও যাই নি, তবে শুনেছি যে এই সব দ্বীপের মাঝখানে কোথাও একটা পোতাশ্রয় আছে। আর গ্রেট নিকোবর দ্বীপের আয়তন প্রায় চারশো বর্গ মাইল বলে এর উন্নতির চেষ্টা আরম্ভ হচ্ছে। আরও

একটি বৈশিষ্ট্য আছে এই দ্বীপের।

কী রকম?

নদী শুধু এই দ্বীপেই আছে। আর জনসংখ্যা খুব কম হলেও এই অঞ্চলের দুই জাতি—নিকোবরী ও শম্পেনরা—এখানে পাশাপাশি বাস করে। নদীতে কুমীর, আর বনে নানা রকমের জানোয়ার। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। আগে নাকি অনেক গ্রাম ছিল। এখন শুধু পশ্চিম উপকূলে শ দেড়েক নিকোবরী বাস করছে।

শম্পেনদের কথাও কিছু বলুন।

নিজের চোখে দেখি নি তো, শোনা কথা বলতে হয়।

তাই বলুন।

ওরা শুধু গ্রেট নিকোবরেই আছে। খুবই অনুন্নত জাতি। সংখ্যায় শ দেড়েক হবে বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু ক্রমেই কমে যাচ্ছে। নিকোবরীদের চেয়ে লম্বা, গায়ের রঙ কালো। পুরুষেরা নেংটি পরে, মেয়েরা পরে গাছের বাকল দিয়ে তৈরি ঘাগরা। নদীর মাছ আর বনের ফল মূল মধু খেয়েই জীবন ধারণ করে। শুয়োর পোষে, সামান্য চাষবাসও করে কেউ কেউ। মাটি থেকে উঁচুতে শক্ত কাঠের ওপরে ঘর তৈরি করে বাঁশ কাঠ আর শনের দড়ি দিয়ে। সে সব ঘর নিকোবরীদের মতো ভাল বা সুন্দর নয়।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: হিংস্র প্রকৃতির নয় তো!

মিস্টার সোহল বললেন: অনেকেই ওদের হিংস্র বলে, কিন্তু কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। আন্দামানের জারোয়ারা যেমন, এরা তেমন নয়। এরা নিজেরাই ভয়ে কাতর। বাইরে থেকে লোক আসতে দেখলে নাকি গ্রাম ছেড়ে বনে পালিয়ে যায়। একটু লাজুক স্বভাবের। কিছু পাবে জানলে তা নেবার জন্যে এগিয়ে আসে। উপকূলের নিকোবরীদের সঙ্গে অনেকের যোগাযোগ আছে। মধুর বদলে কাপড় ও তামাক নিতে আসে, লোহার টুকরোও সংগ্রহ করে। নিকোবরীরা এ সব পায় কোন্দুল দ্বীপে। সেখানে দোকান আছে ট্রেডিং কোম্পানীর। তবে এই দ্বীপের কোন দুর্গম জায়গায় নাকি কিছু হিংস্র প্রকৃতির শম্পেন আছে। তাদের জন্যেই কিছু নিরীহ শম্পেনের বদনাম হয়েছে।

নির্মাল্য মিশ্র হঠাৎ চমকে উঠলেন, বললেন: একি, আমাদের জাহাজ চলছে নাকি?

মিস্টার সোহল হেসে বললেন ঃ জাহাজ যে ছেড়েছে, আপনি তা বুঝতে পারেন নি এতক্ষণ !

খুব মনোযোগ দিয়ে আপনার গল্প শুনছিলাম কিনা !

অনুকূল বাতাসে জাহাজ বেশ জোরে চলছে বলে তাঁর মনে হল।

॥ উনিশ ॥

নির্মাল্য মিশ্র সমুদ্রের দিক থেকে আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখলেন। বেলা তখন অনেক হয়েছে, বাতাসের বেগও বেড়েছে। কিন্তু টেন ডিগ্রী চ্যানেল পেরোবার অনেক আগেই অন্ধকার নামবে বলে মনে হল। ঝড়ের সঙ্গে যদি এবারেও যুদ্ধ করতে না হয় তো রাত ভোর হবার আগেই তাঁরা পোর্ট-ব্লেয়ারে পোঁছে যাবেন। পোর্ট-ব্লেয়ারের নামেই তাঁর কেমন একটা ভয় ভয় ভাব এল। তাড়াতাড়ি তিনি বাস্তবে ফিরে এলেন। গুরুবন্ত্ সিং সোহল চুপ করে বসে আছেন দেখে বললেন ঃ নিকোবরীদের সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে ?

মিস্টার সোহল বললেন ঃ ঘনিষ্ঠ না হলেও যথেষ্ট পরিচয় আছে। তবে তাদের সম্বন্ধেও কিছু বলুননা।

কী বলব ?

শম্পেনদের কথায় বললেন, নিকোবরীরা ভাল ঘর তৈরি করে। সে সম্বন্ধেই কিছু বলুন।

মিস্টার সোহল বললেন ঃ জাহাজ থেকে নামতে পারলে সমস্ত ব্যাপারটা আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারতাম।

নির্মাল্য মিশ্র তৎপরভাবে বললেন ঃ আপনি ভাববেন না কিছু। কল্পনায় আমি সব দেখে নিতে পারব।

মিস্টার সোহল হেসে বললেন ঃ অনেক কথা এক সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিনা, তাই কোন কথা আলাদা করে বলা যায় না।

সে তো আরও ভাল কথা। আপনি সব কথাই এক সঙ্গে বলুন।

সমুদ্রে জাহাজের ডেকে বসে আপনি গ্রামের কিছুই দেখতে পেলেন না কেন ?

বোধহয় নারকেল গাছের জন্যে।

ঠিক বলেছেন। গ্রামগুলো নারকেল গাছের আড়ালে বলেই দেখতে পাওয়া যায় না। সমুদ্রের ঝড় জলে যাতে গ্রামের ঘর বাড়ির কোন ক্ষতি না

হয়, সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা। সমুদ্রের উপকূল থেকে দু তিন শ গজ পর্যন্ত এই নারকেল গাছের সারি এমন ঘন যে ঝড়ে গ্রামের কোন ক্ষতি হবে না। বেলাভূমিতে দেখবেন শুধু এল পালাম।

সে আবার কী?

এল পালাম হল একটি বড় বারোয়ারী বাড়ি। এর এক ধারে অতিথি ভবন, অন্য ধারে সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। ঋতু উৎসব, ভোজ, সমুদ্রে বাইচ খেলা—এই সব আছে তো! এরই জন্যে কয়েকটি কমিউনিটি হাউস দেখবেন সমুদ্রের ধারে। এই জায়গাটি যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনি নোংরা হল কিছু দূরে অবস্থিত আর দুটি কমিউনিটি হাউস।

সেখানে কী হয়?

এরা বলে জন্ম ও মৃত্যুর ঘর। তার পাশেই দেওয়ালে ঘেরা শ্মশান।

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন: জন্মের ঘরটাও বাইরে?

মিস্টার সোহল বললেন: নিকোবরীদের ধারণা যে দুটোই অশুচি। তাই জন্ম ও মৃত্যুর ঘর থাকবে গ্রামের বাইরে সমুদ্রের ধারে।

জন্ম ঘর মানে সূতিকা ঘর তো!

ঠিক তা নয়। জন্ম ঘরের পেছনে প্রায় এক শো গজ ভেতরের দিকে প্রত্যেক পরিবারের একটি করে কুড়ে ঘর আছে। এগুলিকেই বলে প্রসূতি ঘর। তার মানে গ্রামে কোন শিশুর জন্মের এক সপ্তাহ পর মা সেই শিশুকে নিয়ে এই ঘরে এক বছর বাস করতে আসবে। তার সঙ্গে অবশ্য পরিবারের একজন থাকবে তাদের দেখা শোনার জন্যে।

আশ্চর্য ব্যাপার!

গ্রাম আবার এক জায়গায় নয়, অনেকগুলো তাহেত নিয়ে গ্রাম।

সে আবার কী?

গ্রামের ঘরবাড়িগলো ছড়ানো ছেটানো তো! তাদেরই এক একটা অংশকে বলে তাহেত। আগে এ সব নাকি দূরে-দূরে ছিল, এখন কাছাকাছি হচ্ছে। মাঝখানে একটি মাঠ। সমুদ্রের তীর থেকে বালি এনে পিটিয়ে এই মাঠ শক্ত করা হয় খেলাধুলো নাচগান ও সামাজিক উৎসবের জন্যে।

এইবারে ঘর বাড়ির কথা বলুন।

দুরকম ঘর দেখেছি। কার নিকোবরে ঘরগুলো আমাদের দেশের কুড়ে ঘরের মতো চার কোনা ও চার চালের। কাঠের খুঁটির ওপরে মাটি থেকে খানিকটা উঁচুতে বাঁশ দিয়ে তৈরি, ওপরে খড়ের চাল।

আর এক রকম ?

একেবারে গোল ঘর। এও কাঠের খ‍ুঁটির ওপরে মাটি থেকে উঁচুতে। আমাদের দেশে খড় যে ভাবে রাখে, সেই ভাবেই ঘরের চাল তৈরি হয় গোল করে। উঁচুও অনেক, ঘরের দেওয়ালই ছাদ হয়েছে। কিন্তু এ রকম ঘর শ‍ুধ‍ু চাওড়া দ্বীপেই দেখেছি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : ভেতরটা কী রকম ?

না দেখলে আপনি বিশ্বাস করবেন না।

কেন ?

এত স‍ুন্দর। এমন কার‍ুকার্য করে এরা সীলিং তৈরি করে যে তাদের শিল্প নৈপ‍ুণ্যে দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। কিন্তু অন্য দ্বীপের লোক অত্যন্ত অলস বলে সে দ্বীপে এ রকম স‍ুন্দর কুড়ে আপনি একটিও দেখবেন না।

মিস্টার সোহল বলে যেতে লাগলেন : কার নিকোবরের গ্রামে গ্রামে যাতায়াতের জন্যে ঘন বনের ভেতর দিয়ে পথ তৈরি হয়েছে। অধিবাসীরা আজকাল সাইকেলে চেপে যাতায়াত করে। কিন্তু সম‍ুদ্র পথে ডোঙায় যাতায়াত তাদের কাছে এখনও সহজ মনে হয়। এতেই তারা বেশি অভ্যস্ত। নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এলেই তো সম‍ুদ্র, আর ডোঙায় চাপলেই আর এক গ্রামের ধারে। দরকার কী হাঁটবার বা সাইকেলে চাপবার !

কিন্তু সম‍ুদ্র ক্ষেপে গেলে ?

আপনার দ‍ুর্ভাগ্য যে ক্ষ্যাপা সম‍ুদ্রই আপনি দেখলেন, কিন্তু শান্ত সম‍ুদ্র দেখতে পেলেন না। সে র‍ুপের জবাব নেই।

মানে তুলনা নেই, এই তো ! একটু ব‍ুঝিয়ে বল‍ুন না !

মিষ্টার সোহল বললেন : আজ দেখতে পেলেন না, কিন্তু সম‍ুদ্র শান্ত থাকলে দেখতে পেতেন। কী ?

এখানকার জল এত স্বচ্ছ যে সম‍ুদ্রের তলায় ঝিন‍ুক প্রবাল ও শংখ আপনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন। তীরের কাছে সম‍ুদ্রের জল তো হাল্কা নীল রঙের। তলার প্রকৃতির সঙ্গে ওপরের জলেরও রঙ বদলায়। দ‍ুশো গজ পর্যন্ত সম‍ুদ্রের জলে নীল ও সব‍ুজের ছটা। তার ওপরে গাঢ় নীল রঙের ঢেউ ভেঙে সাদা ফেনা ছড়িয়ে পড়ে। সে এক স‍ুন্দর দ‍ৃশ্য।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : রাতে যখন চাঁদ ওঠে, তারায় ভরা আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে সেই জলে—

মিস্টার সোহল গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র কথাটা শেষ করতে দ্বিধা করলেন না, বললেন: তখন সমুদ্রের সেই রূপ দেখে পাগল হতে শুধু বাকি থাকে।

মিস্টার সোহল কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পর নির্মাল্য মিশ্র প্রশ্ন করলেন: নিকোবরীদের ভাষা আপনি জানেন?

মিস্টার সোহল বললেন: ভাষা জানি বলব না, কয়েকটা শব্দ জানি। আর কিছু বুঝতে পারি। ইচ্ছে করলে শিখতে পারা যায়।

কেমন করে?

আগে এদের কোন লিপি ছিল না তো, জর্জ হোয়াইট হেড নামে একজন এজেন্ট বিশপ রিচার্ডসনের সাহায্যে রোমান অক্ষরে নিকোবরী বর্ণমালা তৈরি করেছেন। শুনেছি যে এদের স্বরবর্ণই বেশি, ব্যঞ্জনবর্ণ খুব কম।

এদের কথার একটু উদাহরণ দিন না!

মিস্টার সোহল বললেন: কারও নাম জানতে হলে জিজ্ঞেস করবেন। আছিপ্‌ অপ মিনে এনি মে? তুমি কী চাও? বলবেন, আশু অপ লোন মে? কিংবা তুমি কী করছ? নিকোবরী ভাষায় হল, আশু অপ লেয়েন মে? কিছু গোলমেলে ব্যাপারও আছে।

কী রকম?

একই কথা এরা দুরকম ভাবে বলে। আপনি বললেন, তা ইহি, মানে এখানে এস। আর একজন বলল, আই আনা। তার মানেও এখানে এস। তার চেয়ে বিপদ হল কতগুলো শব্দ নিয়ে। চোন, মাক, পানাম—এই রকম সব শব্দ।

বিপদ কিসের?

মানে এক একটা শব্দের অনেক মানে। গাছ কাঠ লাঠি এমন কি ঘাস বোঝাতে একটা শব্দ চোন। তেমনি মাক মানে শুধু জল নয়, জলের স্রোত বা কুয়োকেও মাক বলে। তেমনি দেশ দ্বীপ গ্রাম মাটি—সবই এদের কাছে পানাম।

নির্মাল্য মিশ্র গম্ভীরভাবে বললেন: এল পানামের কথা আপনি আগেই বলেছেন। এরপর ব্যাকরণের কথা বাদ দিয়ে ইণ্টারেস্টিং কিছু বলুন।

মিস্টার সোহল ভাবলেন একটুখানি। তারপর বললেন: ইণ্টারেস্টিং কথা আর কী বলব! শুনেছি, এরা আগে কোন বন্ধুর বাড়িতে এলে

নিজেরাই খাবার জিনিষপত্র খুঁজে পেতে খেয়ে নিত। কোন অনুমতির অপেক্ষাও করত না। কিন্তু এখন ইংরেজী আদব-কায়দা বেশ শিখেছে। সকালবেলায় দেখা হলে বলে, তুলোক পুহু। দুপুরে বলে তুলোক আবাশ, সন্ধ্যায় তুলোক হারাপ। বিদায়ের সময় বলে তুলোক হোফুন। ধন্যবাদ দিতে বলে, রামা লোঁচি। কথাটার মানে কিন্তু ধন্যবাদ নয়, এর মানে আমি সুখী। কিন্তু নিজেদের মধ্যে এসব কথা ব্যবহারের চল এখনও হয়নি, বলে বাইরের লোককে।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন ঃ নিকোবরীদের হলচু বলে শুনেছেন। কিন্তু কথাটার মানে জানেন ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ না।

হলচু মানে আমার বন্ধু। কিন্তু শত্রু কথাটা হিন্দী দুষমন। এর মানে খুবই স্পষ্ট। আগে ওদের শত্রু ছিল না, সবাই ছিল বন্ধু। হিন্দীভাষীরা আসবার পরেই ওরা শত্রুতা শিখেছে, শব্দটাও নিয়েছে হিন্দী থেকে।

খুবই আশ্চর্যের কথা।

পুরুষদের পুরনো পোষাকের নাম কী জানেন ?

না।

বিসাত।

সে পোষাক কী রকম ?

মিস্টার সোহল হেসে বললেন ঃ এক টুকরো কাপড়। সামনের দিকটা কোনরকমে ঢেকে পিছনের দিকে লেজের মতো ঝুলিয়ে রাখত। পুরা-কালে চোল রাজাদের জাহাজ দক্ষিণ ভারতের উপকূল থেকে ইন্দোনেশিয়ার সুমাদ্র ও যবদ্বীপে যাবার সময় তারা দূর থেকে দেখত নিকোবরীদের। দ্বীপের মানুষকে উলঙ্গ ভাবত। আর পেছনের লেজ দেখে ভাবত হনুমানের জাত। তাই তারা এই দ্বীপের নাম দিয়েছিল নাক্কাভরম, মানে নগ্ন লোকের দেশ। আবার অনেকে ভাবত, বুঝি হনুমানেরই দেশ ছিল এটা।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ শুনেছি এই কথা।

বোধহয় ট্যুরিস্ট লিটারেচারে আছে। কিন্তু আন্দামানের নাম কখনও নাক্কাভরম ছিল না। নাক্কাভরম ছিল নিকোবরের নাম। নাক্কাভরম থেকেই কি নিকোবর হয় নি ?

ঠিক বলেছেন। সমুদ্রপথে আন্দামান তো দেখা যেত না, তারা নিকোবর দেখেই নানারকম কথা রটাত।

মিস্টার সোহল বললেন : তার মানে আন্দামানের সম্বন্ধে যত পুরনো কথা পাওয়া যায়, তার সবই লেখা হয়েছে নিকোবর দেখে। নিকোবরী ও শম্পেনদের কথাই এখন আন্দামানবাসীর কথা বলে চালানো হচ্ছে। তাই না?

নির্মাল্য মিশ্র এ কথার প্রতিবাদ করতে পারলেন না। বললেন : এখন তারা কী পোষাক পরে?

মিস্টার সোহল বললেন : ছেলেরা নানা রঙের বীচ শার্ট। আর মেয়েরা পরে বার্মিজদের মতো লুঙ্গি আর ব্লাউজ। আগে তারা ঘাসের স্কার্ট পরত।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আরও কিছু নতুন কথা বলুন।

অনেক কথাই তো বললাম।

কিন্তু থামলে চলবে কেন! এখনও আমাদের অনেক সময় কাটাতে হবে যে!

মিস্টার সোহল ভয় পাবার ভান করে বললেন : সারাটা পথ কি আমাকে একাই কথা বলতে হবে!

যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, তখন ক্যাপ্টিনে ডেকে নিয়ে যাব।

মিস্টার সোহলের বোধহয় এবারে বলার মত কিছু কথা মনে পড়ে গেল। বললেন : কার নিকোবর ছাড়া অন্য দ্বীপের ঘর-বাড়িতে আপনি নানা-রকমের মূর্তি দেখতে পাবেন। বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি দিয়ে এগুলো তৈরি হয়। লোকে ভাবে যে এই সব মূর্তি থাকলে ভূত-প্রেত আর ঘরে ঢোকেনা।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আমাদের দেশের ক্ষেত-খামারে বোধহয় এই রকমেরই মূর্তি থাকে। তাই না!

ঠিক সে রকম নয়। এ সব মূর্তি বেশ যত্ন করে তৈরি। বেশ কিছু শিল্প নৈপুণ্য আছে এ সবে।

তারপর বলুন।

মিস্টার সোহল বললেন : আমি এদের নানারকমের খেলা দেখেছি। পুরনো পোষাকে এরা লাঠি খেলে। লাঠি মানে ভাববেন না যে সাড়ে তিন হাত। এই লাঠি এক একটা গোটা বাঁশের মতো লম্বা। সেই বাঁশের খেলার নামই লাঠি খেলা। এরা শুয়োর পোষে ও লড়াই করে শুয়োরের সঙ্গে। কার নিকোবরের ছেলেরা ফুটবল ও মেয়েরা ভলি বল খেলছে। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে এদের নৌকো বাইচের খেলা। এদের নৌকো তো দেখেছেন! বিরাট লম্বা আকার এক একটা নৌকোর। বাইচ খেলতে এক এক নৌকোয় বসে চল্লিশ জন করে যুবক। কখনও দু'গ্রামের,

কখনও চার-পাঁচখানা গ্রামের নৌকো এসে এক জায়গায় জড়ো হয়। তারপর জোড়ায় জোড়ায় দৌড়ের প্রতিযোগিতা। ভারি সুন্দর এই নৌকো বাইচের দৃশ্য।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন.ঃ নিকোবরীদের বিয়ের সম্বন্ধে কিছু বলবেন না?

মিস্টার সোহল বললেন ঃ যারা খ্রীষ্টান হয়নি, তাদের বিয়ে এখনও পুরনো পদ্ধতিতেই হচ্ছে।

নির্মাল্য মিশ্র একটু নড়ে চড়ে গল্প শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

মিস্টার সোহল বললেন ঃ চওরা দ্বীপের মতো যে সব জায়গায় এখনও ভূত-প্রেত পুজো চলছে, সে সব জায়গার বিবাহ প্রথার কথা শুনেছি।

বলুন।

তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রেমের ব্যাপারটা শুরু হয় রাতে নাচের সময়। পরস্পরকে ভাল লাগলে নির্জনে দেখা সাক্ষাৎ আরম্ভ করে। দেখা শুনোর এই পালা চলে অনেক দিন ধরে তারপর মেয়ের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে সেই ছেলে। অনেকে বলে যৌন সংসর্গও চলে। এক মাস পরে মেয়ের বাপ মেয়েকে পাঠিয়ে দেয় ছেলের বাপের কাছে।

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন বিয়ে হয়ে গেল?

না।

তবে?

এর মানে হল বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলের বাপ পরিবারের কর্তাকে বলবে, সে বলবে গাঁয়ের মোড়লকে বৈঠকে বিয়ের দিন স্থির হবে। পরিবারের কর্তা তখন মেয়ের বাপের জন্যে নানারকম জিনিষপত্র দিতে বলবে সবাইকে।

কী রকম জিনিষ?

শুয়োর-মুর্গি কাপড় নারকেল গাছ মিষ্ট আলু রুপোর তার—এই সব। তারপর মেয়েকে ফেরৎ পাঠানো হয় মেয়ের বাড়িতে। আর সেই সব জিনিসপত্র নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় ছেলের বাড়ির লোকেরা যাবে মেয়ের বাড়ি। মেয়ের বাপ খুশী হলে মেয়েকে অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ছেলের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

নির্মাল্য মিশ্র আবার বললেন ঃ বিয়ে হয়ে গেল?

মিস্টার সোহল সহাস্যে বললেন ঃ না।

এখনও হল না?

সবটা শুনুন। ছেলের বাড়িতে বর-কনের চুল কেটে সাদা কাপড় পরানো হবে। ওঝা এসে ঘরের কোণে দুজনকে নিয়ে যাবে একটা পর্দার আড়ালে। তারা আগুনে ঝলসানো শুয়োরের মাংস খাবে। তারপর সমুদ্রে স্নান।

বিয়ে ?

ফিরে আসার পরে বিয়ের কাজ আরম্ভ। নিমন্ত্রিতরা নবদম্পতিকে নানা-রকম উপহার দেবে। ভোজ হবে। ছেলের বাপ এক ঝুড়ি খাবার তৈরি রাখে। তাই নিয়ে বর-কনে কোন গোপন স্থানে লুকোতে যায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লে। সেখানে বর তার কনেকে তিনটি উপদেশ দেয়—অবিবাহিত মেয়ের মতো আচরণ আর করবে না, পান খেয়ে দাঁত কালো রাখবে, আর আগের মতো নাচবে না। কারণ তাদের চুল কাটা হয়ে গেছে। এর মানে এখন থেকে তাদের বয়স্ক লোকের মতো আচরণ করতে হবে। দিন সাতেক অজ্ঞাতবাসের পর তারা ঘরে ফিরে আসবে।

তারপর বিয়ে ?

বিয়ের আর বাকি রইল কী ?

তা ঠিক।

জাহাজ চলছে। অন্ধকার নামছে একটু একটু করে। তাঁরা চা খেয়ে এলেন, সন্ধ্যার আহারও সেরে নেবেন তাড়াতাড়ি। জাহাজ এখন বাতাসের অনুকূলে চলেছে দ্রুত গতিতে। এইভাবে চললে রাতেই জাহাজ পোর্ট-ব্লেয়ারে পেঁছে যাবে। তাঁদের জাহাজ থেকে নামতে হবে ভোরবেলায়।

একসময় নির্মাল্য মিশ্রের ভয় করতে লাগল। বাদলদের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল, মনে পড়ে গেল ডাক্তার মৈত্রর কথা। মিস্টার সোহলের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলেন শুনলে তিনি ক্ষেপে উঠবেন। কুৎসা রটাবেন তারাপদর দিদি। নির্মাল্য মিশ্র অস্থির বোধ করতে লাগলেন। একসময়ে উঠে গিয়ে সামান্য কিছু খেয়ে কেবিনে ঢুকে পড়লেন। এই অস্থিরতা থেকে রক্ষা পেতে হলে তাঁকে এখন ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

জাহাজ দুলছে, আর চলছে।

॥ কুড়ি ॥

নির্মাল্য মিশ্র একরকম অদ্ভুত অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কখন টেন ডিগ্রী চ্যানেল পেরোলেন এবং কখন এসে পোর্ট-ব্লেয়ারে নোঙর করলেন

—কিছুই জানতে পারেন নি। ভোরবেলায় গুরবন্ত্ সিং সোহল তাঁর কেবিনের দরজায় করাঘাত করে তাঁকে জাগালেন। বললেন : তৈরি হয়ে নিন, জাহাজ থেকে আমাদের নামতে হবে।

নির্মাল্য মিশ্র তৈরি হয়ে নিতে একটুও দেরি করলেন না।

জাহাজ থেকে নামবার সময় মিস্টার সোহল বললেন : কাল সন্ধ্যে-বেলায় আপনার একখানা ভজন শোনবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু আপনি অসুস্থ বোধ করছেন বলে কোন অনুরোধ করিনি।

নির্মাল্য মিশ্র কোন উত্তর দিলেন না।

মিস্টার সোহল আবার বললেন : আজ সন্ধ্যেবেলায় আপনাকে আমরা খুব আশা করব। আজ আর নিরাশ করবেন না।

মিস্টার সোহলের গাড়ি এসেছিল জাহাজঘাটায়। নির্মাল্য মিশ্রকে তিনি ট্যুরিস্ট রেস্টহাউসের বাইরে নামিয়ে দিয়ে নিজের ডেরায় চলে গেলেন।

নির্মাল্য মিশ্রর সমস্ত দেহ এইবারে আড়ষ্ট বোধ হতে লাগল, পা দুখানা মনে হলো পাথরের মতো ভারি। মিস্টার সোহল এবারে আর তাঁর গাড়ি থেকে নামেন নি। তাই নির্মাল্য মিশ্র তাঁর জিনিসপত্র নিজেই বয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর ঘরের দরজায় একটা তালা ঝুলতে দেখে একটু অসুবিধা বোধ করেছিলেন। পরক্ষণেই একটু আড়ালে গিয়ে তাঁর জিনিস-পত্র রেখে এসে হাঁক দিলেন : বাদল! বাদল কোথায় গেলে?

তাঁর ডাক শুনে শুধু বাদল নয়, দলের সবাই এল বেরিয়ে। চোখের সামনে নির্মাল্য মিশ্রকে দেখে বাদল চিৎকার করে উঠল : কী হয়েছিল নির্মাল্যদি?

নির্মাল্য ঠোঁটে আঙুল চেপে বললেন : চুপ, এখন একটি কথাও নয়।

বিন্দু তাঁর কাছে ঘেঁষে এসে বলল : কেন নির্মাল্যদি?

নির্মাল্য মিশ্র তাঁকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বললেন : পরে সবই জানতে পারবে।

তারপরেই তারাপদর দিদির দিকে চেয়ে বললেন : কিছু খাওয়াতে পারেন দিদি? ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

কিছু খাননি এ কদিন?

বলে তিনি ভানুর দিকে তাকাতেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সদানন্দবাবু গম্ভীরমুখে বললেন : খুব বড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল মনে হচ্ছে।

নির্মাল্য মিশ্রও বুঝতে পারলেন যে এঁরা কোন কিছু বিশ্বাস করে বসে আছেন। তাই গম্ভীর ভাবে বললেন : দেখুন কেটেছে কিনা।

ততক্ষণে বাদল নির্মাল্য মিশ্রর ঘর খুলে দিয়ে বলল : আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন নির্মাল্যদি। ঘরেই আপনাকে খাবার দেওয়া হবে।

তারাপদর দিদি বললেন : বিস্কুট দিয়ে চা খেয়ে শুয়ে পড়ুন, তারপর খাবারের ব্যবস্থা করছি।

বাদল বলল : সর্দারজীদের আমি একটা খবর দিয়ে আসি।

বলে তাদের ডর্মিটারিতে ঢুকে পড়ল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : কোন্ সর্দারজী ?

সেকি, এরই মধ্যে তাঁকে ভুলে গেলেন।

সদানন্দবাবু বললেন : ভদ্রলোক আপনার জন্যে যা করেছেন। কাল তো কারও কথা না শুনে জারোয়াদের দ্বীপে চলে গেছেন পুলিশের সঙ্গে।

নির্মাল্য মিশ্র আঁৎকে উঠে বললেন : ফিরেছেন তো।

বাদল একটা জামা গায়ে দিয়ে এসেছিল, বলল : ডাক্তারবাবুকেও খবরটা দিতে হবে।

বলেই বিকাশকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

নির্মাল্য মিশ্র নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন। যখন বুঝলেন যে বাইরে আর কেউ নেই, তখন একবার নিঃশব্দে বেরিয়ে নিজের জিনিষপত্র নিয়ে এলেন ঘরের ভিতরে। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে সর্দারজীরা বেশ একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প এখানে চালু করে দিয়েছিলেন এবং সেটা না জানা পর্যন্ত তাঁর কোন কথা বলাই উচিত হবে না। তিনি স্নান সেরে ঘরের দরজা খুলে দিলেন।

এই সময়ে রেস্টহাউসের বারান্দায় এক সর্দারজী এসে হাঁক ডাক শুরু করে দিলেন : বাদলবাবু কোথায় গেলেন ?

সদানন্দবাবু বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন : কী ব্যাপার সর্দারজী ?

সর্দারজী বললেন : গুরবন্ত্ ভাইয়া রাতে ফেরেন নি। পুলিশের খবর, তারা জারোয়াদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে ! তাদের একজনও আর পালাতে পারবে না।

সদানন্দবাবু তার দুহাত জড়িয়ে ধরে বললেন : সবাইকে ফিরে আসতে খবর পাঠান সর্দারজী !

কেন ?

নির্মাল্যদি ফিরে এসেছে।

হ্যাঁ! পালিয়ে এসেছেন? না, জারোয়ারা এসে রেখে গেছে?

তা জানি নে তো! এখন বিশ্রাম করছেন। পরে সব কথা জেনে নেব।

তাই করবেন।

বলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে সর্দারজী বললেন: আজ সন্ধ্যেবেলায় তাহলে আমাদের ডেরায় একটা পার্টি হয়ে যাক। ও'র অভিজ্ঞতার কথা আমরা ও'র মুখেই শুনব।

সদানন্দবাবু বললেন: সেই ভাল!

সর্দারজী বললেন: ডাক্তারবাবুকে আবার সামলাতে হবে।

কেন?

কাল খুব বিপদে ফেলেছিলেন।

কি রকম?

পুলিশের সঙ্গে তিনিও জারোয়াদের গ্রামে যাবার জন্যে জেদ ধরেছিলেন। তিনি যাবেনই। একেবারে নাছোড়বান্দা। অনেক কষ্টে তাঁকে থামানো গেছে। এখন বোধহয় সমুদ্রের ধারে গিয়ে গুম হয়ে বসে আছেন।

বলে সর্দারজী তাঁর মোটর বাইকে চড়ে ফিরে গেলেন।

ঠিক এই সময়েই ডাক্তার মৈত্রর গলা শুনতে পাওয়া গেল। তিনি চিৎকার করে বললেন: কোথায় গেলেন তিনি?

নির্মাল্য মিশ্র ভয় পেয়ে গেলেন এই কথা শুনে। তাঁর মনে হল যে ডাক্তার মৈত্র সব কথা বলবার জন্যে এখুনি তাঁকে বাধ্য করবেন। বিপদ হবে বেফাঁস কোন কথা বলে ফেললে। তাই তিনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বুজলেন।

সদানন্দবাবু বাইরেই ছিলেন। তিনি বললেন: বিশ্রাম করছেন।

বিশ্রাম! কী হয়েছিল তাঁর?

এখনও আমরা জানতে চাইনি।

কেন? আসুন, আমার সঙ্গে।

বলে গটমট করে নির্মাল্য মিশ্রর ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন।

নির্মাল্য মিশ্র চোখ বুজে আছেন দেখে বললেন: ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি।

বোধহয় তাই।

ডাক্তারবাবু গম্ভীরভাবে বললেন: উঁহু, বোধহয় শক পেয়েছেন। একটু বিশ্রাম নিতে দিন।

বলেই বেরিয়ে এলেন।

এই সময়ে বাদলরা ফিরে এল। বলল : ভাল খবর আছে ডাক্তারবাবু, জারোয়া সর্দার পুলিশের কাছে সারেণ্ডার করে বলেছে যে তারা নির্মাল্যদিকে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

ডাক্তার মৈত্র ধমক দেবার মতো করে বললেন। সে তো নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছি।

বাদল বলল : গুরবন্ত্ সিংজীও ফিরে আসছেন।

হুঁ।

বলে ডাক্তার মৈত্র একটা চুরট ধরালেন।

বাদল ভয়ে ভয়ে বলল : সর্দারজীরা আজ সন্ধ্যেবেলায় একটা পার্টি দিচ্ছেন।

কেন ?

নির্মাল্যদির মুখে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চান সকলে।

হুঁ।

গুরবন্ত্ সিংজীকে আমরা যা ভেবেছিলাম, তা নয় দেখছি। মানুষটা সত্যিই ভাল।

ডাক্তার মৈত্র এবারেও বললেন : হুঁ।

বিন্দুর সঙ্গে তারাপদর দিদি নির্মাল্য মিশ্রর ঘরে ঢুকে খানিকটা গরম দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র কিছুতেই তা খেতে চাইলেন না। বললেন : দুধ খাব কি, আমি ছেলেমানুষ নাকি !

এর পরে চা দেব।

চা-টা আগেই দিন না, বরং এক কাপের বদলে দু চার কাপ। ভাল চা খাইনি কতদিন।

আহা বেচারা !

বলে তারাপদর দিদি চা তৈরি করে আনলেন।

বাদল বলল : আজ আমরা কী করব ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার মৈত্র বললেন : রোগীকে পরীক্ষা না করে কিছু বলতে পারি না।

সদানন্দবাবু বললেন : ঠিক কথা। উনি সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে আমরা কোথাও বেরোব না।

তাঁরা জোরে জোরেই কথা বলছিলেন। বিন্দু এসে বলল : নির্মাল্যদি

এখন বসে বসে চা খাচ্ছেন বাবা। বলছেন, ব্রেকফাস্টের পরে সেল্‌লার জেল দেখতে যাবেন।

অ্যাঁ!

বলে ডাক্তার মৈত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

বিন্দু ভয়ে ভয়ে বলল: নির্মাল্যদি বললেন, তিনি তো এই জেল দেখবার জন্যেই এসেছিলেন। আর তাঁরই আপত্তির জন্যে প্রথম দিন এই জেল দেখা হয়নি!

ডাক্তার মৈত্র বললেন: তাতে ক্ষতি হয়েছে কার? আমাদের কারও কোন ক্ষতি হয়নি।

সদানন্দবাবু বললেন: আমরাও তো তাঁরই জন্যে এই জেলখানা আজও দেখিনি!

তাই বলে আজই দেখতে হবে! কিছুতেই না। আমরা তো জেল দেখতে এখানে আসিনি: এসেছি সমুদ্র দেখতে। আজ আমরা সমুদ্র দেখব।

বিন্দু ফিরে গিয়ে নির্মাল্য মিশ্রর উত্তরটা নিয়ে এল। বিন্দু বলল: নির্মাল্যদি বলছেন, আজ তিনি জেল দেখতেই যাবেন। যাঁরা সমুদ্র দেখতে চান, তাঁরা সমুদ্র দেখতে যাবেন।

অ্যাঁ।

বলে ডাক্তার মৈত্র আবার বসে পড়লেন।

তারাপদর দিদি বললেন: তোমরা অমন করছ কেন বলতো! ওঁরা দুজনেই এক দিকে যাবেন। সবাইকে তৈরি হয়ে নিতে বল। আমি খাবার ব্যবস্থা দেখছি।

ডাক্তার মৈত্র বললেন: না না, এখানে আর খাবার ঝামেলা করবেন না। আজ আমরা বাইরেই কোথাও খেয়ে নেব।

তারাপদর দিদি দেখতে পেলেন যে ডাক্তার মৈত্রর চোখে এখন অপরিসীম প্রসন্নতা। এই আশ্চর্য মানুষটিকে চিনতে সত্যিই সময় লাগে। নির্মাল্য মিশ্র বোধহয় চিনতে পেরেছেন এঁকে। বললেন: তাহলে আপনিও এখানে তৈরি হয়ে নিন।

আমার জন্যে আপনারা ভাববেন না।

বলে চুরুট টানতে লাগলেন।

॥ একুশ ॥

একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে ডাক্তার মৈত্র সবাইকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ালেন। লাঞ্চেরও অর্ডার দিয়ে বললেন : আজ সমস্ত খরচ আমার।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র ফোঁস করে বললেন : ওঁর খরচে আমরা খাব কেন ?

বাদল তৎপরভাবে বলে উঠল : রেখে দিন নির্মাল্যদি, ডাক্তারবাবুর কথাবার্তাই ঐ রকম।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : রেখে আর কত দেওয়া যায় বল। এক এক করে সবই তো রেখে দিচ্ছি।

তারপর বিন্দুকে বললেন : তোমরা এসব দেখলে না কেন ?

বিন্দু বলল : ডাক্তারবাবু দেখতে দিলেন না।

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন : তোমরা ঘরে বসেই দুটো দিন কাটিয়ে দিলে !

আমাদের যা দুর্ভাবনা হয়েছিল ! কোথা দিয়ে কেমন করে যে দিন দুটো কেটে গেল, তা টেরই পেলাম না।

—কোথাও যাওনি তোমরা ?

—ছোট সর্দারজী আমাদের রস আইল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়েছিল।

বাসে বসে নির্মাল্য মিশ্র রস আইল্যাণ্ডের গল্প শুনলেন বিন্দুর কাছে। পোর্ট-ব্লেয়ার থেকে মাইল দেড়েক দূরে এই রস আইল্যাণ্ড একসময়ে বিখ্যাত ছিল। খুবই ছোট দ্বীপ, আয়তন বোধহয় শ দুই একর হবে। এখন লোকে এখানে পিকনিক করতে যায়। কিন্তু অনেকেই এর ইতিহাস জানে না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : কী ভাবে গেলে তোমরা ?

বিন্দু বলল : কেন, মোটর লঞ্চে করে প্রথমে ভাইপার দ্বীপে পৌঁছে গেলাম। সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে সরু পথ যেন পাহাড়ে উঠেছে। যে জায়গাটা সবচেয়ে উঁচু, সেখানে একটা মন্দিরের মতো আছে।

তারপরেই বিষন্ন মুখে প্রশ্ন করল : সেটা কী জানেন নির্মাল্যদি ?

না।

ইংরেজের আমলে ফাঁসির মঞ্চ ছিল। মেয়েদের ফাঁসি দেওয়া হত ঐখেনে।

নির্মাল্য মিশ্র স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

কিন্তু বিন্দু বলল : শুনলাম যে সেলুলার জেল তৈরি হবার আগে কয়েদীদের অত্যাচার করবার জন্যে হাত-পা বেধে ঐ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হত। তারপর কী করা হত জানি নে।

নির্মাল্য মিশ্র কঠিন স্বরে বললেন : কেউ মরে যেত অত্যাচারে, কেউ সেই অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে আত্মহত্যা করত সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে।

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পর বিন্দু বলল : ইংরেজরা নাকি আগে রস আইল্যাণ্ডে থাকত। দুটো ভাগ ছিল এই দ্বীপের। পাঁচিলের উত্তরে ইংরেজদের দপ্তর আর ঘরবাড়ি ছিল, দক্ষিণে বন্দীদের ব্যারাক। সেপ্টিদের ব্যারাক ছিল ভাইপার দ্বীপে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : কী দেখে এলে সেখানে ?

বিন্দু বলল : ইংরেজদের বিলাসের জন্যে সব কিছুই ছিল—বাংলো বাড়ি, বার, সুইমিং পুল, ক্লাব, নাচঘর, চার্চ, শপিং সেণ্টার, প্রেস—কিছু বাদ ছিল না। সিঙ্গাপুর থেকে ইঁট আসত, কাঁচ কোথা থেকে আসত জানি নে। জেনারেটরে বিদ্যুৎ সরবরাহ হত। তিন চারটে বয়লার এখনও পড়ে আছে। মাটির নিচে নাকি সুড়ঙ্গ আছে—শুধু রস আইল্যাণ্ডের এক ধার থেকে আর এক ধারে যাবার জন্যে নয়, পোর্ট-ব্লেয়ারেও নাকি যাওয়া যেত।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : এখনও সব অক্ষত আছে ?

না নির্মাল্যদি, অনেক কিছুই ভেঙ্গে পড়েছে। এখন একটা ভুতুড়ে জায়গার মতো। সাহেবদের কবর আছে অনেক। কিন্তু বন্দীদের কিছু নেই। শুধু একটা কথা শুনে ভাল লাগল।

কী কথা ?

জাপানী আমলে এই দ্বীপটাতো জাপানীদের অধীনে ছিল। নেতাজী এসে এইখানেই ছিলেন। পোর্ট-ব্লেয়ারে তিনি তো জাতীয় পতাকা উড়িয়েছিলেন, বক্তৃতা দিয়েছিলেন অ্যাবার্ডিন জেটির মেরিন পার্কে।

নির্মাল্য মিশ্র প্রশ্ন করলেন : তার কী দেখলে ?

এনথ্রপলজিকাল মিউজিয়ম ও মেরিন মিউজিয়ম। একটায় আদিবাসীদের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষপত্রের অদ্ভূত সংগ্রহ, আর একটায় সমুদ্রের সব আশ্চর্য নিদর্শন। রবার ক্র্যাব নাকি নারকেল গাছেও উঠতে পারে। চিড়িয়াখানায় কত পশুপাখি ! পাখিদেরও একটা দ্বীপ আছে তার নাম

চিড়িয়া টাপু। এইবারে বোধহয় সেখানে যাওয়া হবে। আপনি চাইলে করবেন্‌স্‌ কোভ বীচ বা প্রবাল দেখতে ওয়াণ্ডুর বীচে যাওয়া হতে পারে।

সেলুলার জেলে তাঁরা পেঁছে গিয়েছিলেন। বাস থেকে নেমেই বাদল বলে উঠল ঃ যাক, শেষ পর্যন্ত এখানে এসে পেঁছন গেল!

ডাক্তার মৈত্রর এখন বেশ খুশি-খুশি ভাব। বললেন ঃ এই জেলের জন্যেই তো আন্দামান। আন্দামানে এসে এই জেলই প্রথমে দেখা উচিত।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ জাহাজ থেকেই তো দেখতে পাওয়া গিয়েছিল!

সে তো বাইরেটা! ভেতরে ঢুকে না দেখলে কি দেখা হয়!

নির্মাল্য মিশ্র এ কথার উত্তর দিলেন না। তাঁর মনে হল যে কথাটা সত্যি। বাইরে থেকে ভিতরের কিছুই বোঝা যায় না। মানুষকেও চেনা যায় না তার বাইরেটা দেখে। মানুষ চিনতে হলেও তার ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করতে হয়। তা না হলে বিচার কখনই ঠিক হবে না।

বিন্দু বলল ঃ এই জেলের সম্বন্ধে কিছু বলুন না নির্মাল্যদি!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ সে তো ইতিহাসের কথা হবে। ইতিহাসের কথা কি সবার ভাল লাগবে।

এ কথার উত্তর দিলেন ডাক্তার মৈত্র। তিনি বললেন ঃ সত্যি কথা সবারই ভাল লাগা উচিত।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ এই জেলের কথা বলতে হলে সিপাহী বিদ্রোহের কথা সবার আগে বলতে হয়।

কেন?

ইংরেজ সেই সময়েই বুঝেছিল যে ভারতবাসীকে তাদের শাসনে রাখতে হলে বিদ্রোহী নেতাদের নির্বাসনে পাঠাতে হবে। ভারতবর্ষের জেলে তাদের বন্ধ করে রাখাও নিরাপদ নয়। কিন্তু নির্বাসনে পাঠাবার উপযুক্ত জায়গা কোথায়? অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক হল যে আন্দামানের পোর্ট-ব্লেয়ারে তৈরি হবে জেলখানা। বিদ্রোহের মতো গুরুতর অপরাধে যাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে, তারাই আসবে এখানে। সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৫৭ সালে, আর এই প্রস্তাব পাশ হল ১৮৫৮ সালের পনরই জানুয়ারী।

ডাক্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ তারিখটিও আপনি মনে রেখেছেন!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ইতিহাসে এ তারিখ তো পাইনি! বাদল যে বইখানা আমাকে দিয়েছিল, তাতে দেখেছি।

ভিতরে ঢুকে দেখা গেল যে সেদিনের সেই ভয়ংকর জেলখানা এখন আর নেই। সেলুলার জেলের অনেকটা জায়গা জুড়ে হাসপাতাল হয়েছে, বাকি জায়গায় আন্দামানের জেলখানা। কালাপানির নামে এখন আর কেউ আঁৎকে উঠবে না।

বিন্দু বলল ঃ পুরনো দিনের কথা কিছু বলুন না নির্মাল্যদি!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ সে সব কথা কি কেউ লিখে রেখেছে! না মনে রেখেছে কেউ!

বিন্দু বেশ হতাশ হল। তাই দেখে নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার তিনজন বন্দীর নাম পেয়েছি। আল্লামা ফজলি হক এইখানে মারা গেছেন। মৌলানা লিয়াকৎ আলি বিদ্রোহের একজন নেতা ছিলেন, তিনিও মারা গেছেন এই দ্বীপে। আর মীর জাফর আলি থানেশ্বরী বিশ বছর জেল খাটবার পরে ফিরে গিয়েছিলেন।

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় বঙালী আসেনি একজনও?

তা আমার জানা নেই। তবে ১৯১০ সাল থেকে দলে দলে বন্দীরা এসেছে। তাদের মধ্যে বাঙালী নিশ্চয়ই ছিল। আর এ কথা মনে করবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণও আছে।

কী কারণ?

বলে ডাক্তার মৈত্র তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আলিপুর বোমার মামলার কথা আপনার মনে আছে?

প্রশ্ন শুনে ডাক্তার মৈত্রর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনি তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। আর নির্মাল্য মিশ্রও তা লক্ষ্য করে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না। বললেন ঃ সে হল ১৯০৮ সালের ঘটনা। আলিপুরের একটা বাড়িতে পুলিশ অনেক বোমা আর গোলাগুলি পেয়ে অনেককে গ্রেপ্তার করল। তাদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দও ছিলেন। তাঁর পক্ষে লড়তে দাঁড়িয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। তখন তিনি নবীন যুবক। আর ঐ একটা মামলাতে আর্গুমেন্ট করেই তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। সেই বক্তৃতার কথা শুনেছেন তো?

ডাক্তার মৈত্র কঠিন হয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিলেন নিজেকে। তিনি যে এইরকম প্রশ্ন পছন্দ করেন না, নির্মাল্য মিশ্রও তা মনে রেখেছেন। তাই

একই নিঃশ্বাসে বললেন ঃ সে একটা মনে রাখবার মতো বক্তৃতা। আমরা বার্কের বক্তৃতার জন্যে ধন্য ধন্য করি, কিন্তু এইসব বক্তৃতা পড়বার সুযোগ পাই নে। শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া পেয়ে গেলেন, কিন্তু দলের চারজনের হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। আরও অনেকের জেল হয়ে গেল।

ডাক্তার মৈত্র জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সেই চারজন কারা ?

নির্মাল্য মিশ্র এবারে রেগে যাবার ভান করে বললেন ঃ আমি কি ইতিহাস মুখস্থ করে রেখেছি !

ডাক্তার মৈত্র তখনই এই কথা মেনে নিয়ে বললেন ঃ তা বটে।

নির্মাল্য মিশ্রও নরম হয়ে বললেন ঃ সবাইকে এইখানেই পাঠানো হয়েছিল।

এক জায়গায় পেঁছে বিন্দু চেঁচিয়ে উঠল ঃ এই দেখুন নির্মাল্যদি। সবার নাম লেখা আছে এইখানে !

কাছে এসে সবাই দেখলেন যে দেওয়ালের একখানা পাথরের উপরে অনেকগুলি বন্দীর নাম, তার উপরে লেখা বাঙলা থেকে আগত রাজবন্দী। প্রথম নাম শচীন্দ্র নাথ সান্যাল ১৯১৫ থেকে ১৯২০, ১৯২৭, তারপরে নরেন্দ্র মোহন ঘোষ চৌধুরী ১৯১৫। এর আগের কোন নাম নেই। তৃতীয় নাম ১৯৩২ সালের।

নির্মাল্য মিশ্র সেই দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত অনেক রাজবন্দীকে এখানে পাঠানো হয়েছিল। সে আর একটা যুগ। কিন্তু—

নির্মাল্য মিশ্র থামতেই বিন্দু বলল ঃ থামলেন কেন নির্মাল্যদি, বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ যে ক জনের নাম আমি জানি, তাদের কারও নাম তো দেখছি না !

যেমন ?

বলে ডাক্তার মৈত্র তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আলিপুর বোমার মামলায় যাঁরা এখানে এসেছিলেন, তাঁদের একজনের নাম উল্লাসকর দত্ত। এই জেলে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন বলে ম্যাড্রাসের এক পাগলা গারদে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল।

তারপর ?

ডালহৌসি স্কোয়ার বোমার মামলার আসামী ননীগোপাল মুখার্জি চোদ্দ বছরের জন্যে এখানে এসেছিলেন। তরুণ বিপ্লবী ইন্দু ভূষণ রায় ১৯১২ সালে এই জেলে আত্মহত্যা করেছিলেন। তারপর আশুতোষ লাহিড়ী ও

ভাই পরমানন্দ একজন ইংরেজ জেলারকে মাটির ওপরে আছড়ে ফেলেছিলেন। তাঁদের নামও এখানে দেখতে পাচ্ছি নে!

ডাক্তার মৈত্র বললেন: সাভারকারের নামও নেই।

নির্মাল্য মিশ্র গম্ভীরভাবে বললেন: নাসিক কন্‌স্পিরেসি কেসের দামোদর বিনায়ক সাভারকার এখানে এসেছিলেন ১৯১১ সালে। স্বরাজ্যের সম্পাদক লাধারাম ১৯১২ সালে এই জেলে দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন করেছিলেন।

তারপরেই প্রশ্ন করলেন: ভাই পরমানন্দর 'মাই স্টোরি' পড়েছেন?

কিন্তু ডাক্তার মৈত্রর দিকে না তাকিয়ে তিনি এবারে বিন্দুর দিকে তাকালেন। বিন্দু বুঝেছিল যে প্রশ্নটা তাকে করা হয়নি। তবু উত্তর দিল: না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: সেলুলার জেলের কথা জানতে হলে সেই বই পড়তে হবে। রাজবন্দী জীবনের একখানি প্রত্যক্ষ দলিল।

আপনি পড়েছেন?

বলে ডাক্তার মৈত্র তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রর দিকে।

নির্মাল্য মিশ্র সকৌতুকে বললেন: এ আপনার একটা বদ্‌ অভ্যেস।

ডাক্তার মৈত্র কতকটা বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন। আর নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন: এত প্রশ্ন করেন কেন!

বিন্দুও হেসে বলল: পড়েন নি, তা বললেই হয়।

না পড়লে এ সব কথা বলছি কী করে!

এইটুকুই বোধহয় পড়েছেন যে ঐ বই-এ এই সব কথা আছে।

বাদল হঠাৎ ছুটে এসে বলল: এইদিকে একবার আসুন ডাক্তারবাবু, পুরনো সেলুলার জেলের একটা মডেল আছে এই দিকে।

বলে সবাইকে সেই দিকেই টেনে নিয়ে গেল।

ডাক্তার মৈত্র খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন মডেলটি। একটি পাহাড়ের উপরে এই জেলখানা। বর্তমানের তিনটি উইঙ্গ দেখে বোঝা যায়নি যে এক সময়ে এইরকম সাতটি উইঙ্গ ছিল। প্রত্যেকটি তিন তলা। সার রিচার্ড টেম্প্‌ল এই জেল পত্তন করেন। ১৮৯৭ সালে ছিল চারশো সেল, ১৯১০ সালে হয় আরও ছশো ছেষট্টিটি সেল। এই সব সেলের মাপ শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। আট ফুট বাই ছ' ফুট, মানে এ কালের একটি বাথরুমের মাপ। কিন্তু তার মধ্যে একজন কয়েদী থাকত না। থাকত জনা চারেক।

একজন কয়েদীর জন্যে এক হাত জায়গা। গায়ে গা মিলিয়ে শুতে হবে, পাশ ফিরতেও হবে ঐ জায়গাতেই।

এই সাতটি উইঙ্গের মাঝে একটি উঁচু টাওয়ার। একে পাহাড়ের মাথায়, তার ওপর টাওয়ার। উপরে উঠলে সমস্ত পোর্ট-ব্লেয়ার শহর সুন্দর দেখা যায়। উত্তাল সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ আর শহর। নির্মাল্য মিশ্র বললেন: ভাগ্যিস আমাদের সঙ্গে কোন কবি নেই!

ডাক্তার মৈত্র এ কথার মানে বুঝতে না পেরে নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে তাকালেন।

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন: তাহলে সে আমাদের সঙ্গে ফিরত না।

কেন?

কবিতা লিখতে বসে যেত।

কবিতা!

বলে ডাক্তার মৈত্র হা-হা করে অট্টহাস্য করে উঠলেন। এই কথার মধ্যে তিনি হাসির খোরাক কী পেয়েছেন, তা বুঝতে না পেরে বিন্দু বাদলের মুখের দিকে তাকাল প্রশ্নের দৃষ্টি নিয়ে।

জানা গেল যে রাজনৈতিক বন্দীদের ভ্রাতৃসংঘ এই সেলুলার জেলের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৭৯ সালের এগারোই ফেব্রুয়ারী এই জেলকে জাতীয় স্মারকের সম্মান দেওয়া হয়েছে। রাজবন্দীদের যেসব ছবি পাওয়া গেছে তার সঙ্গে সাজানো হয়েছে তাঁদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও শাস্তির নানা নিদর্শন। এইসব সংগ্রহ নিয়েই সেলুলার জেলের জাদুঘর।

বাদল হঠাৎ খবর আনল যে এই জেলে বাঙালীরাই বেশি ছিলেন। বাঙালীদের পরে পাঞ্জাবীরা। অন্য সব প্রদেশের বন্দী ছিলেন সংখ্যায় নগণ্য। এক নম্বর ওয়ার্ডের দেওয়ালে এর একটা পরিসংখ্যান আছে। ৫৪১ জন বন্দীর মধ্যে বাঙলার ৩৮৪ জন ও পাঞ্জাবের ১০৮ জন বন্দী এবং অন্য সব রাজ্যের মিলে মাত্র ৪৯ জন। এই ওয়ার্ডেরই দোতলাতেও এই-রকমের একটি হিসাব আছে। ৩৪৭ জনের মধ্যে বাঙলার ২২৩ জন, পাঞ্জাবের ৭৯ জন ও বাকি সব প্রদেশ মিলে ৪৫ জন বন্দী। এই রকমের আরও অনেক তালিকা পাওয়া যায়।

কিন্তু ডাক্তার মৈত্র একসময়ে বিরক্ত হয়ে বললেন: অনেক দেখেছি। আসুন এবারে হাসপাতালের দিকটায়।

বলে সবাইকে নিয়ে সেই দিকেই এগিয়ে চললেন।

॥ বাইশ ॥

হাসপাতাল এলাকায় এসে ডাক্তার মৈত্র হাসপাতাল দেখবার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। বাদল বলল: ভেতরটা দেখবেন না ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার মৈত্র গম্ভীর গলায় বললেন: না।

বাদল তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল। এই তো একটু আগেই তিনি এই হাসপাতাল দেখবার জন্য এইদিকে চলে এসেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে এমন কী ঘটল যে তাঁর অভিপ্রায় অকস্মাৎ বদলে গেল। কিন্তু কিছু বলার আগেই ডাক্তার মৈত্র আবার বললেন: পুরনো বাড়িগুলো কোথায় ছিল, বোঝা যাচ্ছে কি?

বলে তিনি পিছন দিকে তাকালেন। তারপরেই চটে উঠলেন: ব্যাপার-খানা কী?

কিন্তু ব্যাপারখানা কেউই বুঝতে পারলেন না। বাদল অসহায়ভাবে তাকাল তাঁর মুখের দিকে।

ডাক্তার মৈত্র চেঁচিয়ে বললেন: সবাই গেল কোথায়?

তারাপদর দিদি সহাস্যে বললেন: তাই তো, নির্মাল্যদিকে তো দেখতে পাচ্ছিনে!

নির্মাল্য মিশ্র বয়সে তাঁর থেকে ছোট। কিন্তু সম্বোধনের সুবিধার জন্যই যে তিনি নির্মাল্যদি বলেন, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না।

বাদল চমকে উঠে বলল: তাই তো!

বিন্দু বলল: একটু আগেই তো আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

ডাক্তার মৈত্র গর্জন করে উঠলেন: কিন্তু এখন গেলেন কোথায়?

সদানন্দবাবু বললেন: আমি খুঁজে দেখছি।

তারাপদ বলে উঠল: আপনি খুঁজবেন কেন। আমি দেখছি।

কিন্তু বাদল তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর তার সঙ্গে গেছে বিকাশ আর ভানু।

ডাক্তার মৈত্র তাদের দিকে চেয়ে বললেন: এদের কোন দায়িত্বজ্ঞান নেই! এইভাবে চোখ বুজে চললে নিজেরাই একদিন হারিয়ে যাবে।

সদানন্দবাবু বললেন: কিন্তু—

কিন্তু কী?

উনি তো আর ছেলেমানুষ নন যে সবাই সবসময়ে ও'র ওপরে নজর রাখবে।

কেন রাখবে না!

বলে ডাক্তার মৈত্র যেন রুখে উঠলেন।

সদানন্দবাবু কিন্তু দমলেন না, বললেন: হাজার হলেও মেয়েছেলে, আর বয়সটাও কাঁচাই বলতে হবে। ও'র দিকে কি আমাদের সারাক্ষণ নজর দেওয়া ভাল দেখায়।

হুঁ!

বলে ডাক্তার মৈত্র একটা চুরট ধার করলেন।

তারাপদর দিদি তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। বললেন: বিপত্নীক বলেই সদানন্দদার অসুবিধা। তা না হলে নজর রাখতে পারতেন।

কিন্তু আমরা কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব!

বলে ডাক্তার মৈত্র তাকালেন সদানন্দবাবুর দিকে।

সদানন্দবাবু বললেন: তা না থেকে আর কী করতে পারি।

হুঁঃ।

বলে ডাক্তার মৈত্র খানিকটা ধোঁয়া ছুঁড়ে দিলেন সমুদ্রের বাতাসে।

তারাপদর দিদি ডাক্তার মৈত্রকে লক্ষ্য করছিলেন। ভদ্রলোক ঘন ঘন চুরট টানছিলেন, আর অসহিষ্ণুভাবে ধোঁয়া ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। ভিতরে ভিতরে যে অস্থির বোধ করছিলেন, তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। হঠাৎ বলে উঠলেন: না, ওদের কারও কর্ম নয়।

বলে নিজেই এগোলেন।

কিন্তু কোন্ দিকে যাবেন ভেবে না পেয়ে একবার এদিকে আর একবার অন্য দিকে তাকালেন। তারপর পিছন দিকে তারাপদর দিদিকে দেখতে পেয়েই হাতের চুরটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

তারাপদর দিদি বললেন: অমন অধৈর্য হচ্ছেন কেন?

মানে!

মানে একটু ধৈর্য ধরুন। নির্মাল্যদি তো পালিয়ে যাননি।

ও'র যে আবার হারিয়ে যাবার অভ্যেস আছে।

তারাপদর দিদি হেসে বললেন: এখানে উনি নিশ্চয়ই কিছু দেখছেন। দেখা হয়ে গেলে নিজেই বেরিয়ে আসবেন।

হুঁঃ।

বলে ডাক্তার মৈত্র হনহন করে এক দিকে এগিয়ে গেলেন।

তারাপদর দিদি চেঁচিয়ে বললেনঃ যাবেন না কোথাও। শেষ পর্যন্ত সবাই সবাইকে খুঁজে বেড়াবে, আর কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু ডাক্তার মৈত্র এ কথায় ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই বাদলকে দেখতে পাওয়া গেল নির্মাল্য মিশ্রর সঙ্গে। সেলুলার জেলের দিক থেকে তারা আসছিল। ভারি গম্ভীর দেখাচ্ছিল নির্মাল্য মিশ্রকে। তাঁর মুখ থমথম করছিল জলভরা মেঘের মতো। তিনি কোন কথা বলছিলেন না।

বাদল অভিযোগ জানাচ্ছিলঃ না বলে দলছাড়া হয়ে গিয়েছিলেন বলেই আমাদের ভাবনা হয়েছিল।

নির্মাল্য মিশ্র এ কথারও কোন উত্তর দিলেন না।

ডাক্তারবাবু খুব ক্ষেপে গিয়েছেন!

ডাক্তারবাবুর নাম শুনে নির্মাল্য মিশ্রও খুব ক্ষেপে গেলেন। বললেনঃ তিনি কি নিজেকে আমার অভিভাবক ভাবেন নাকি!

বাদল চুপ্‌সে গিয়ে বললঃ না, তা নয়।

তবে?

মানে, একসঙ্গে সবাই এসেছি কি না—

সদানন্দবাবু এগিয়ে এসে বললেনঃ কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

নির্মাল্য মিশ্র গম্ভীরভাবে বললেনঃ কোথাও না।

বাদল তাড়াতাড়ি বললঃ উনি জেলের পুরনো সেলগুলো দেখে বেড়াচ্ছিলেন।

কেন?

বিরক্তভাবে নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আপনারা হাসপাতালে কী দেখতে এসেছিলেন?

সদানন্দবাবু বললেনঃ দেখবার মতো কিছু আছে কিনা, তাই দেখতে এসেছিলাম।

দু পক্ষকে সামলাবার জন্য বাদল বললঃ আমরা তো দেখতেই বেরিয়েছি! যার যেখানে ভাল লাগে, মানে—

নির্মাল্য মিশ্রর চোখের দিকে তাকিয়ে বাদল থেমে গেল। তাঁর দৃষ্টিতে কোন ক্রোধের চিহ্ন নেই, বিরক্তি নেই, অনুযোগ নেই। বাদলের মনে হল

যেন এক বেদনার সমুদ্রে সেই দৃষ্টি ডুবে গেছে। এখন কোন কথা বলতে না হলেই বোধহয় তিনি সুখী হবেন।

নির্মাল্য মিশ্র কোন কথা বললেন না, দাঁড়িয়ে কারও জন্য অপেক্ষাও করলেন না। সেলুলার জেল থেকে বেরোবার পথ ধরে এগিয়ে চললেন। বিন্দু তাঁর পাশে পাশে এগিয়ে চলল।

সদানন্দবাবু তারাপদর দিদিকে বললেন : আমরা এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী করব! আসুন।

বলে তাঁরাও ফেরার পথ ধরলেন। কিন্তু বাদল খানিকটা দূর থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলল : গেটের কাছে অপেক্ষা করবেন সদানন্দদা, ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আমি আসছি।

বাহিরে সদর রাস্তায় পেঁছে নির্মাল্য মিশ্র চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। পিছনেও ফিরে দেখলেন একবার। সদানন্দবাবুর সঙ্গে তারাপদর দিদি একেবারে কাছে এসে গিয়েছিলেন। এই মহিলার দৃষ্টি নির্মাল্য মিশ্রর ভাল লাগছে না! এমন একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি যে বিদ্রূপ বলে মনে হচ্ছে। এঁদের কারও সঙ্গ এখন তাঁর ভাল লাগছে না।

বিন্দু কিছু বুঝতে পারছে। কিন্তু ভয়ে কোন কথা বলতে পারছে না। নীরবে থাকাই নিরাপদ বলে তার মনে হচ্ছে।

ঠিক এই সময়ে একজন লোক কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল : ট্যাক্সি?

নির্মাল্য মিশ্র তৎপরভাবে বললেন : হ্যাঁ।

তারপরেই বিন্দুর দিকে ফিরে বললেন : আমি যাচ্ছি। বাদলকে তুমি জানিয়ে দিও।

বলে সেই ট্যাক্সিতে উঠে ফিরে গেলেন।

মেয়ের কাছে এসে সদানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : সে কিরে, উনি অমন করে চলে গেলেন কেন?

বিন্দু বলল : তা তো জানিনে বাবা!

কেন, কিছু বলে যান নি?

বিন্দু একটু ইতস্তত করে বলল : তোমাদের বলতে বলে গেলেন।

তারাপদর দিদি জিজ্ঞাসা করলেন : কী বলতে বলে গেলেন?

বিন্দু বলল : উনি যে চলে গেলেন, সেই কথা।

ঠিক এই সময়ে বাঘের গর্জন শোনা গেল : উনি যে চলে গেলেন, কিন্তু কোথায় গেলেন?

ভয়ে বিন্দু জড়োসড়ো হয়ে তার বাবার কাছে ঘেঁষে এল। কিন্তু ডাক্তার মৈত্র থামলেন না, বললেন ঃ এই বিদেশে বিভূঁয়ে একজন মহিলা একা চলে গেলেন, আর আপনারা দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন!

সদানন্দবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ তবে দৌড়ুন তাঁর পেছনে!

ডাক্তার মৈত্র এই পরামর্শের অপেক্ষা না করেই চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ ট্যাক্সি!

আর একখানা ট্যাক্সি এল এগিয়ে। ডাক্তার মৈত্র কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সেই ট্যাক্সিতে চেপেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সবাই স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। কিন্তু তারাপদর দিদি হাসলেন একটুখানি।

॥ তেইশ ॥

একটুখানি এগিয়েই ট্যাক্সির ড্রাইভার ডাক্তার মৈত্রকে জিজ্ঞাসা করল ঃ কোথায় যাব?

কোথায়!

ডাক্তার মৈত্র এই প্রশ্নের উত্তর দিতে একটি মুহূর্তের বেশি সময় নিলেন না, বললেন ঃ সমুদ্রের ধারে।

নির্মাল্য মিশ্রর কথাই তিনি ভাবছিলেন। সেদিন নির্মাল্য মিশ্র সেলুলার জেল দেখতে যেতে চান নি, বলেছিলেন সমুদ্রের ধারে যাব। তাঁর সেই পুরনো কথাই ডাক্তার মৈত্রর মনে পড়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই তিনি সমুদ্রের ধারে গেছেন, এই ভেবেই ট্যাক্সির ড্রাইভারকে তিনি সমুদ্রের ধারে যাবার নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু ড্রাইভার এই নির্দেশ ঠিক বুঝতে না পেরে পিছন ফিরে তাকাল। ডাক্তার মৈত্রও বুঝতে পারলেন যে এই সমুদ্রবেষ্টিত শহরে সমুদ্রের ধারে যেতে বললে নির্দেশটা ঠিক স্পষ্ট হয় না। কিন্তু এর বেশি আর কিছু জানা নেই বলে তিনি চুপ করে রইলেন।

ড্রাইভারও বুঝতে পারল যে এই ভদ্রলোক এখানে বেড়াতে এসেছেন। তা না হলে সেলুলার জেল দেখতে আসতেন না। কাজেই এঁকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে সমুদ্রের ধারে একটি রমণীয় স্থানে পেঁছে দেওয়াই উচিত। ড্রাইভার তাই তাঁকে নিজের পছন্দমতো একটি জায়গাতেই নিয়ে চলল।

সদর রাস্তা ছেড়ে অন্য একটি পথ ধরতেই ডাক্তার মৈত্র আর একটি খালি

ট্যাক্সি দেখতে পেলেন। সেটি উল্টো দিক থেকে আসছিল। ডাক্তার মৈত্র হঠাৎ পুলকিত হয়ে উঠলেন। নির্মাল্য মিশ্রকেই হয়তো সমুদ্রের ধারে নামিয়ে দিয়ে এই ট্যাক্সিটা ফিরছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর ইচ্ছা হল, ট্যাক্সিটা থামিয়ে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সংকোচ হল। তাই নিঃশব্দে বসে রইলেন।

সমুদ্রের ধারে পৌঁছে বললেন: দাঁড়াও এইখানে।

তারপর গাড়ি থেকে নেমে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। ঐ তো নির্মাল্য মিশ্রকে দেখা যাচ্ছে! সমুদ্রের একেবারে কাছাকাছি গিয়ে বালির উপরে বসে আছেন একা। কিন্তু সমুদ্রের দিকে তো তাকিয়ে নেই! মুখ নিচু করে আছেন।

ডাক্তার মৈত্র সেই দিকেই ছুটে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ট্যাক্সির ড্রাইভার বাধা দিয়ে বলল: আমি কি অপেক্ষা করব?

অপেক্ষা! না না, অপেক্ষা করবার কোন দরকার নেই।

বলে তার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নির্মাল্য মিশ্রর দিকে এগিয়ে গেলেন।

সেই সমুদ্র! কালাপানির সমুদ্র! কিন্তু জল এখানে কালো মনে হচ্ছে না। নীল জল, সবুজ মেলানো নীল। আর নিস্তব্ধ পরিবেশে শুধু সমুদ্রের ডাক। গুরুগম্ভীর গর্জন নয়, সঙ্গীতের মতো মধুরও নয়। ঢেউ আর বাতাসে মিলে একটা একটানা শব্দ। এরই নাম সমুদ্রের ডাক।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্রর মন এদিকে ছিল না। নির্মাল্য মিশ্র সমুদ্র দেখছেন না। সমুদ্রের ডাকও শুনছেন না।

ডাক্তার মৈত্র তাঁর কাছাকাছি এসে দেখলেন যে ডান হাতের আঙুল দিয়ে নির্মাল্য মিশ্র বালির উপরে আঁচড় কাটছেন। পিছনে তাঁর পদধ্বনিও বোধ-হয় শুনতে পেলেন না।

ডাক্তার মৈত্র বুঝতে পারছেন যে নির্মাল্য মিশ্র গভীরভাবে কিছু ভাবছেন। এখন তাঁর সমস্ত মন একটা বেদনার্ত ভাবনায় ডুবে আছে। তিনি নিজে এখন কী করবেন বা কী বলবেন, সহসা তা ভেবে পেলেন না। তার পরেই চমকে উঠলেন একটা শব্দ শুনে। না, এ তো সমুদ্রের ডাক নয়। এ যেন মানুষের গলার স্বর। এক ঝাপ্‌টা বাতাসের ভিতর থেকে শব্দ এল: দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

ডাক্তার মৈত্র ত্রস্তভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই।

নির্মাল্য মিশ্রই শুধু মুখ নত করে বালির উপরে আঁচড় কাটছেন নিঃশব্দে। তবে কে তাঁর সঙ্গে কথা কইল?

আর এক ঝাপটা বাতাসে তাঁর পায়ের নিচের বালি উড়ল খানিকটা। আর সেই সঙ্গেই শুনতে পেলেন: বসুন।

বসব!

বলে চারিধারে চেয়ে দেখলেন, কে তাঁকে বসতে বলছে।

তবে কি দাঁড়িয়ে থাকবেন বলে এসেছেন!

এ তো নির্মাল্য মিশ্রর কণ্ঠস্বর! তবে কি এতক্ষণ নির্মাল্য মিশ্রই তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন! কিন্তু তাঁর গলার স্বর এমন ভারি শোনাচ্ছিল কেন! ঠাণ্ডা লেগেছে?

ডাক্তার মৈত্র বালির উপরেই ঝুপ করে বসে পড়লেন। বললেন: আপনার কাছে এসে বসব বলেই তো এলাম!

জানি।

বলে নির্মাল্য মিশ্র নীরব হয়ে রইলেন।

ডাক্তার মৈত্র আকাশ-পাতাল ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না, এর পরে কী বলবেন, কী বলা উচিত হবে এইবারে।

নির্মাল্য মিশ্র মুখ তুলে ডাক্তার মৈত্রর অসহায় মুখখানার দিকে একবার তাকালেন। তারপরে তাকালেন সমুদ্রের দিকে। নির্বিকার নীল সমুদ্র নিজের মনেই খেলা করছে উপকূলের সঙ্গে। ফুঁসে উঠে ছুটে আসছে, তার পরেই ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়ছে। সাদা ফেনার হাসি ছড়িয়ে দিচ্ছে বালির উপরে। আর হাল্কা বাতাসে বেলাভূমির শুকনো বালি উড়ছে অল্প অল্প।

নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তার মৈত্র বললেন: কী দেখছেন?

সমুদ্রের খেলা। পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্র সারাক্ষণ খেলা করছে।

ডাক্তার মৈত্রর মনে হল যে তিনিও এইরকম খেলা করতে পারেন নির্মাল্য মিশ্রর সঙ্গে। এমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে হেসে লুটোপুটি খেতে পারেন। কিন্তু এ কথা মনে হতেই বুকের ভিতরটা তাঁর কেঁপে উঠল। ছিছি, সে বয়স কি তাঁর আছে!

বয়স! কেন, তিনি তো বুড়ো হয়ে যাননি! কতই বা তাঁর বয়স হয়েছে! চল্লিশ বিয়াল্লিশ কি বেশি বয়স! না এই বয়সেই কোন পুরুষ নিজেকে বুড়ো ভাবতে পারে! ডাক্তার মৈত্র নিজের দিকে একবার তাকালেন। দৃঢ় শক্ত তাঁর শরীরের গড়ন। বয়সের ছাপ তো একটুও পড়েনি। তবে

কি সেই কথাটাই সত্যি ! পুরুষের বয়স হল যত সে ভাবে, আর মেয়েদের বয়স যত সে দেখায় ।

ডাক্তার মৈত্র নির্মাল্য মিশ্রর দিকে তাকালেন । না, এখন আর এই মহিলাকে হাইকোর্টের উকিল বলে মনে হচ্ছে না । মনে হচ্ছে, এখনও সে বোধহয় কলেজেই যাতায়াত করছে । অকারণে এত দিন ভুল করেছেন বলে ডাক্তার মৈত্রর এখন আপশোস হতে লাগল ।

ডাক্তার মৈত্র একসময়ে গভীরভাবে বললেন : কী ভাবছ নির্মাল্য ?

নির্মাল্য মিশ্র চমকে উঠে ডাক্তার মৈত্রর মুখের দিকে তাকালেন । তাঁর নিজের মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না । কোন উত্তরও তিনি দিলেন না ।

ডাক্তার মৈত্র আবার বললেন : বল না, কী ভাবছ !

নির্মাল্য মিশ্র খুব আস্তে আস্তে বললেন : সে কথা তোমার ভাল লাগবে না ।

লাগবে ।

আমার ঠাকুর্দার এক ছোট ভাইএর কথা । ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে সেই গল্প শুনেছি ।

ডাক্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন : কিন্তু এখানে সমুদ্রের ধারে বসে পুরনো কথা তোমার কেন মনে পড়ছে ?

শান্ত গলায় নির্মাল্য মিশ্র বললেন : এইখানেই তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন যে !

ডাক্তার মৈত্র বুঝি চমকে উঠলেন । আর তা দেখতে পেয়ে নির্মাল্য মিশ্র একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন : চমকে উঠলে কেন ?

ডাক্তার মৈত্র এ কথার উত্তর দিতে পারলেন না ।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : কালাপানিতে তাঁর নির্বাসন হয়েছিল । এখানে তিনি জেল খাটতে এসেছিলেন ।

আন্দামানে জেল খাটতে এসেছিলেন তিনি !

বলে ডাক্তার মৈত্র অনেক কৌতূহল নিয়ে তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রর দিকে ।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : হ্যাঁ, সেলুলার জেলের যে সেলে তাঁর জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তা দেখে এলাম ।

ডাক্তার মৈত্রর মনে পড়ে গেল সেই কথা । তাঁরা যখন হাসপাতালের দিকে এসেছিলেন, সেই সময়ে নির্মাল্য মিশ্র হারিয়ে গিয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্য । তিনি যে কোন সেল খুঁজতে গিয়েছিলেন, সে কথা কাউকে বলেননি ।

ডাক্তার মৈত্র জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তার দ্বীপান্তর হয়েছিল কেন ?

পুলিশ বলেছিল যে তাঁর ঘরে বোমা পাওয়া গিয়েছিল। তাই এক দল বিপ্লবীর সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন।

নির্মাল্য মিশ্র একটু থেমে বললেন ঃ কিন্তু ঠাকুমার কাছে শুনেছি যে সে বোমা নয়, তাঁর ঘরে পাওয়া গিয়েছিল এক তাড়া চিঠি।

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ সেও তো মারাত্মক ব্যাপার !

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন ঃ প্রেমপত্র।

অ্যাঁ !

হ্যাঁ। পুলিশের এক বড় সাহেবের একমাত্র মেয়ে তাঁকে সেইসব চিঠি লিখেছিল।

ডাক্তার মৈত্র স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে।

নির্মাল্য মিশ্র হাসবার চেষ্টা করে বললেন ঃ সেই যুবক কবি ছিলেন। কলেজের ফাংশনে কবিতা পাঠ করতেন। কলেজ ছাড়ার পরে আর কিছু করেননি।

ডাক্তার মৈত্র বুঝতে পেরেছেন যে সেই পুলিশ অফিসার চাননি যে তাঁর মেয়ে কোন বেকার যুবককে ভালবাসে, অথবা তার সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখে। তাই তাকে আন্দামানে চালান দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু—

বলে নির্মাল্য মিশ্র থেমে গেলেন।

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ বল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ কিন্তু সেই পুলিশ সাহেব নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। মেয়ে তাঁর আত্মহত্যা করেছিল।

আত্মহত্যা !

হ্যাঁ, তিনি এই কথা প্রচার করেছিলেন। কিন্তু ঠাকুমার কাছে শুনেছি যে, সেই মেয়েও বাড়ি থেকে পালিয়ে আন্দামানে চলে এসেছিল।

ডাক্তার মৈত্র গম্ভীরভাবে বললেন ঃ তবে এসো না। আমরা তাঁদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা করি।

নির্মাল্য মিশ্র এবারে সত্যিই হাসলেন, বললেন ঃ তুমি দেখছি একটা আস্ত পাগল !

কেন ?

তাঁরা কি আমাদের বয়সী যে আজ আমরা তাঁদের খুঁজে পাব !

ডাক্তার মৈত্র খানিকক্ষণের জন্য থমকে গিয়েছিলেন। তারপরেই বলে উঠলেন: কেন, তাঁদের উত্তরাধিকারী কি থাকতে পারে না?

নির্মাল্য মিশ্র উৎসাহিত হয়ে বললেন: তাঁদের খুঁজতেই তো আমি এখানে এসেছি! কিন্তু তুমি কেন এসেছ, তা তো বললে না?

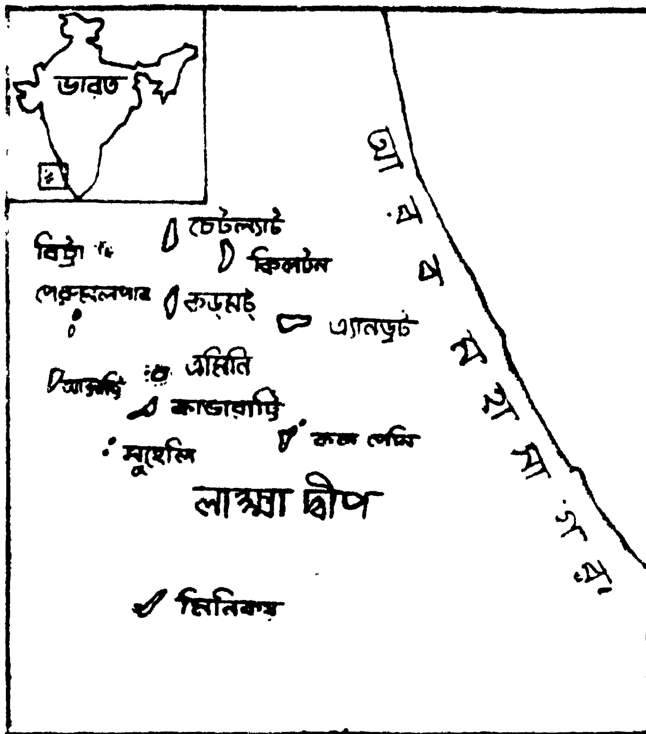
আমি!

আবার থমকে গেলেন ডাক্তার মৈত্র। এইরকমের একটা ঘটনা তাঁরও মনে পড়ছে। তাঁর নিজের ঠাকুর্দা ছিলেন বৃটিশ আমলের জাঁদরেল দারোগা। দেশদ্রোহী বলে অনেক বাঙালী তরুণকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে তিনি অফিসার হয়েছিলেন। তাঁর মেয়ে নাকি আত্মহত্যা করেছিল। এই পিসিকে তিনি দেখেন নি, ছেলেবেলায় গল্প শুনেছিলেন তাঁর মৃত্যুর। কিন্তু সে যে সত্য নয়, তা তিনি জানেন না।

নির্মাল্য মিশ্র ডাক্তার মৈত্রর মুখের দিকে তাকালেন। বড় অসহায় মনে হচ্ছে তাঁকে, শিশুর মতো অসহায়। নির্মাল্য মিশ্র তাঁর একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: কী হল?

ডাক্তার মৈত্র সেই হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরলেন। কোন উত্তর তিনি দিতে পারলেন না।

———



লাক্ষা দ্বীপের মানচিত্র

বাদল ভেবেছিল যে লাক্ষা দ্বীপ ভ্রমণে নির্মাল্য মিশ্রকে রাজী করাতে মোটেই বেগ পেতে হবে না। ভদ্রমহিলা পেশায় উকিল হতে পারেন, কিন্তু স্বভাবে অমায়িক ও প্রসন্ন মেজাজের। নিজে আনন্দ পান সহজে, আর অপরকেও আনন্দ দিতে ভালবাসেন। তাই হাইকোর্টে তেমন কোন জরুরি মামলা না থাকলে তিনি সহজেই রাজী হয়ে যাবেন। আর মামলা থাকলেও কোন অসুবিধা নেই। কোচিনে লাক্ষা দ্বীপের অফিস থেকে লাক্ষারি জাহাজ এম ভি ভারত সীমার যে ভয়েজ শেড্যুল আনিয়েছে, তাতে নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত আটচল্লিশটা যাত্রার দিন আছে। নির্মাল্য মিশ্রের যেদিন পছন্দ হবে সেই দিনেই আর সবাইকে রাজী করানোর অসুবিধা হবে না। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র যে এমন বেঁকে বসবেন, বাদল তা ভাবতেই পারেনি।

এদিকে সদানন্দবাবুর মেয়ে বিন্দু জেদ ধরেছে যে নির্মাল্য মিশ্রকে না নিয়ে যাওয়া চলবে না। ইতিমধ্যেই সে বি. এ. পাস করে আইন পড়তে আরম্ভ করেছে। তার ভবিষ্যৎটা জড়িয়ে আছে নির্মাল্য মিশ্রের সঙ্গেই। যথাসময়ে তাঁর আর্টিক্‌ড হয়ে হাইকোর্টে যাতায়াত করবে। ভদ্রমহিলা তাতে রাজী হয়েছেন এবং দেখা হলেই উৎসাহ দিচ্ছেন। বিন্দু বলেছে, নির্মাল্যদিকে রাজী করাতে না পারলে আমাকে বোলো, আমি তাঁকে রাজী করাব। কিন্তু বাদল কারও কাছে হার মানতে চায় না। বিন্দুর কাছে তো নয়ই। ব্যাপারটা ডাক্তার হিমাংশু মৈত্রকে নিতে হলে বাদল অনায়াসেই বিন্দুকে বলতে পারত, তুমি যাও। তার কারণ সে ভদ্রলোক মেয়ে দেখলে আরও ক্ষেপে যাবেন।

কাজেই বাদলকে এক আধটা মিথ্যে কথা বলতে হচ্ছে। বিন্দু কিছু জানতে চাইলেই বলে: অমন ব্যস্ত হচ্ছ কেন, বল তো! নির্মাল্যদি তো আর আমার মতো চাকুরে মানুষ নন যে সকালবিকেলে বাড়িতেই পাওয়া যাবে! মক্কেল নিয়ে সারাদিন তিনি হিমসিম খাচ্ছেন। কোন ছুটির দিনে তাঁকে ধরব। আর মেজাজটা ভাল দেখেই প্রস্তাবটা করতে হবে।

কিন্তু বাদলের প্রস্তাব শুনে যে নির্মাল্য মিশ্র একেবারে সরাসরি হাঁকিয়ে দিয়েছেন, তা বিন্দুকে সে বলতে পারেনি। দিনকয়েক আগেই একদিন সে সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে ভদ্রমহিলার দেখা পায়নি বলে সকালের দিকে গিয়েছিল। বলেছিল: সেবারে তো আন্দামান আপনার খুব ভাল লেগেছিল, তাই না নির্মাল্যদি?

নির্মাল্য মিশ্র তাঁর কাগজপত্রের দিকে চোখ রেখেই বলেছিলেন: হ্যাঁ।

বাদল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলেছিল: এবারে তার চেয়েও ভাল প্রোগ্রাম করেছি।

নির্মাল্য মিশ্র অন্যমনস্কভাবে বলেছিলেন: আবার আন্দামান!

না না, আন্দামান নয়, এবারে লাক্ষা দ্বীপ। কোচিন থেকে জাহাজে উঠতে হবে, আর জাহাজে করেই কয়েকটা দ্বীপ দেখা যাবে।

নির্মাল্য মিশ্র গম্ভীরভাবে বলেছিলেন: বেশ তো, ঘুরে এসো তোমরা। ফিরে এসে গল্প শুনিয়ে যেও।

বাদল বলেছিল: আপনিও তো আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন!

আমি!

বলে নির্মাল্য মিশ্র তাঁর চোখ তুলে বাদলের দিকে তাকালেন। আর

চোখের চশমাটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলের ওপরে। বাদল তাঁর শূন্য দৃষ্টি দেখে ভয় পেয়ে গেল।

নির্মাল্য মিশ্র খানিকক্ষণ বাদলের মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন : আমাকে কী করতে হবে ?

বাদল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল : আপনাকে ! না, আপনাকে কিছুই করতে হবে না। যা করবার তা আমরাই করব। আপনি শুধু—

বাদল থামতেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন : থামলে কেন ! বল, আমাকে কী করতে হবে !

বিন্দু বলছিল—

কী বলছিল ?

মাথা চুলকে বাদল বলল : আপনি না গেলে কোন মজাই হবে না !

নির্মাল্য মিশ্র তাঁর চশমা চোখে দিয়ে বললেন : হ্যাঁ, তোমরা মজা দেখবে বলে আমাকে সঙ্গে যেতে হবে ! এই তো !

বাদল বলে উঠল : না নির্মাল্যদি, তা নয়। আপনি সঙ্গে থাকলে খুব আনন্দ হয়। মানে বিন্দুর খুব ইচ্ছে যে—

আমাকে নিয়ে একটু মজা করে !

বলে তিনি তাঁর কাগজপত্রে মন দিলেন, আর কোন কথাই বললেন না। বাদল কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে অফিসের দেরি হচ্ছে বলে উঠে চলে এল।

নির্মাল্য মিশ্রের কাছে এ ধরনের ব্যবহার সে আশা করেনি। তার মনে হয়েছিল যে সে বোধহয় এমন সময় গিয়েছিল যখন তিনি কোন বেয়াড়া ধরনের মামলার কাজগপত্র দেখছিলেন, কিংবা কোন কারণে তাঁর মেজাজটা ঠিক ছিল না। তাই বিন্দুর কাছে এই ঘটনা প্রকাশ করতে চায়নি। এদিকে নির্মাল্য মিশ্রের কাছে দিন না নিয়ে ডাক্তার হিমাংশু মৈত্রর কাছেও যাওয়া যায় না। তিনি আগে কোন দিন দিলে সে দিনটা আর বদলাতে রাজী হবেন না। বয়স হয়েছে বলে বড়ই একরোখা। অন্যের সুবিধে হবে বলে তার মত বদলানো যায় না। অথচ ঝপ্ করে একটা দিনের কথা বললে তিনিও ঝপ্ করেই রাজী হয়ে যাবেন। অর্থাৎ কারও সুবিধের কথা না ভেবে একটা দিন স্থির করলে তার সম্মতি পেতে দেরি হবে না। কিন্তু অন্য সবাই তার মুখ চেয়ে অপেক্ষা করে আছে। তাদের ছুটি চাইতে হবে আগেভাগে, শেষ মুহূর্তে ছুটি চাইলে অসুবিধা হতে পারে। বাদলের

নিজেরও একই অবস্থা। বড় সাহেব নতুন এসেছেন। কড়া লোক বলে শোনা যাচ্ছে। কাজেই তাকেও একটা পরীক্ষা দিতে হবে।

সন্ধ্যের সময়ে বিন্দু জিজ্ঞেস করল: নির্মাল্যদিকে বলেছ?

বাদল ঠিক এরকমের একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত ছিল না। তাই আমতা আমতা করে বলল: হ্যাঁ, না, বললেই হ'ল। নির্মাল্যদিকে তো চিনি। বিপদ তাঁকে নিয়ে নয়, আসল বিপদ হ'ল ডাক্তারবাবুকে নিয়ে। দু'জনকে একদিনে রাজী করাতে হবে তো!

বিন্দু বলল: চল না, আজ নির্মাল্যদির সঙ্গেই দেখা করে আসি!

বাদল যেন প্রমাদ গুণল, বলল: না না, আজ নয়, আজ থাক।

আজ থাকবে কেন! আজ তো ফুরসত আছে দু'জনেরই।

বাদল এবারে সামলে নিয়ে বলল: ফুসরত আছে বলেই আজ একটু নিরিবিলিতে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে। চল না, গঙ্গার ধারে গিয়ে একটু বসি!

গঙ্গার ধারে বা নিরিবিলিতে বসবার ইচ্ছা বাদলের বড় একটা হয় না। সাধারণত তার ইচ্ছা হয় সিনেমায় যেতে, কিংবা কোন রেস্তোরাঁয় বসে চা খেতে। লোকজনের মাঝেই তার ভাল লাগে, পরিচিত লোকের কাছে ধরা পড়ে যাবার ভাবনাই তাকে আনন্দ দেয়। তাই বিন্দু আজ একটু আশ্চর্য হয়ে বলল: গঙ্গার ধারে!

বাদল তৎপরভাবে বলল: হ্যাঁ, অনেক দিন গঙ্গার ধারে যাইনি তো, তাই। আন্দামানে সমুদ্রের ধারে বসবার কথা মনে আছে!

আছে।

বলে বিন্দু হাসল।

বাদল বলল: হাসলে যে?

বিন্দু বলল: গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি, তারপর বলব। কিন্তু বেশিক্ষণ বসব না। বাবা বাড়ি ফেরবার আগেই আমাকে ফিরতে হবে।

সে তো রোজই ফেরো, আজ না হয় একটু দেরিই হ'ল।

বলে দু'জনে গঙ্গার ধারেই চলল। কলকাতা শহরে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাওয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যান-বাহনেরও দরকার। কিন্তু শহরের উত্তরে বা উপকণ্ঠে কিংবা গঙ্গার ওপারে অন্যরকম। নির্জন জায়গাও খুঁজে পাওয়া যায়। বিন্দুর সঙ্গে বাদল এমনি একটি পরিচিত জায়গায় এসে বসল। তারপর বলল: আন্দামানের সমুদ্রের কথায় তুমি হেসেছিলে কেন, বল।

বিন্দু এবারে অনেকক্ষণ ধরে বেশ রসিয়ে হাসল। আর বাদল বিরক্ত হয়ে বলল: অমন অসভ্যের মতো একা হাসছ কেন?

বিন্দু বলল: অসভ্যরা কি একা হাসে নাকি?

বাদল বলল: অসভ্যরা সঙ্গীর কথা ভাবে না।

তাই বুঝি!

বলে বিন্দু বলল: ডাক্তারবাবুর কথা তোমার মনে নেই!

আমাদের ডাক্তারবাবু?

আন্দামানে আর কোন্ ডাক্তারবাবু গিয়েছিলেন!

বাদল বলল: তাতে হাসবার কী আছে! ভদ্রলোক একটু বেশি গম্ভীর। এই যা!

কিন্তু বিন্দু বলল: নির্মাল্যদির সঙ্গে কী কাণ্ডটাই না করেছিলেন!

বলে সে হাসতে লাগল।

পুরনো কথা বাদলের মনে পড়ে গেল। আন্দামানের জাহাজে উঠে বাদল সবাইকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে এসেছিল পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। ডাক্তারবাবু নিজেই নির্মাল্য মিশ্রকে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে এনেছিলেন খিদিরপুরের জাহাজঘাটায়। দু'জনে দু'খানা চেয়ারে চুপচাপ বসেছিলেন। এই সময়ে বাদল এসে তাঁকে বলেছিল, এঁরা সবাই আমাদের ক্লাবের মেম্বার ডাক্তারবাবু। সদানন্দদা এসেছেন ওঁর ছোট মেয়ে বিন্দুকে নিয়ে। তারাপদ আর তার দিদি। বিকাশ আর ভানু। আর ইনি হলেন নির্মাল্যদি।

বলে তাঁর সঙ্গেও সবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা কোথায় জায়গা পেয়েছো বাদল?

বাদল বলেছিল, আমরা নিচে ব্যাঙ্ক ভাড়া করেছি।

সেখানে আমার একটু জায়গা হয় না?

ডাক্তারবাবুর প্রশ্ন শুনে বাদল যেন আকাশ থেকে পড়েছিল। বলেছিল, সেকি ডাক্তারবাবু, এমন সুন্দর কেবিন আপনার পছন্দ হচ্ছে না?

ডাক্তারবাবু বেশ করুণভাবে বলেছিলেন, অপছন্দের কথা বলছি না, আমি একটু নিরিবিলি থাকতে চেয়েছিলাম।

বাদল আশ্চর্য হয়েই বলেছিল, কেবিনে তো আপনি একাই থাকবেন! এই তো বেশ নিরিবিলি!

আর নির্মাল্য মিশ্র গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, এ কথা আপনি আমাকে বলেননি কেন ?

বলেই চেয়ার থেকে উঠে গটমট করে অন্য ধারে চলে গিয়েছিলেন। হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সবাই। বাদল কাঁদোকাঁদো ভাবে তাকাল ডাক্তারবাবুর দিকে। বলল, উনি অমন রেগে গেলেন কেন ?

ডাক্তার মৈত্র বলতে পারলেন না যে তাঁর প্রস্তাবেই ভদ্রমহিলা অপমানিত বোধ করেছেন। কিন্তু এই ঘটনায় সবার আনন্দেই যেন একটা ভাঁটা পড়ে গেল। যাত্রার আগেই যেন একটা বাধার মতো। কিছু একটা করা উচিত ভেবে বাদল নির্মাল্য মিশ্রর দিকে এগিয়ে গেল। কাছে এসে বলল, ডাক্তার-বাবুর কথায় আপনি রাগ করলেন কেন নির্মাল্যদি ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন, সে আমারই দোষ।

বাদল বলল, আপনার দোষ কেন বলব! আপনার জায়গায় হলে আমিও অপমানবোধ করতাম।

করতে তো! কিন্তু ভদ্রলোক ফ্র্যাংক নন কেন! আমি পাশে বসলে যদি তাঁর মান যায় তো আমি কেন তাঁর পাশে বসে থাকব! দরকার হলে তিনি আমার পাশে এসে বসবেন!

বিন্দু এবার চুপিচুপি বাদলকে বলেছিল যে এর ভেতরে একটা রহস্য আছে।

কী রহস্য ?

হয় দু'জনে দু'জনের পরিচিত। আর নয়—

বলেই বিন্দু হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। বাদলের আজও বিন্দুর সেই হাসির কথা মনে আছে। কিন্তু আজ সে হাসছে কেন তা বুঝতে পারল না। বলল ঃ বসে বসে পাগলের মতো হাসবে, না বলবে কিছু ?

বিন্দু বলল ঃ ছেলেরা ভারি বোকা হয়, আর প্রেমের ব্যাপারে কেমন ক্যাবলা বনে যায়। ভারি মজা লাগে তাদের দেখতে।

বাদল গম্ভীর হয়ে বলল ঃ তুমি কার কথা বলছ ?

সবার কথা। প্রেমে পড়লে সবাই একরকম।

বলে বিন্দু তার ব্যাগের ভেতর থেকে একটা ঠোঙা বার করে বাদলের হাতে দিয়ে বলল ঃ চিনেবাদাম খাও।

বাদল ঠোঙাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল ঃ তুমি খাও।

বিন্দু একটুখানি হেসে ঠোঙাটা নিজের কোলের ওপরে রেখে একটা বাদাম ছাড়াল। তারপর হাত তুলে বাদলকে বলল ঃ হাঁ কর।

বাদল হাঁ করতেই তার মুখের ভেতরে বাদাম ফেলে দিয়ে আর একটা বাদাম ছাড়াতে লাগল। বলল: ছেলেরা ঠিক বাদামের খোলার মতো শুকনো। এমনি করে ছাড়াতে না পারলে—

বলে ছাড়ানো বাদাম নিজের মুখে পুরে চিবোতে লাগল।

বাদল বিন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল যে অল্পদিনেই বিন্দু খুব বদলে গেছে। আন্দামানে যাবার সময়ে সে কতো লাজুক ছিল, কত ভীরু ও স্বল্পভাষী। অথচ এখন বি. এ. পাস করে ল কলেজে ঢুকেই সে যেন তার অভিভাবক হয়ে গেছে। পুরনো বিন্দুকে যেন আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। সোজা কথাও সোজাভাবে না বলে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সব কথাকেই দুর্বোধ্য করে তোলে। এখনও বাদল বুঝতে পারেনি, বিন্দু কী বলতে চাইছে। তাই বলল: যা বলতে চাও তা সরলভাবে বল।

বিন্দু বলল: তুমিও তো সরলভাবে আমাকে কিছু বলনি!

মানে?

নির্মাল্যদি যে তোমাকে হাঁকিয়ে দিয়েছেন, তা তুমিই বা আমার কাছে গোপন করে যাচ্ছ কেন?

বাদল হকচকিয়ে গিয়ে বলল: তোমাকে এ কথা কে বলল?

বিন্দু বলল: ঘোড়ার মুখ থেকে শুনেছি। আর নির্মাল্যদির রাজী না হবার কারণটা জেনে রেখো। তোমার ডাক্তারবাবু গেলে নির্মাল্যদি যাবেন না। তিনি অসভ্যতা পছন্দ করেন না।

অসভ্যতা!

হ্যাঁ, অসভ্যতা, হ্যাংলামি, কখনও ভাবে গদগদ, কখনও খিস্তি-খেউড়! তোমার মুরুব্বি না হলে নির্মাল্যদি এতদিনে ফাইভ হান্ড্রেড আই. পি. সি.-তে মানহানির মামলা এনে তাঁকে জেলে পুরে দিতেন। জানো? তাই বলছি, ডাক্তারবাবুর নাম কাটো, আর সেই কথা জানিয়ে নির্মাল্যদিকে রাজী করাও। ডাক্তারবাবু কি তোমার ভগবান যে সারাটা পথ তাঁর খোশামোদ করতে করতে যাবে!

কিন্তু—

কিন্তু আবার কিসের!

বাদল বলল: এত দূরের পথ, তারপর সমুদ্রযাত্রা! সঙ্গে একজন ডাক্তার থাকলে বেশ নিশ্চিন্ত মনে যাওয়া যায়।

বিন্দু বলল: হ্যাঁ, সবাই আমরা রোগে ভুগছি কিনা, তাই সঙ্গে একজন

ডাক্তার না থাকলে ভয় করবেই তো! আসল কথা বল না, ডাক্তারবাবুর চামচোগিরি করে এমন অভ্যেস হয়েছে যে একা বেরোতে তোমার নিজেরই ভয় করে!

বাদল বলল : নিজের জন্যে তো ভয় নয়, ভয় পাঁচজনের জন্যেই। কখন কার কী দরকার হয় তা তো বলা যায় না! আর—

আর কী?

বাদল কিছু লজ্জিতভাবে বলল : আন্দামান থেকে ফেরার সময়ে আমার মনে হয়েছিল—

বাধা দিয়ে বিন্দু বলল : হ্যাঁ ফিরেই একটা নেমন্তন্ন পাওয়া যাবে, তাই না।

বাদল বলল : তোমারও তাই মনে হয়নি?

শুধু আমার কেন, সবারই তো একই ধারণা হয়েছিল।

কিন্তু তার পরের কথা তো জানা যাচ্ছে না!

তারপরেই বাদল খপ্ করে বিন্দুর হাত চেপে ধরে বলল : আমাকে ছুঁয়ে বল তো, নির্মাল্যদি তোমাকে সত্যিই বলেছে যে ডাক্তারবাবু গেলে তিনি যাবেন না?

হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বিন্দু বলল : আমি কি তৈরি করে কোন কথা বলি নাকি?

তাহলে বল, কেন তিনি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যেতে চান না? ডাক্তারবাবু তো আমাকে দেখলেই জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের সবাই যাচ্ছে তো? কবে যাচ্ছি, তাও জানতে চান। তাঁর মনে অন্যরকম ভাব থাকলে তিনিও নিশ্চয়ই আমাকে কিছু বলতেন!

বিন্দু গম্ভীরভাবে বলল : তাঁর ঐ হ্যাংলামির জন্যেই তো নির্মাল্যদি তাঁর সঙ্গে যেতে চান না। বিয়ে করবেন না, অথচ তোমার মতো ছোঁক-ছোঁক করবেন, এ কোন্ দিশি কথা!

বাদল ক্ষেপে উঠল : আমি বুঝি ছোঁক-ছোঁক করি!

বিন্দু বলল : যা কর তা জানতে কারও বাকি নেই। নির্মাল্যদিও বলছিল, প্রেস্টিজ একবার গেলে তা আর জোড়া লাগানো যায় না। বুঝলে?

বলে সে উঠে পড়ল।

সন্ধ্যের অন্ধকার নামছিল গঙ্গার জলে। আর কিছুক্ষণ পরে আঁধারে একাকার হয়ে যাবে আকাশ আর জল। তার আগেই বিন্দুকে বাড়ি ফিরতে

হবে। পথে যেতে যেতে বিন্দু বাদলের হাত ধরে বলল : দু'জনকেই সঙ্গে নিতে হবে বুঝলে, কাউকে রেখে গেলে চলবে না।

বাদল আশ্চর্য হয়ে বলল : তার মানে ?

বিন্দু বলল : মানেটা পরিষ্কার, তাঁরা দু'জন থাকলে আমাদের ওপরে কারও নজর পড়বে না।

লাক্ষা দ্বীপ সম্বন্ধে বাদলের কোন ধারণাই ছিল না। ভূগোলে নাকি এই দ্বীপের নাম আছে ; কিন্তু স্কুলে পড়া ভূগোল সে অনেককাল আগেই হজম করে ফেলেছে। এখন শুধু ভূগোল শব্দটারই ঢেকুর ওঠে, আর কোন কথাই মনে পড়ে না। আন্দামান থেকে ফেরার সময়ে বিন্দু নির্মাল্য মিশ্রকে নাকি বলেছিল যে জাহাজে এই যাত্রা তার খুব ভাল লেগেছে। এ কথার উত্তরেই নির্মাল্য মিশ্র তাকে বলেছিলেন, সামনের বছর তাহলে লাক্ষা দ্বীপে ঘুরে এসো।

বিন্দু বলেছিল, সে আবার কোথায় ?

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বলেছিলেন, বিদেশে নয়, এ আমাদের দেশেরই একটা রাজ্য, আন্দামানের মতো ইউনিয়ন টেরিটরি। তবে ট্যুরিস্টের অত্যাচার শুরু হয়নি বলে অনেক বেশি এনচ্যান্টিং বলে শুনেছি। জাহাজে চেপেই অনেকগুলো দ্বীপ দেখে আসা যায়।

বিন্দুর কাছে লাক্ষা দ্বীপের নাম শুনে বাদল খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করে। প্রথমেই জানতে পারে যে এই দ্বীপপুঞ্জটি বঙ্গোপসাগরে নয়। এ আরব সাগরে। সমুদ্র এখানকার মতো উত্তাল নয়, সাধারণত শান্ত। আর দূরত্বও আন্দামানের মতো নয়, অনেক কম। কেরালার কোন বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ে। কেউ বলেছিলেন কালিকট থেকে, কেউ কোচিন থেকে বলেছিলেন। এ কোন সমস্যার কথা নয়। বাদল বুঝে নিয়েছিল যে ট্যুরিস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ-খবর নিলেই সব জানতে পারা যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারও দরকার হয়নি। এক বন্ধু সরকারী কাজে কোচিনে যাচ্ছিল, বাদল তাকে বলেছিল খোঁজ নিয়ে আসতে। সে শুধু খোঁজই নেয়নি, কাগজপত্র যা সংগ্রহ করে এনেছিল, তার ওপরে ভিত্তি করে সে প্রায় সব ব্যবস্থাই পাকা করে ফেলেছে। শুধু দিন ঠিক করতে বাকি। চিঠি লিখেই জাহাজে বুকিং করা সম্ভব হবে।

লাক্ষা দ্বীপের সাপ্লাই এণ্ড ট্রান্সপোর্ট অফিসারের অফিস কোচিনের উইলিংডন আইল্যাণ্ডে হারবার রোডের ওপরে। সেক্রেটারি স্পোর্টস-এর

সঙ্গে যোগাযোগ করেই বুকিং করা যাবে। চিঠি লেখার জন্যে পিন কোড আছে ৬৮২০০৩, আর টেলিফোন আছে কথা বলার জন্যে ৬৩৭৪ ও ৬৩১১। নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত যাতায়াতের জন্যে আটচল্লিশটা ভয়েজের পুরনো শেড্যুল তার হাতে এসেছে। সব শেড্যুল একরকম নয়। চার বা পাঁচ দিনে তিন চারটে দ্বীপে ঘুরে আসা যায়! ইচ্ছে করলে সাতটা-আটটা দ্বীপ দেখাও সম্ভব। ব্যাপারটা আন্দামানের মতো মোটেই নয়। লাক্ষা দ্বীপের জাহাজে গেলে আন্দামানের মতো মোটেই নয়। লাক্ষা দ্বীপের জাহাজে গেলে আন্দামানের জাহাজের মতো পোর্টব্লেয়ারে নামিয়ে দেয় না ধর্মের নামে। তারপর আর কোন দ্বীপে যাবার ব্যবস্থা নেই। তার জন্যে ভি আই পি হতে হবে কিংবা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়তে হবে কোন একটা খবর পেলেই। ফেরার ব্যাপারটা তাহলে ছেড়ে দিতে হবে মা দুর্গার ওপরেই। কিন্তু লাক্ষা দ্বীপে জাহাজের টিকিট কেটেই নিশ্চিন্ত। একই জাহাজে ঘুরে ঘুরে কয়েকটা দ্বীপ দেখা যাবে—জাহাজ কোন দ্বীপে নোঙর ফেললেই সেই দ্বীপটা দেখে ঘুরে এসে আবার অন্য দ্বীপে যাত্রা। ভারি মজার ব্যাপার। বাদলের উৎসাহ তাই শতগুণ বেড়েছে।

বিন্দু বলে যে নির্মাল্য মিশ্র নাকি আরও একটা অসাধারণ কথা বলেছেন। তাঁর মতে ভূতাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এক সময়ে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল, হয়তো ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গেও। কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই স্থান সমুদ্রগর্ভে ডুবে গেছে, সমুদ্রের ওপরে জেগে আছে শুধু গিরিশৃঙ্গের মতো উঁচু ভূখণ্ডগুলি। মনোযোগ দিয়ে মানচিত্র দেখলেই আন্দামান ও নিকোবরের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা ও যব দ্বীপ যে এক সময়ে যুক্ত ছিল, তা বোঝা যাবে। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যব দ্বীপের সংস্কৃতির মিল দেখে একালের পণ্ডিতরা ধরে নিয়েছেন যে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে যব দ্বীপের যোগ ছিল সমুদ্রপথে। কিন্তু তারও বহু আগে এই দেশগুলি যে স্থলপথে যুক্ত ছিল, সে সম্ভাবনার কথা তাঁরা ভেবে দেখেননি।

কিন্তু না, এ নির্মাল্য মিশ্রর নিজের ধারণার কথা নয়, এ আরও অনেকের ধারণার কথা। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র যে নতুন কথা বলেছিলেন বিন্দুকে, সে বোধহয় তাঁর নিজস্ব চিন্তা-কথা। নির্মাল্য মিশ্র মনে করেন যে, কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আন্দামান ও নিকোবর ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং সেই বিপর্যয়েই লংকাও বিচ্ছিন্ন হয়েছে কোন বিরাট ভূখণ্ড

থেকে। তাঁর অনুমান যে বর্তমান শ্রীলংকা থেকে আফ্রিকার উপকূলে মালাগামি পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড ছিল রাক্ষসরাজ রাবণের রাজ্য। ভারত মহাসাগরের উত্তরে অবস্থিত মাল দ্বীপপুঞ্জও এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বর্তমানের স্বাধীন দেশ মাল দ্বীপের নাম ছিল বোধহয় মলয় দ্বীপ। মলয় পর্বত নাম আছে রামায়ণে ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। এইসব প্রাচীন গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে পড়লে হয়তো প্রাচীন সংস্কৃতির মিলও খুঁজে পাওয়া যাবে। এখনও অনেকে মনে করেন যে শ্রীলংকার অধিবাসীদের সঙ্গে মাল দ্বীপের অধিবাসীদের ভাষায় ও সংস্কৃতিতে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

নির্মাল্য মিশ্র বিন্দুকে বলেছিলেন, লাক্ষা দ্বীপে গেলে সবচেয়ে দক্ষিণের মিনিকয় দ্বীপে নিশ্চয়ই যেও। মিনিকয়ের সঙ্গে মাল দ্বীপের মিলন আছে কিনা খুঁজে দেখতে হবে। মাল দ্বীপের রাজধানী ম্যালেতে উড়ে যাওয়া যায় ম্যাড্রাস থেকে। কলম্বো আর ম্যালে এক যাত্রাতেই দেখা সম্ভব। কিন্তু মিনিকয়ে সেভাবে যাওয়া যায় না।

নির্মাল্য মিশ্র বলেন যে, ভ্রমণ ব্যাপারটা ঠিক অবসর বিনোদনের জন্য নয়। এর একটা শিক্ষাগত দিক আছে, সেটা উপেক্ষা করা উচিত নয়। পুরাকালের মানুষ তো ভ্রমণ করেই শিক্ষালাভ করত। তাই দেশের নানা স্থানে তীর্থযাত্রার নিয়ম ছিল। তীর্থে গিয়েই সেকালের মানুষ জ্ঞান আহরণ করত। কিন্তু একালে আমরা একথা মনে রাখি না বলেই নতুন কিছু জানতে পারি না। নির্মাল্য মিশ্র বলেন, চোখ কান খুলে রেখে বাড়ির বাইরে বেরোবে। সম্ভব হলে পড়াশুনো করবে অনেক আগে থেকে। তাতে উপরি লাভ হবে বেড়ানোর। আনন্দ ও অভিজ্ঞতার ঝুলি ভারি হবে।

বিন্দুর কাছে নির্মাল্য মিশ্র আরও অনেক কথা বলেছিলেন। বিন্দুর খোঁজে বাদল এসে পড়েছিল বলে সে নিজেই সেসব কথা শুনেছে। কথা হচ্ছিল জাহাজেই। ডাক্তার হিমাংশু মৈত্রও ছিলেন। তিনি খানিকটা তফাতে একখানা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পাইপ টানছিলেন। সামনে অকূল সমুদ্র। এই সমুদ্র পেরিয়ে তাঁরা আন্দামানে গিয়েছিলেন। সমুদ্র পেরিয়েই তাঁরা ফিরছিলেন। বাদলকে দেখতে পেয়ে নির্মাল্য মিশ্র হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন ঃ তুমি তো রামায়ণ পড়েছ ?

বাদল বলল ঃ পড়েছি।

কত বছর বয়সে পড়েছ ?

ছেলেবেলায়।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বড় হবার পরে মানে স্কুল-কলেজ ছাড়ার পর কি আর পড়নি ?

বাদল আমতা আমতা করে বলল ঃ আজ্ঞে না।

তার মানে ছোটদের জন্যে লেখা রামায়ণই তুমি পড়েছ। মূল রামায়ণ মানে বাল্মীকির রচনা বলে প্রচলিত রামায়ণ বা তার অনুবাদ তুমি পড়নি, এই তো ?

বাদল চুপ করে রইল, বিন্দুও কোন কথা বলল না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ একটা কথা কি তোমার মনে আছে যে হনুমান এক লাফে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় পেঁাছেছিল ?

বাদল বলে ঃ মনে আছে।

কিন্তু একথা কি একবারও তোমার মনে হয়েছে যে এক লাফে সমুদ্র পার হওয়া সম্ভব নয় !

বাদল এ কথার কোন উত্তর দিল না দেখে নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ না, মনে হয়নি। অর্থাৎ যে বয়সে রামায়ণ পড়েছ, তখন রাক্ষস-খোক্কস যেমন বিশ্বাস করতে, তেমনি ভূত-পেত্নীও বিশ্বাস করতে। আর যখন বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করতে শিখলে, তখন রূপকথার মতো রামায়ণকেও বাতিল করে দিলে। কিন্তু রামায়ণ যে রূপকথা নয়, রামায়ণ অযোধ্যার একজন রাজপুত্রের বনবাসের কথা, তা বোধ হয় বোঝবারও কোন চেষ্টা কখনও করনি। করলে তোমার জানতে ইচ্ছে হত যে রাম কোন্ পথে লঙ্কায় গিয়েছিলেন। কোন্ পথে রাবণ বা রাক্ষস নামে পরিচিত মানুষেরা লঙ্কা থেকে এদেশে যাতায়াত করত। তুমি হয়তো বলবে যে রাবণের পুষ্পক রথ ছিল, সেই রথ আকাশে উড়ত। হনুমানের মতো লাফিয়ে বা উড়ে সমুদ্র পার হতে পারত রাবণের পুষ্কপ রথ। এই তো ?

বাদল কোন কথা কইল না। বিন্দু বলল ঃ পুষ্পক রথ কি আকাশে উড়ত না নির্মাল্যদি ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ সে অন্য প্রশ্ন। বিমান বলতে কী বোঝাত তা একালের বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধান করে বলার কথা। কিন্তু আমি যে কথা বলতে চাইছি, তা হ'ল অন্য কথা। রাবণ এই পুষ্পক রথ কুবেরের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। অর্থাৎ দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে রাবণ হিমালয়ের কৈলাসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেখানেই কুবেরকে জয় করে এই পুষ্পক রথ পেয়েছিলেন। ঠিক তো ?

বাদল মাথা নাড়ল। আর নির্মাল্য মিশ্র বললেন তাহলে স্বীকার করলে যে রাবণ আগে সমুদ্র পার হতেন অন্য উপায়ে। নৌকো বা জাহাজের কথা রামায়ণে নেই। সাঁতার কেটে সমুদ্র পার হবার কথাও নেই। তার মানে স্থলপথেই যোগাযোগ করা যেত। সুর্পনখার নাক কাটা যাবার পর সেও দণ্ডকারণ্য থেকে লংকায় রাবণের কাছে নালিশ করতে গিয়েছিল। তাই না?

বিন্দু বলল: হ্যাঁ।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আমার দুঃখ হয় এইজন্যই যে, এই স্থলপথ কোথায় ছিল তা জানবার আমরা কোন চেষ্টা করিনি। এ নিশ্চয়ই রাক্ষসদের পরিচিত একটা গুপ্তপথ। হনুমান জানত না বলেই তাকে লাফিয়ে সমুদ্র পার হতে হয়েছিল বলা হয়েছে, আর রামকে সেতু নির্মাণ করতে হয়েছিল সমুদ্রের ওপরে। এই সেতু নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে আন্দামান হয়ে লংকায় পেঁছয়নি, এই সেতু কিছু পাথর ফেলেই সমুদ্র পার হবার উপযুক্ত করা হয়েছিল।

বাদল বলল: তাই হবে। রামেশ্বরমে যাবার পথে নাকি সমুদ্রে অনেক পাথর দেখতে পাওয়া যায়, তাই না বিন্দু? জায়গাটার নাম যেন কী?

বিন্দু বলল: মণ্ডপম্ না পাম্বন্ ঠিক মনে নেই।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এ কথা কেউ তোমাদের বলেছে, তাই তোমরাও বলছ। কিন্তু নিজেরা কিছু ভেবে দেখেছ কি?

বাদল ভয়ে ভয়ে বলল: না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: নিজেরাও স্বাধীনভাবে যে কিছু ভাবা যায়, তা ভাবতেও আমরা ভুলে গেছি। তাই রামায়ণ থেকে কোন ক্লু উদ্ধারের চেষ্টা করি না। রামায়ণেই আছে যে কিষ্কিন্ধ্যা থেকে যাত্রা করে রাম সহ্য ও মলয় পর্বত হয়ে মহেন্দ্রগিরি থেকে লংকা দেখতে পেয়েছিলেন। সহ্য পর্বত হ'ল পশ্চিমঘাট আর মলয় পর্বত মালাবার। পরশুরামের বাস ছিল মহেন্দ্র পর্বতে। তিনি নাকি তাঁর শিষ্যদের জন্য গোমন্তক দেশ মানে বর্তমান কালের গোয়া সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে শিষ্যদের দিয়েছিলেন। লোকে বলে যে তিনি নাকি তাঁর কুঠার ছুঁড়লেন আর সেই কুঠার যেখানে পড়ল, সেখান থেকে সমুদ্র সরে গেল। ব্যাপারটা কি বিশ্বাসযোগ্য? না, বলা যায় যে সমুদ্র থেকে নতুন মাটি জেগেছে দেখে তিন তাঁর শিষ্যদের সেইখানে বাস করতে বললেন?

বিন্দু বলল: এই কথাই ঠিক।

আর নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তাহলে এ কথাও ঠিক যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কোন পরিবর্তন হয়েছিল পরশুরামের আমলে। তার মানে রামায়ণের কালে এ জায়গাটা অন্য রকম ছিল। মলয় পর্বতের সঙ্গে মাল দ্বীপের কোন সংযোগ ছিল কি? মাল দ্বীপই কি মলয় দ্বীপ নামে পরিচিত ছিল না? মহেন্দ্র পর্বত কোনটা বা কোথায় গেল? বর্তমানের শ্রীলংকার সঙ্গে কি মাল দ্বীপের বা মালগাসির কোন যোগ ছিল না? কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কি এই অঞ্চলের চেহারাটা বদলে যায়নি? এসব প্রশ্ন কি কারও মনে আসে না?

একটু থেকে নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তোমরা পরের বারে লাক্ষা দ্বীপে যাবার কথা ভাবছ বলেই আমি তোমাদের এইসব ভাবনার কথা বললাম। দেশের কোন ভৌগোলিক বা ভূতাত্ত্বিককে এই কথা জিজ্ঞেস করবে কি? কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে কি জানবার চেষ্টা করবে আমাদের পুরাণে এই রকম প্রশ্নের কোন উত্তর আছে কিনা? ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে নাকি দেশের প্রাচীন ভূগোল আছে। সেখানে কি আমার এই প্রশ্নের কোন উত্তর মিলবে না?

বাদল ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বেড়াবার কথায় যদি এই ধরনের কথা উঠে পড়ে তো ভাবনারই কথা। ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র রাগী মানুষ, কিন্তু পাগল নন। আর এই নির্মাল্য মিশ্রর মেজাজ ঠাণ্ডা, কিন্তু এ কি এক ধরনের পাগলামি নয়? দুজনকে নিয়েই বিপদ। বাদল এঁদের দুজনকেই ভয় পেতে শিখেছে গতবারের অভিজ্ঞতায়। কিন্তু বিপদ হয়েছে বিন্দুকে নিয়ে। সে ভক্ত হয়ে গেছে নির্মাল্য মিশ্রর। এমন ভক্ত যে তাঁকে সঙ্গে নিতেই হবে, আবার ডাক্তারবাবুকেও চাই। ডাক্তারবাবু উকিলের নাম শুনলে ক্ষেপে যান। আর উকিল ডাক্তারবাবুর নামে। আন্দামান থেকে ফেরার পথে মনে হয়েছিল যে বিপদ বোধহয় কেটে গেছে, অর্থাৎ দুজনের মধ্যে আর কোন বিরোধ নেই। অন্তত বিন্দু তাকে এই কথাই বুঝিয়েছিল। বলেছিল, দেখে নিও।

বাদল বলেছিল, কী দেখব?

বিন্দু রহস্যময় চোখে তাকিয়ে বলেছিল, বিয়ের নেমন্তন্ন পেলেই আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে।

বিন্দু এ কথা জাহাজেই বলেছিল। আর বাদল সেই থেকে অপেক্ষা করে আছে। বহু দিন কেটে গেল, কিন্তু নেমন্তন্ন দূরের কথা, দুজনের দেখাসাক্ষাৎ হয় কিনা সে সম্বন্ধেও সংশয় জমেছে। বিন্দু তবু বলে, তুমি

দেখে নিও। একাদশী বৈরাগীরা যে ডুবে ডুবে জল খায়, ওপর থেকে তুমি জানবে কেমন করে!

তাই বাড়ি ফেরার পথে বাদল ভাবল যে সংশয় রেখে আর লাভ কী? বিন্দুকে নিয়েই নির্মাল্য মিশ্রর বাড়ি একবার চলে যায়, খোলাখুলিভাবে জানতে চায় তাঁর আপত্তির কারণ। সরলভাবে জানতে চাওয়াই ভাল। উকিল মানুষের সঙ্গে চালাকি করতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। জেরা করে পেটের সব কথা বার করে নিয়ে ঝুলিয়ে দেবে কাঠগড়ায় চড়িয়ে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে বিন্দু জিজ্ঞেস করল: কী ভাবছ?

বাদল বলল: তোমার কথাই ভাবছি?

আমার কথা!

হ্যাঁ, তোমার কথা। সবার কাছেই যেন চোর হয়ে আছি। কেন, কী পাপ করেছি আমি! কটা দিন তোমার সঙ্গে কাটাবার জন্যে কেন আমাকে এই ধান্ধা করতে হবে!

বিন্দু বলল: তোমাকে চোর হতে বলেছে কে? চুরির মতলব ছেড়ে দাও না! দেখবে সব সরল হয়ে গেছে, আর কোন ধান্দাবাজির দরকার হবে না!

বাদল ফোঁস করে বলল: সবই তো তোমার জন্যেই। তুমি রাজি হয়ে দেখ, আমি কী করি! বুক ফুলিয়ে তোমাদের বাড়ি ঢুকে বলব—

বিন্দু বাধা দিয়ে বলল: যা বলবে তা আমি জানি। তোমার সাহস তো দেখছি! নির্মাল্যদিকেই রাজী করাতে পারলে না বেড়াতে যাবার জন্যে!

বাদল বিরক্ত হয়ে বলল: ঘুরে ফিরে নির্মাল্যদির কথা। কেন, কী দরকার নির্মাল্যদির? তাঁকে না হলে কি আমাদের বেড়ানো আটকে থাকবে?

বিন্দু বলল: তাহলে ডাক্তারবাবু না হলেও আমাদের বেড়ানো আটকাবে না!

ঠিক এইসময়ই সদানন্দবাবুকে দেখা গেল রাস্তার পাশে। তিনি একটু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে বোধহয় কথা বলছিলেন। ছোটমেয়ে বিন্দুকে বাদলের সঙ্গে দেখতে পেয়ে বললেন: আমিও বোধহয় এবারে যেতে পারব না। তাই বলে কি তোমাদের বেড়ানো আটকাবে?

বলে বাদলের পিঠে একটা হাত রাখলেন।

বাদল ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল। বলল: সে কি কথা! আপনি সঙ্গে না থাকলে তো সব মাটি। আপনাকে না নিয়ে কোথাও যাবার কথা ভাবাই যায় না।

বিন্দু চোখের ইসারায় বাদলকে সতর্ক করে দিলে যে এর বেশি কিছু বলা উচিত হবে না। তারপরেই বলল: তুমি কেন যেতে পারবে না বাবা?

সদানন্দবাবু বললেন: এবারে আমি ছুটি পাব না।

বিন্দু বলল: আমারও একটু অসুবিধা আছে বাদলদা। এবারে তোমরাই ঘুরে এসো।

বলে সে তার বাবার সঙ্গে জোরে জোরে পা ফেলে বাড়ির দিকে চলে গেল। বাদল মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর নিজের বাড়ির পথ ধরল।

বাদলরা আজকাল পুজোর ছুটিতে ভ্রমণে বার হয় না। তাদের ধারণা হয়েছে যে মাথা খারাপ না হলে এই সময়ে কেউ ঘরের বাইরে বেরোবার কথা ভাবে না। এক সময়ে হয়তো পুজোর সময়ে বেড়ানোর একটা বিশেষ ধরনের আনন্দ ছিল। ছুটি পাওয়া যেত লম্বা। আবহাওয়া ভাল থাকত এবং রেলভ্রমণে অনেক সুবিধা সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু দিনকাল বদলে গেছে। ছুটির দিন এখন গোনাগুনতি। স্কুলকলেজের ছেলেমেয়েরাও পড়ায় ব্যস্ত থাকে। আবহাওয়া প্রায়ই খারাপ থাকে, মলমাস না থাকলে পুজোর সময়ে বর্ষা শেষ হয় না। আর রেল কোম্পানি? যারা তিন মাস আগে টিকিট কাটে, তাদের কথা আলাদা; কার সাধ্য যে দশজনের সুবিধে বিবেচনা করে সময়মতো টিকিট সংগ্রহ করে! তারপর ট্রেনে ওঠা? ছেলেবেলা থেকে জুজুৎসু আর ক্যারাটের প্যাঁচ শেখা না থাকলে রেলের সংরক্ষিত আসন অধিকার করাও সম্ভব নয়। তারপর বাসস্থানের ব্যবস্থা! গাছতলায় রাত কাটানোর অভ্যাস থাকলেই নির্ভয়ে বেরোনো যায়। পথিকের সেই পুরনো আশ্রয় বড় শহরে না জুটলেও শহরের বাইরে তা পাওয়া যায়। এইসব অভিজ্ঞতা হবার পর বাদলরা পুজোর সময়ে ঘরের বাইরে বেরোনো বন্ধ করেছে। পুজোর কটা দিন এখন তারা মা দুর্গার প্যাণ্ডেলে বসে ভ্রমণের সূচী তৈরি করে পুজো আর বড়দিনের ছুটির মাঝখানে। তখন ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত বাঙালি বাড়ি ফিরে এসে বেরোবে না বলে প্রতিজ্ঞাবন্ধ হয়েছে, আর ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে বলে বাপ-মায়েদের বাড়ির বাইরে বেরোবার উপায় নেই। তাই বাদলরা বেরোতে চায় ভাইফোঁটার

পর বোনের বাড়িতে ভরপেট খেয়ে। কিন্তু এবারে বোধহয় বেরনো আর হ'ল না। বিন্দুর কথাতেই বাদল ঝিমিয়ে পড়েছে বেশি, কাউকে রাজী করাবার উৎসাহ আর পাচ্ছে না। বিন্দুরই যখন আপত্তি আছে, তখন কার জন্যে সে চেষ্টা চালাবে!

দিন কয়েক পরে তারাপদর সঙ্গে দেখা হতেই সে জিজ্ঞেস করল: কিরে বাদল, যাত্রার দিন ঠিক হ'ল?

বাদল বিমর্ষভাবে বলল: দিন ঠিক করে করব কী? কারও তো উৎসাহ দেখছি না।

তারাপদ আশ্চর্য হয়ে বলল: সে কি। আমরা যে অপেক্ষা করে আছি। আর দিদি বলছে—

কী বলছে?

বলছে, তোকে একদিন ধরে আনতে। শীত বেশি পড়লে লটবহর বাড়বে যে!

বাদল বলল: সবই তো বুঝি, কিন্তু কে কে যাবে তাই তো ঠিক হয়নি!

তারাপদর বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বাদল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই তারাপদ চমকে উঠে বলল: কেন, আমরা কয়েকজন তো আছি! আর বেশি লোকের দরকার কী! তোর তো ট্রাভেল এজেন্সি নয় যে বেশি যাত্রী হলেই বেশি লাভ! বরং দল ছোট হলেই ঝামেলা কম।

বাদল সদানন্দবাবুর কথা বলতে পারল না। বললেই বিন্দুর কথা উঠে পড়ত। তাই বলল: বিপদ হয়েছে নির্মাল্যদিকে নিয়েই।

কেন?

সে অনেক কথা।

তবে চল্, আমাদের বাড়িতে বসেই সব কথা বলবি।

এ সময়ে বাদলের কোন কাজ নেই। সদানন্দবাবুর বাড়ির দিকে যাওয়া যায় না। আর বিন্দু গা ঢাকা দিয়ে আছে। তাই বাদল তারাপদর বাড়িতেই চলে এল। তখন তারাপদর দিদির কথা তার মনে হয়নি, হলে একটু সাবধান হত। বিধবা মানুষ, কিন্তু দৃষ্টি খুব প্রখর এবং মুখে স্পষ্টবাদী। সত্যি কথা বলতে দ্বিধা করেন না একটুকুও। তারাপদর দিদিই বাড়ির দরজা খুলে দিলেন এবং তারাপদর সঙ্গে বাদলকে দেখেই বলে উঠলেন: এ কি ভাই, আজ পথ ভুলে দিদির কাছে নাকি! বিন্দুর কী হয়েছে?

তারাপদ তাড়াতাড়ি বলল: ওকে আক্রমণ করো না দিদি, আজ আমিই ওকে ধরে এনেছি। অনেক কথা আছে ওর সঙ্গে।

দিদি বলল : তাহলে বোসো দু'জনে। চা আনছি।

তারাপদ বলল : আর চায়ের সঙ্গে টা।

কী খাবে বল।

বলে বাদলের মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল : মুড়ির সঙ্গে তেলেভাজা।

দিদি বললেন : তবু ভাল যে চপ-কাটলেট বলনি! তাহলে তারাকেই দোকানে ছুটতে হত।

দিদি সরে যেতেই তারাপদ বলল : যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফেল্। দিদি এসে পড়লেই সব গুলিয়ে ফেলবি।

বাদল বলল : কী বলছিলাম যেন।

বলছিলি নির্মাল্যদির কথা।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ডাক্তারবাবু গেলে নির্মাল্যদি যাবেন না। অথচ ডাক্তারবাবুকে না নিয়ে কী করে যাই বল্। তাঁর চেম্বারের সামনে দিয়ে যাতায়াত করি। দেখা হয় দু'বেলা। অসুখে-বিসুখে তিনিই আমাদের ভরসা। আর ভদ্রলোকের শখও আছে। দিলও আছে। যেদিন মুডে থাকবেন, সেদিন সবাইকে খাইয়ে দেবেন নিজের খরচে।

তারাপদ বলল : তবে নির্মাল্যদিকেই বাদ দে না! কী দরকার তাঁর খোশামোদ করবার।

ভেতর থেকে তারাপদর দিদির গলা শোনা গেল : তাকে বাদ দেওয়া চলবে না।

কেন?

তাঁকে বাদ দিলে সবই ভেস্তে যাবে। তোমরা অন্য কোনও উপায় ভাবো।

তারাপদ বাদলের মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল : দলের কাউকে ফেলে যেতে ইচ্ছে করে না। এদিকে সদানন্দদাও বলছেন—

বলেই বাদল থেমে যেতেই তারাপদ বলল : কী বলছেন বল!

তাঁর নাকি ছুটি পাবার অসুবিধে।

ভেতর থেকে তারাপদর দিদি বললেন : এটাই ভাবনার কথা। উনি যেতে না পারলে এত দূরে যাবার কথাই ওঠে না। তারা, সকলের আগে সদানন্দদার কথাই তোমরা ভাবো।

বাদল বলল : সদানন্দদার তো মান-অভিমানের ব্যাপার নয় যে তাঁকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে! ছুটি পেলে তিনি যাবেন, না পেলে যেতে পারবেন না। আর ছুটির জন্যে তিনি চেষ্টাও করবেন।

ভেতর থেকে তারাপদর দিদি বললেন : কিন্তু তিনি যেতে না পারলে বিন্দুর যাওয়াও আটকে যাবে।

বলেই বোধহয় কড়ায়ের ফুটন্ত তেলে ফুলুরি ছেড়ে দিলেন পর পর কয়েকটা। সেই শব্দে আর কিছু শোনা গেল না।

বাদল বলল : বিন্দুর জন্যে ভাবি না। সদানন্দদা গেলে বিন্দু যাবে। না গেলে যেতে পারবে না, যাওয়া উচিতও নয়।

কড়ায়ের শব্দ কিছু কমে এসেছিল। তাই তারাপদর দিদির গলা পুনরায় শোনা গেল। দিদি বললেন, এসব কথা আর কাউকে বোলো ভাই। বিন্দুর সঙ্গে গোলমালটা কী নিয়ে হয়েছে তা জানতে পারলে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

তারাপদ বলল : দিদি ঠিকই বলেছে। আমাদের কাছে সত্যি কথা লুকোচ্ছিস কেন? খোলাখুলি বল না কী করতে হবে।

বাদল বলল : তোরা আমাকে ভুল বুঝছিস। তোদের কাছে আমি কিছুই গোপন করিনি, আর যা বলেছি তার সবই সত্যি।

তারাপদ বলল : তবে বোস্, আমি হাত-পা ধুয়ে আসছি।

বলে তারাপদ ভেতরে চলে গেল।

বাদলের মনে হ'ল যে ভ্রমণের শখ বড় বিচিত্র। একা ভ্রমণ করতে ভাল লাগে না, ঘর ছেড়ে একা বেরোবার কথা যেন ভাবাই যায় না। অন্তত একজন সঙ্গী চাই। আর সেই সঙ্গী যদি নিতান্ত অন্তরঙ্গ হয়, তাহলে দ্বিতীয় সঙ্গীর বোধহয় দরকারই নেই। মনের মতো একজন সঙ্গী থাকলে বাদলকে আজ ভাবতে হত না, কারও দ্বারস্থ হতে হত না তাকে।

সেবারে তারা আন্দামানে গিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল যে ম্যাড্রাস হয়ে ফিরবে। কিন্তু পাকেচক্রে তা সম্ভব হয়নি। আন্দামান থেকে সরাসরি কলকাতায় ফিরে আসতে হয়েছিল। তাই এবারে তারা দক্ষিণ ভারতে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে রাত এগারোটায় ধরবে একটা নতুন ট্রেন। এই ট্রেন গৌহাটি থেকে ত্রিবান্দ্রামে যায় এর্নাকুলম হয়ে। ভোর চারটেয় মিনিট কুড়ির জন্যে থামে ম্যাড্রাসে। আর সন্ধেবেলায় এর্নাকুলম। এর্নাকুলম মানেই কোচিন। জোড়া শহর। আরব সাগরের তীরে এর্নাকুলম কেরল রাজ্যে, আর কোচিন একটা দ্বীপে। মাঝখানে নাকি উইলিংডন নামে আর একটা দ্বীপ। সবই সড়কপথে যুক্ত। রেলপথও আছে। আবার নৌকো ও মোটরলঞ্চও চলে। কোচিন থেকে ছাড়ে লাক্ষা দ্বীপের জাহাজ। বেশি

নয়, চার পাঁচ দিনেই অনেকগুলো দ্বীপ অনায়াসে দেখে আসা যায়। তারপরে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটা জায়গাও দেখা যাবে। এর্নাকুলম থেকে বাসে বা নৌকোয় চেপে ব্যাকওয়াটার ক্যানাল বেয়ে অ্যালেপ্পি, সেখান থেকে ভেম্বানাড লেকের ওপরে কোট্টায়াম। কোট্টায়াম থেকে বাসে পেরিয়ার, তারপর স্যাঙ্কচুয়ারি দেখে কন্যাকুমারী। রামেশ্বর মাদুরা ত্রিচি হয়ে ম্যাড্রাস। সময় থাকলে কিংবা ইচ্ছা হলে আরও কয়েক জায়গায় নামা যেতে পারে। কিন্তু সব যেন কী রকম ওলোটপালোট হয়ে গেল। এত দূরে এগোবার পর পিছিয়ে আসতে ইচ্ছে করছে না বাদলের। কিন্তু এগোবার যেন উপায় নেই।

বাদল বোধহয় আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। তাই তারাপদ ফিরে এসেই বলে উঠল : ও কি রে, অমন হাঁড়িমুখে বসে কী ভাবছিস, বল তো!

বিন্দুর কথা বলে তার দিদিও এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে একখানা ট্রের ওপরে দু'বাটি মুড়ি আর একটা প্লেটে অনেকগুলো তেলেভাজা, বেগুনি ও বেসনের বড়া। দু' কাপ চা-ও আছে। দেওয়ালের গায়ে ছোট একটা টেবিলের ওপরে ট্রেখানা রেখে দিদি বললেন : নাও ভাই, হাসিমুখে খেতে আরম্ভ কর, বিন্দুকে রাজী করবার ভার আমি নিলাম।

বাদল বলে উঠল : বিন্দুকে নিয়ে বিপদ নয় দিদি, বিপদ আর সবাইকে নিয়ে।

দিদি বললেন : তাহলে নির্মাল্যদিকে রাজী করাবার ভার বিন্দুকেই দাও।

সে চেষ্টা কি বিন্দু করেনি! তার কাছেই তো জানলাম যে ডাক্তারবাবু গেলে নির্মাল্যদি যাবেন না।

তুমি নিজে তাঁকে বলে দেখেছ?

বলে তারাপদ বাদলের দিকে তাকাতে বাদল বলল : আমার সঙ্গে নির্মাল্যদি কথা বলতেই চাননি।

কেন?

আমরা নাকি মজা দেখবার জন্যে তাঁকে সঙ্গে নিতে চাই। শোন কথা! অথচ তিনি সঙ্গে থাকলে যে কত রকমের নতুন কথা জানা যায় তা তো সবাই দেখেছ। আন্দামান থেকে ফেরার সময়েই বলছিলেন যে রাম-লক্ষ্মণ লঙ্কায় গিয়েছিলেন পশ্চিমঘাট পর্বতের পথ ধরে। কেরলের কোনও পর্বতের নাম মলয় পর্বত। না মাল দ্বীপে ছিল মলয় পর্বত। তা তার কাছেই জানা যেত।

তারাপদর দিদি বললেন : এসব পুরনো কথা কি এখন জানা সম্ভব!

বাদল বলল ঃ নির্মাল্যদি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারেন। মোটা মোটা বই চক্ষের নিমেষে শেষ করে ফেলতে পারেন দেখেছি। কখন কোন সময়ে কেমন করে সেইসব বই পড়েন, তা নাকি ভেবে পাওয়া যায় না। বিন্দু তো তাঁর কাছে যাতায়াত করে। বলে, ভদ্রমহিলার আশ্চর্য ক্ষমতা। বিন্দুকে বলেছেন, কোনখান থেকে একখানা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ জোগাড় করে দিতে, আর একখানা সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার বড় ম্যাপ। রাতে নাকি বাল্মীকির মূল রামায়ণ পড়ছেন।

তারাপদর দিদি একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে বললেন ঃ এর মানে তো খুবই পরিষ্কার।

কী মানে ?

যাবার জন্যে তিনি তৈরি হচ্ছেন।

কিন্তু বাদল বলল ঃ তৈরি হচ্ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কোন কারণে হঠাৎ বেঁকে বসেছেন।

তারাপদ বলল ঃ এই কারণটাই জেনে নিতে হবে।

দিদি বললেন ঃ ডাক্তারবাবু আপত্তির কারণ নিশ্চয়ই নন।

কেন ?

তিনি যে দলে আছেন, সে কথা তো আগেও তাঁর জানা ছিল। আর— বলে হাসতে লাগল তারাপদর দিদি।

তারাপদ একটা গরম পকোড়া মুখে পুরে দিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলল ঃ অমন করে হাসছ কেন ?

দিদি বললেন ঃ আন্দামানে দু'জনের ভাবখানা এর মধ্যেই ভুলে গেলে ! সেই যে জেলখানা থেকে বেরিয়েই ডাক্তারবাবু ক্ষেপে গেলেন নির্মাল্যদি একা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেছেন বলে ! তারপর নিজেও একখানা ট্যাক্সি ধরে হুড়মুড় করে তাঁর পেছনে ছুটলেন !

তারাপদ বলল ঃ পেছনে বোলো না। কারণ নির্মাল্যদি কোথায় গেছেন তা তিনি জানতেন না।

না জানলে দু'জনে একসঙ্গে ফিরলেন কী করে ! দু'জনে তো আলাদা টুরিস্ট বাংলোয় থাকতেন ! ডাক্তারবাবু নিজের বাঙলোয় না গিয়ে নির্মাল্যদিকে আমাদের কাছে পেঁছিতে এসেছিলেন কেমন করে ! নিশ্চয়ই দু'জনের কিছু ঠিক করা ছিল আগে থেকে। আর নির্মাল্যদি একা চলে গেছেন দেখেই ডাক্তারবাবু ওইরকম রেগে গিয়েছিলেন !

তারাপদর দিদি একথা আগেও বলেছিলেন। কিন্তু বাদল মেনে নিতে পারেনি। তার ধারণা যে নির্মাল্যদি সবাইকে ফেলে চলে যাবার জন্যেই ডাক্তারবাবু রেগে গিয়েছিলেন। দিদি বললেন ঃ মনে আছে তো! জাহাজে চেপে ফেরার পথে দু'জনের হাবভাব দেখেও কি বুঝতে পারনি যে তাঁরা কতটা এগিয়ে গেছেন!

তারাপদ বাদলকে বলল ঃ কথাটা মিথ্যে নয় বাদল। আমরা তো ভেবেছিলাম—

বাধা দিয়ে বাদল বলল ঃ কী ভেবেছিলে জানি। পাত পেড়ে বসে খাবার জন্যে জোলাপ পর্যন্ত নিয়েছিলে, এই তো!

তারাপদ বলল ঃ রাগের কথা নয় রে, এ যুক্তির কথা।

তারাপদর দিদি মুখ লুকিয়ে হাসছিলেন।

বাদল বলল ঃ বিয়ের বয়েস ডাক্তারবাবুর পেরিয়ে গেছে।

তারাপদ বলল ঃ কিন্তু বয়সে নির্মাল্যদির সঙ্গে বেশ মানাবে, তাই না?

তারাপদর দিদি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললেন ঃ লাগিয়ে দাও না ভাই!

কিন্তু বাদল বলল ঃ আমার কাঁধে তো একটার বেশি মাথা নেই দিদি যে অমন দুঃসাহসের কাজ করতে এগিয়ে যাব।

দিদি বললেন ঃ তোমরা নিজেরা এগিয়ে যাবে কেন! ঘটক লাগাও, ভাল বিদেয় দেবার লোভ দেখাও ঘটককে। কিংবা—

বল।

ও'দের অভিভাবক খুঁজে বার করে কথাটা কানে তুলে দাও।

তারাপদ বলল ঃ এ পরামর্শটা মন্দ নয়।

কিন্তু বাদল চায়ে চুমুক দিয়ে বলল ঃ ধরা পড়ে প্রাণটা যাক আর কি!

দিদি বললেন ঃ সাহস না থাকলে পুরুষ হয়েছ কেন! একালের মেয়েরাও তোমাদের চেয়ে বেশি সাহসী!

তারাপদ বাদলের মুখের দিকে তাকাল, আর বাদল বলল ঃ পরের ব্যাপারে নাক গলাতে যাবার কোন মানে হয় না।

দিদি বললেন ঃ এইজন্যে নিজেদেরও কিছু হ'ল না। বিন্দু আমল দিচ্ছে না তোমাকে আর তারা তো ঘরের কোণায় মুখ লুকিয়ে রইল। ছিঃ।

বলে তারাপদর দিদি ভেতরে চলে গেলেন।

তারাপদ বলল ঃ সত্যিই ভাই, আমাদের দিয়ে কিছুই হ'ল না। চল্ আজ বেরিয়ে পড়ি।

বাদল ভয় পেয়ে বলল : কোথায় ?

তারাপদ সাহস দিয়ে বলল : না না, সদানন্দদার কাছে নয়। ডাক্তারবাবুর কাছে চল। সবার আগে তাঁকেই খোলাখুলি জিজ্ঞেস করি, তিনি যেতে পারবেন কিনা, কবে যেতে পারবেন।

বাদল বলল : বিকাশ আর ভানুর জন্যে মেডিকেল সার্টিফিকেট চাইতে হবে। তারা ছুটি না পেলে সিক্ রিপোর্ট করবে বলেছে।

তারাপদ বলল : ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে নির্মাল্যদির কাছে যাব। রেখে ঢেকে কোন কথা নয়। পরিষ্কার কথা—যাবেন, কি যাবেন না। ডাক্তারবাবু যা বলবেন, সে কথাও পরিষ্কার জানিয়ে দেব। তারপর সদানন্দদার কাছে। তিনি যেতে না পারলে বিন্দুকে যেতে দিতে আপত্তি কিসের ? নির্মাল্যদি থাকতে পারে, না থাকলে আমার দিদি তো আছেই। একা তো আর যেতে হবে না !

তারাপদর দিদি বেরিয়ে এসে বললেন : এই তো পুরুষমানুষের মতো কথা !

তারপর বাদলের দিকে চেয়ে বললেন, আর আমার কথায় সদানন্দদা রাজী না হলে বলবে, তুমি আছ কী করতে ! দু'দিন পর তুমিই তো তার অভিভাবক হবে বলে ঠিক করেছ, না হয় দু'দিন আগে থেকেই সে ভার নিলে !

কী যা-তা বলছ দিদি !

বলে চায়ের কাপ নামিয়ে বাদল উঠে পড়ল। আর তারাপদ বলল দরজাটা বন্ধ করে দাও দিদি।

একটুখানি এগিয়েই বাদল দেখতে পেল যে জনার্দন পণ্ডিত একখানা রিক্সায় চেপে বাড়ি ফিরলেন। বাদল এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর বলল : পণ্ডিতকে একটা ভাল দিন দেখে দিতে বলব ?

তারাপদ আশ্চর্য হয়ে বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : তোর তো এরকম দুর্বলতা আগে ছিল না !

বাদল একটু লজ্জা পেয়ে বলল : এবারে নানা রকমের বাধা আসছে তো, তাই ভাবছি যে একটা ভাল দিন দেখিয়ে নিলে কেমন হয় !

বলেই সে চেঁচিয়ে উঠল : পণ্ডিতমশাই !

জনার্দন পণ্ডিত ভেতরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন, বললেন : কিহে, কী ব্যাপার ?

বাদল কাছে এসে বলল : একটা ভাল দিন বলবেন ? পশ্চিমে যাত্রার জন্যে ভাল দিন।

জনার্দন পণ্ডিত খুব মনোযোগ দিয়ে বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। বোধহয় বাদলের কাছে এ রকমের কোন প্রশ্নের আশা করেননি। তাই বললেন : তোমরাও কি আজকাল এসব মানছ নাকি ?

বাদল সংক্ষেপে বলল : ঠেলায় পড়ে মানতে হচ্ছে পণ্ডিতমশাই।

হুঁ।

বলে জনার্দন পণ্ডিত বললেন : দুর্গা বলে সামনের সোমবার বেরিয়ে পড়। একটু বেশি রাতে। এই ধর রাত দশটার পরে।

বাদল আশ্চর্য হয়ে বলল : আপনি পাঁজি-পুঁথি না দেখেই বলছেন।

পণ্ডিত বললেন : একটু আগেই এক যজমানের বাড়িতে পাঁজি দেখেছি।

বাদল দেখল যে পণ্ডিতের পা একটু টলছে, বোধহয় 'তারা-তারা' বলে দু'এক পাত্র কারণ পান করে এসেছেন যজমানের বাড়িতে। ব্যাপারটা জানবার জন্যে জিজ্ঞেস করল : কোন্ যজমানের বাড়ি গিয়েছিলেন ?

পণ্ডিত বললেন : সোরকার সাহেবের বাড়ি।

বাদল বলল : বুঝেছি। ওখানে তো কাঁচা টাকার কারবার।

জনার্দন পণ্ডিত তাঁর বুকপকেটে একটা হাত ঠেকিয়ে বললেন : মেমসাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই সাহেবের সঙ্গে দেখা বাইরের বাগানে। একখানা নোট ধরিয়ে বললেন, সোমবার রাতের আগে দিন ফেলবেন না। একটু বেশি রাতে।

কিসের জন্যে দিনক্ষণ ?

মেমসাহেব সত্যনারায়ণের পুজো করবেন।

বাদল বলল : বুঝেছি।

কিন্তু পণ্ডিত একটা ভেংচি কেটে বললেন : ছাই বুঝেছ। রবিবার সন্ধ্যায় সাহেবের একটা পার্টি আছে দিল্লিতে। তাই সোমবারের আগে শুভদিন নেই শুনে খুশি হয়ে সাহেব আর একখানা নোট ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে। বললেন, দিল্লির ট্যুর তাহলে আমাকে ক্যানসেল করতে হবে না। সোমবারের প্লেনে এসে সময়মতো পেঁাছে যাব। দিনটা খুব ভাল হে, তোমরাও ঐ দিনে বেরিয়ে পড়।

বলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

তারাপদ নিশ্চিন্ত হয়ে বলল : বাঁচা গেল।

বাদল চলতে আরম্ভ করে বলল : কেন ?

কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতে হ'ল না।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে দিনটা সত্যিই ভাল। আমরা যে ট্রেনে কোচিনে যাব বলে স্থির করেছি, তা হপ্তায় একদিন করে ছাড়ে। রবিবারে রাতে গৌহাটি থেকে ছেড়ে হাওড়ায় আসে সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ। তাই সোমবারই আমাদের স্যুট করে। ডাক্তারবাবুকে আমরা সামনের সোমবারের কথাই বলব।

কিন্তু মাঝখানে যে কয়েকটা মাত্র দিন। ব্যবস্থা হবে কী করে? সবাই রাজী হলে বুঝব যে দিনটা সত্যিই ভাল। তারপর ব্যবস্থা একটা হবেই। আর পয়সা খরচ করলে কোন্ ব্যবস্থা আজকাল আটকায় বল!

তারাপদ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল: তা ঠিক।

ডাক্তার হিমাংশু মৈত্রের চেম্বারের কাছাকাছি পেঁছে তারাপদ জিজ্ঞেস করল: আমরা যে এবারে লাক্ষা দ্বীপে যাবার প্ল্যান করেছি তা ডাক্তারবাবু জানেন তো?

বাদল বলল: না।

তবে?

ডাক্তারবাবুর কাছে এটা কোন প্রবলেমই নয়। তিনি জানেন যে আমরা কোনও নতুন জায়গায় যাচ্ছি। কত টাকা দিতে হবে বললেই টাকা বার করে দেবেন। কিন্তু বোঝাবার জন্যে সময় নিলেই রেগে যাবেন। রোগীদের সামনে বাজে কথা তিনি পছন্দ করেন না। ওঁর সম্বন্ধে আমার কোন দুর্ভাবনা নেই।

তারাপদ বলল: না থাকলেই ভাল।

ডাক্তারবাবু চেম্বারে আছেন দেখেই বাদল বলল: একটু দাঁড়া, আমি চট্ করে কাজটা সেরে আসছি।

বলে হুড়মুড় করে তাঁর চেম্বারে ঢুকে পড়ে চেঁচিয়ে বলল: সামনের সোমবারেই যাত্রার দিন স্থির হ'ল ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার মৈত্র একজন রোগী দেখছিলেন। কোন উত্তর দিলেন না। প্রেস্ক্রিপসনটা লিখে তার হাতে দিয়ে মুখ তুললেন। বললেন: এই সোমবার তো আমি যেতে পারব না। আমার একটা কন্ফারেন্স আছে।

বাদল তৎপরভাবে বলল: তাহলে দিন পেছোলে আসব।

সেই ভাল।

বলে ডাক্তারবাবু পরের রোগীকে ডেকে নিলেন। আর বাদল নেমে এল পথে।

তারাপদ পথে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছিল। বাদল ফিরে আসতেই বলল ঃ এ কেমন হ'ল!

বাদল বলল ঃ এই রকমই তো চাইছিলাম। ডাক্তারবাবুকেও বলা হ'ল, আবার সঙ্গে নেওয়াও হ'ল না। এবারে নির্মাল্যদির কাছে গিয়ে এই কথা বললেই তিনি রাজী হয়ে যাবেন।

আর তিনি রাজী না হলে দু'কূলই গেল!

দেখাই যাক না!

বলে বাদল তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে নির্মাল্য মিশ্রের বাড়ি এসে উপস্থিত হ'ল। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। খবর পেয়ে বেরিয়ে এলেন। বাদলদের দেখে বললেন ঃ এসো এসো, কী খাবে বল—ঠাণ্ডা না গরম!

বাদল বলল ঃ আজ কিছু নয় নির্মাল্যদি, আজ আমরা খেয়েই বেরিয়েছি। একটা খবর দিতে এলাম।

কী খবর?

বাদল বলল ঃ আগামী সোমবার আমরা বেরোচ্ছি। আপনার কথামতো সোজা লাক্ষা দ্বীপেই যাব। তারপর ফিরব দক্ষিণ ভারতের কয়েকটা জায়গা দেখে।

নির্মাল্য মিশ্র জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে কে যাচ্ছ?

শুনে হাসবেন আপনি।

কেন?

আমি আর তারাপদ, বিকাশ ভানুও যেতে পারে।

নির্মাল্য মিশ্র তারাপদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার দিদি?

উত্তর বাদলই দিল, বলল ঃ মেয়েরা কেউ যাচ্ছে না বলে দিদিও যেতে চাইছেন না।

কেন, বিন্দুর কী হ'ল?

বাদল বলল ঃ সদানন্দদার ছুটি নেই, আর আপনি যাবেন না শুনে বিন্দুরও কোন আগ্রহ নেই।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ডাক্তারবাবু যাবেন না কেন?

তাঁর তো কন্‌ফারেন্স! তিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে এবারে তিনি যেতে পারবেন না।

তোমরা দিন কয়েক পরে গেলেই পারতে!

বাদল বলল ঃ না নির্মাল্যদি, যাব-যাব করে অনেক দিন থেকেই তো

চেষ্টা করছি ! একটা-না-একটা বাধা আসছে। তাই এবারে আমরা শুভদিন দেখে যাত্রা করছি।

নির্মাল্য মিশ্র গম্ভীর হয়ে ভাবলেন কিছু, তারপর বললেন ঃ আমি যাচ্ছি না বলেই কি বিন্দু পিছিয়ে গেছে। তারই তো শখ সবচেয়ে বেশি ছিল !

তারাপদ বলল ঃ মনে হয় যে তার বাবা তাকে একা যেতে দেবেন না !

কেন ! একা যাবার বাধা কিসের ! কিছুদিন পর তো তাকে পুরুষের সঙ্গে লড়তে হবে। মেয়ে বলে পিছিয়ে পড়লে চলবে কেন ! তা তোমার দিদি যাচ্ছেন না কিসের জন্যে ?

তারাপদ বলল ঃ একা যাওয়ার অসুবিধে অনেক। আপনাদের সাহসেই সেবারে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন !

নির্মাল্য মিশ্র তাঁর ডায়েরি বইটা বার করে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। বিড়বিড় করে বললেন ঃ সামনের সোমবার—

বলে কয়েকখানা পাতা উলটে গেলেন তাড়াতাড়ি। তারপর বললেন ঃ দিন পনেরোর মধ্যেই ফিরতে পারবে তোমরা ?

বাদল সোৎসাহে বলল ঃ তা নিশ্চয়ই পারব।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ট্রেনের টিকিট কাটবার জন্যে শ'পাঁচেক টাকা নিয়ে যাও। তোমাদের সঙ্গে এক গাড়িতেই যাব। আর বিন্দুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। তার বাবার যদি আপত্তি থাকে তো আমি নিজে গিয়ে তাঁকে রাজী করাব।

বলে তিনি উঠে গিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে পাঁচখানা কড়কড়ে নতুন নোট এনে বাদলের হাতে দিলেন।

বাদল হকচকিয়ে গিয়েছিল। বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছিল না যে এইরকম ঘটনা ঘটতে পারে ! তাই তারাপদকে বলল ঃ জনার্দন পণ্ডিত দিনটা ভালই দিয়েছে রে !

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন ঃ জনার্দন পণ্ডিত পাঁজি দেখে দিন দিয়েছেন !

বাদল বলল ঃ আমাদের জন্যে দেখেননি, দেখেছিলেন সোরকার সাহেবের জন্যে।

তার মানে চোখ লাল করে ফিরেছেন।

আপনি চেনেন নাকি সোরকার সাহেবকে ?

আমার মক্কেলকে আমি চিনব না! তাঁর গিন্নি বেচারার জন্যে দুঃখ হয়।

কেন?

তিনি সত্যনারায়ণের পুজো করেন সারাদিন উপোস করে। আর ঐ জনার্দন পণ্ডিত কোন রকমে পুজো সেরেই সাহেবের সঙ্গে 'তারা তারা' বলে বসে যান। তাঁর গিন্নি হিমসিম খেয়ে যান সাহেকে সিন্নি খাওয়াতে। শেষ পর্যন্ত গেলাসে মিলিয়ে দেন চামচে করে।

তারপরেই জিজ্ঞেস করলেন: জনার্দন পণ্ডিত তোমাদের দিন দেখে দিয়েছেন, সোমবার কি সত্য নারায়ণের পুজো করবেন?

বলে একখানা পাঁজি এনে দেখলেন তারিখটা। বললেন; ওমা, পূর্ণিমা তো দু'দিন আগে! সত্যনারায়ণ পুজো হবে দ্বিতীয়ার দিন? অবশ্য পুজো যে-কোন দিনই করা যায়। কিন্তু কালরাত্রিতে নারায়ণ পুজো করবেন?

বাদল বলল: রবিবার যে সাহেবের পার্টি আছে দিল্লিতে।

নির্মাল্য মিশ্র গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: থাক ওঁদের কথা। আমাদের হাতে সময় তো বেশি নেই। বিন্দুকে বোলো কালই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। পৃথিবীর মানুষ দেখা ও চেনার সময় এটাই, রাগ বা অভিমানের সময় নয়।

বাদল তার জামার ভেতরের পকেটে টাকাটা সামলে রেখে নির্মাল্য মিশ্রর কাছে বিদায় নিল। পথে নেমে বলল: আশ্চর্য মানুষ, তাই না?

তারাপদ বলল: আজই সদানন্দদার কাছে চল।

বলে একটা রিক্সা ধরে উঠে পড়ল দু'জনে। কাছাকাছি বাড়ি, কিন্তু হাঁটতে আর ভাল লাগছিল না, তাই রিক্সায় চেপে সদানন্দবাবুর বাড়িতে এসে নামল। সদানন্দবাবু বাড়ি ফিরেছিলেন অনেক আগেই, তাই দেখা হয়ে গেল। বাদল বলল: একটা ভাল খবর দিতে এলাম।

কীরকম?

বলে সদানন্দবাবু তার মুখের দিকে তাকালেন।

বাদল বলল: আমরা সামনের সোমবারেই যাত্রা করছি। ডাক্তারবাবু যেতে পারবেন না, যাচ্ছেন নির্মাল্যদি ও আর সবাই।

সদানন্দবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন: সামনের সোমবার! তা আমাকে আগে বলনি কেন?

তারাপদ বলল ঃ আজকেই ঠিক হ'ল যে!

সদানন্দবাবু বললেন ঃ দেখ কাণ্ড! আমার সাহেব বলছিলেন যে কোথাও যাবার থাকলে তাড়াতাড়ি ঘুরে এসো, সামনের মাসে ছুটি চাওয়া চলবে না। সোমবারে যেতে তো আমারও কোন বাধা নেই। ও মা বিন্দু ?

বলে মেয়েকে ডাকতে লাগলেন।

বিন্দু মুখ বাড়াতেই বললেন ঃ সোমবারে যাত্রা করতে হবে মা, তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নাও। এবারে যেন মাথাপিছু কত খরচ পড়বে বলেছিলে ?

বলে বাদলের দিকে তাকালেন।

বাদল বলল ঃ সে হিসেব হয়ে যাবে! কাল ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা করব, আর কোচিনে পেঁছে জাহাজের টিকিট। ভেবেছিলাম, এখান থেকেই ব্যবস্থা করে যাব, তাহলে নিশ্চিন্তে যাওয়া যাবে।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ তোমার কাছে তো টেলিফোন নম্বর আছে! কাল আমার অফিসে এসো, টেলিফোনে চেষ্টা করে দেখা যাবে।

তারাপদ বলল ঃ টিকিটের জন্যে লাইন দিতে হবে তো!

বাদল বলল ঃ লাইন দিয়ে টিকিট পাওয়া যাবে না।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ কিন্তু দালালের কাছে যেও না।

বাদল বলল ঃ ডাক্তারবাবুর পেশেণ্ট থাকতে দালালের কাছে যাব কেন ?

বিন্দু দাঁড়িয়েই ছিল। হাসি হাসি মুখে বলল, বোসো তোমরা, আমি চা তৈরি করে আনছি।

বাদল বোধহয় এরই অপেক্ষা করছিল। ঝপ করে বসে পড়ে বলল ঃ দিনটা সত্যিই ভাল। তা না হলে এমনভাবে যে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে তা ভাবতেই পারিনি।

সদানন্দ বলল ঃ যাত্রার ব্যবস্থাটাও হোক, তারপর ভাল বোলো।

শেষ পর্যন্ত সব ব্যবস্থাই এমনভাবে হয়ে গেল যে মনে হ'ল যে লাক্ষা দ্বীপে যাবার ব্যবস্থা এইভাবেই হয়। হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়তেই বাদল ধপাস করে বসে পড়ে বলে উঠল ঃ গলা ছেড়ে আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

বিন্দু বলল ঃ তা তো করবেই। নদীর ধারে পেঁছে ধোপা যখন ঘাটে তার মোট নামিয়ে নেয়—

তারাপদর দিদি বললেন ঃ আইন পড়তে ঢুকে বিন্দুও কথা বলতে শিখল। কিন্তু ডাক্তারবাবু সঙ্গে এলে নির্মাল্যদিকেই গান গাইতে বলতেন।

সদানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ ডাক্তারবাবুর অভাবটা এবারে বেশি করে মনে পড়বে। বাইরেটা দেখে মানুষটাকে চেনা যায় না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ একটি ঝুনো নারকেল আর কি!

কিন্তু এ কথার উত্তর দিল না কেউ।

তারাপদ বিছানা বেছাচ্ছিল, বলল ঃ একে একে শুয়ে পড়। রাত অনেক হয়েছে। কাল সারাদিন সময় পাবে গান গাইবার।

বাদল বলল ঃ আজকের আনন্দ কাল থাকবে না।

বিকাশ আর ভানু তখন ওপরে উঠে পড়েছিল। একজন বলল ঃ দুর্গা দুর্গা।

বাদল বলল ঃ দুর্গা সহায় না হলে সত্যিই এভাবে আজকাল যাত্রা করা সম্ভব নয়। যাত্রার উদ্যোগ পর্বই একটা বিভীষিকা!

এরকম কথা আজকাল অনেকেই বলেন, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বাঙালিরা। একালে তাঁরাই দেশটাকে জানবার জন্য ভ্রমণ করেন। ধনী যাঁরা, তাঁরা ভ্রমণ করেন বিশ্রামের জন্য বা বৈচিত্র্যের সন্ধানে। তাঁরা শৈলাবাসে যান, কিংবা সমুদ্রের ধারে। প্লেনেই যাতায়াত করেন, থাকেন বড় বড় হোটেলে। তাঁদের জন্যে ব্যবস্থা করে ট্র্যাভেল এজেন্ট, কিংবা নিজেদের অফিসের অধস্তন কর্মচারীরা। তাঁদের নিজেদের কোন ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় না। আজকাল আর এক রকমের ভ্রমণ আরম্ভ হয়েছে। তা বিদেশভ্রমণ। মধ্যবিত্তরাই এই রকমের ভ্রমণ করছেন ছেলেমেয়েদের দৌলতে। ছেলে বিদেশে চাকরি করে, কিংবা জামাই। তারা টিকিট কেটে পাঠিয়ে দিচ্ছে বুড়ো বাবা-মা বা শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য। অনেক সময়ে মা কিংবা শাশুড়িকে দরকার বাচ্চা ধরবার জন্যে। বিদেশে এ কাজের জন্যে লোক সবসময় বা সব জায়গায় পাওয়া যায় না। গেলেও খরচ অত্যন্ত বেশি। তাই মা বা শাশুড়িকে যেতে হয় আবার কাজ করবার জন্যে। এসব নির্মাল্য মিশ্রের কথা। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন যে দেশ দেখার জন্যে ভ্রমণ আজকাল কমে গেছে। তবে ট্রেনে ভিড় দেখে বুঝতে পারো যে সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কিছু সুযোগসুবিধা দিচ্ছেন বলেই এইরকম ভিড় হয়। ভ্রমণের খরচ পাওয়া যায়, তাই দলে দলে লোক বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছেন। তাঁরা সব দূরের যাত্রী। বেশি খরচ পাওয়া যাবে বলেই তাঁরা দেশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে

আসতে বেরিয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য পয়সা উসুল করা, দেশ দেখা বা দেশকে জানবার চেষ্টা নয়। রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করে বলেন যে কবি ঠিকই বলেছেন, বাড়ির আশপাশের দর্শনীয় স্থান আমরা দেখি না, দেখি দূরের জায়গা। আসলে দেশ দেখার চোখ এখন আমাদের নেই, আর মন নেই দেশটাকে জানার। তবু দেশভ্রমণ বেড়েছে, ভিড় বেড়েছে, ভাড়া বেড়েছে, পথের কষ্ট ও অনিশ্চয়তার ভাবনা বেড়েছে।

যাঁরা পুরনো লোক, তাঁরা বলেন যে তাঁদের ছেলেবেলার দিনগুলো যেন ভোলা যায় না। লম্বা ছুটি ছিল। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে ডাক্তাররা হাওয়া বদলের পরামর্শ দিলে এক একটি পরিবার পশ্চিমে বিহারে বা উড়িষ্যার সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতেন। নিজেদের বাড়ি ছিল, স্থানীয় লোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল। চেঞ্জার পরিবাররা দু'দিনেই আত্মীয়ের মতো ঘনিষ্ঠ হয়ে যেতেন, আশপাশের সমস্ত দর্শনীয় স্থান ঘুরে ঘুরে দেখতেন সবাই মিলে। তারপর লম্বা ছুটির দিন ফুরলো, মানুষের সঙ্গে বাড়লো ডাক্তার-বৈদ্য, ওষুধ-পত্র বেরোল, নানারকমের স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে হাওয়া বদলের দিনও শেষ হয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেন এই পৃথিবীর পুরনো চেহারাটাই পাল্টে দিয়ে গেল। যেসব দেশের মানুষ পায়ে হেঁটে চলত, চলত গরুর গাড়িতে, বোঝা বইত, তারাও ছুটতে শিখল, বোঝা বইবার জন্যে বিদেশ থেকে আমদানি করল ট্রাক। তারপর ইংরেজ প্রভু যখন এ দেশ ছেড়ে চলে গেল, তখন বুঝতে শিখল যে অবসরযাপনের জন্যে পাহাড়ী শহরগুলো ফাঁকা পড়ে আছে, পয়সা থাকলে সেখানে বিদেশী আরামও উপভোগ করা যায়। বিত্তবান যাঁরা, তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল পাহাড়ের দিকে। শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসবহুল অবসরযাপনের দিকে।

যে ভ্রমণ একদিন এদেশে শিক্ষার অঙ্গ ছিল, সে ভ্রমণের আকর্ষণের কথা আমরা ভুলে গেলাম। এদেশের মানুষ একদিন বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ভ্রমণ করত। জ্ঞান আবদ্ধ ছিল না গুরুর গৃহে বা নিজের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে। তাই পুরাকালের মানুষ তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়ত কখনও একা, কখনও বা সঙ্গীর সঙ্গে। দুর্গম পথ অতিক্রম করে নানা কষ্ট সহ্য করে পৌঁছত দেশের এক এক প্রান্তে অবস্থিত কোন দেবতার নামাঙ্কিত তীর্থে। পথে অনেক সময়েই রাত্রি বাস করতে হত গাছতলায়, গ্রামবাসীর আতিথ্য স্বীকার করে জীবন ধারণ করতে হত। মানুষের সঙ্গে পরিচয় হত অন্তরঙ্গ, ভাবের ও সংস্কৃতির

বিনিময় হত, সুদৃঢ় হত দেশের সংহতি। এখন আমরা নিজের চোখে দেখে শিখি না, এখন পরের মুখে ঝাল খাই। অনেকে বলেন যে নিজের চোখে দেখে শেখার মতো নিজে বই পড়ে শেখার অভ্যাসও আমরা হারিয়ে ফেলছি। এখন আমরা বই পড়ে সময় নষ্ট করতেও চাই না, চট্‌পট্‌ জানতে চাই ছবি দেখে। ছোট ছেলেমেয়েরা তাই ছবির বই চাইছে—কমিক্স নামে এই ধরনের ছবির বই। তাতে গল্প পড়ছে দু'একটি শব্দ পড়ে। অভাব এখন নাকি সময়ের, চব্বিশ ঘণ্টার এক দিনে মানুষকে অনেক বেশি জানতে হয়, কাজও করতে হয় অনেক বেশি। জানবার জন্যে সময়ের অপব্যয় করা আর চলে না। তাই বই পড়ার রেওয়াজ উঠে যাচ্ছে। উঠে গেছে পায়ে হেঁটে তীর্থ দেখার নির্দেশ। ভ্রমণের সময়ও সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। সময় বাঁচাবার জন্যে উড়োজাহাজে উড়ে যাবার চেষ্টা, তা নাহলে দ্রুতগামী যানবাহনে। পথের দৃশ্য বা মানুষের কোনও আকর্ষণ নেই, আকর্ষণ শুধু উপভোগের সামগ্রীর।

সেবারে আন্দামান থেকে ফেরার পথে ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র যখন জাহাজের ডেকে বসে বলেছিলেন যে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তখন নির্মাল্য মিশ্রই এই ধরনের কথা বলেছিলেন তাঁকে। হিমাংশু মৈত্র রাগ করেননি, বরং মেনে নিয়েছিলেন এইসব কথা। নিজেও কিছু যোগ করেছিলেন, বলেছিলেন, মানুষের রুচি বদলাবেই, তার জন্যে তার দোষ দেওয়া যায় না। আগে লড়াই হত যুদ্ধক্ষেত্রে, এখন বাঁচার জন্যই লড়াই করতে হয়। সর্বত্র লড়াই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে লড়াই না করে বাঁচবার উপায় নেই। এই লড়াই বন্ধ করবার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। যার লাইনে দাঁড়াবার লোক নেই, তাকেও দাঁড়াতে হচ্ছে কাজে ফাঁকি দিয়ে। তাই লাইনে দাঁড়াবার জন্যে কাজে ফাঁকি দেওয়াই এখন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোচিনে পেঁছেই বাদলদের লাইনে দাঁড়াতে হবে। জাহাজের টিকিটের জন্যে লাইন। প্রথমে লাক্ষা দ্বীপ দেখার অনুমতি। তারপর টিকিট। ব্যাপারটা বাদলের সঠিক জানা ছিল না। যেসব কাগজপত্র সে সংগ্রহ করেছিল, তাতে জেনেছিল যে বিদেশীদের জন্য নিয়মকানুন আছে, দিল্লি থেকে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়। অনুমতি দেন মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্সের ডিরেক্টর (এ এন এল)। দিশি ট্যুরিস্টরা অনুমতি পাবেন কোচিনের অফিস থেকেই। আগে থেকে দরখাস্ত করে ও তার সঙ্গে স্পোর্টস

সোসাইটির নামে ক্রসড্ ডিমাণ্ড ড্রাফ্ট পাঠিয়ে ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু টাকার অংক জানা নেই। তবে দলের সবার নাম পাঠাতে হয়। বাদল সদানন্দবাবুর অফিস থেকে টেলিফোন করে ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এত কম সময়ে সবকিছু করা সম্ভব হয়নি। তবে আশ্বাস পেয়েছে যে, তারা কোচিনে পেঁছেই যেন লাক্ষা দ্বীপের অফিসে চলে আসে, ভাল ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

কোচিন থেকে দুখানা জাহাজ নিয়মিতভাবে লাক্ষা দ্বীপে যাতায়াত করে; কিন্তু জাহাজ রোজ ছাড়ে না। জাহাজ দুটির নাম ভারত সীমা ও আমিন দিভি। এ দুটির মধ্যে ভারত সীমাই ভাল। জাতে এটি লাক্সারি লাইনার অর্থাৎ কেবিনগুলি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এবং ডেক এয়ারকুল্ড্। এই জাহাজটি কোচিন থেকে ছাড়ে মাসে দিনপাঁচেক। দেশী যাত্রীদের জন্যে তিন দিনের ডায়মণ্ড ট্যুর আছে, তাতে একদিন বা একবেলা বেড়ানো যায় কল্পেনি, কাবারাট্টি ও মিনিকয় দ্বীপে, আর চার রাত কাটে জাহাজে। কোচিন থেকে জাহাজ ছাড়ে বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটার মধ্যে, আর কোচিনে ফেরে চতুর্থ দিন সকাল সাতটা থেকে দশটার মধ্যে। জাহাজ ছাড়ার দু'ঘণ্টা আগে জাহাজে ওঠার নিয়ম।

এইসব দ্বীপে থাকতে চাইলে রাত্রিবাসের জায়গার জন্যে ভাবনা নেই। তিনটি দ্বীপেই বিচ রিসর্ট আছে। ভাড়া ডেকে যাত্রীপিছু তিনশো আশি টাকা। কেবিন দু রকমের—দু'জনের কেবিনে সাড়ে আটশো টাকা ভাড়া, আটশো টাকা চার জনের কেবিন। সাধারণত দশজন ট্যুরিস্ট কেবিনে ও পঞ্চাশ জন ডেকে নেওয়া হয়। এই ভাড়ায় খেতেও দেওয়া হয়—জাহাজে ও দ্বীপে। জাহাজ থেকে নেমে দ্বীপ ঘুরে দেখার খরচ লাগে না।

যাঁরা লাক্ষা দ্বীপে কিছুদিন বাস করতে চান, তাঁরা নিজেদের ব্যবস্থায় থাকতে পারেন। এক-একটি দ্বীপে যাবার জন্যে ভাড়া এক-এক রকম কাবারাট্টি দ্বীপেই এই ইউনিয়ন টেরিটরির প্রধান শহর, যেখানে পাঁচা ফ্যামিলি হাট আছে। কাডমাট দ্বীপে আছে দশটি হাট। এক-একটি হাটে আসবাব-পত্র সাজানো ঘর দুটি করে, তার সঙ্গে লাগোয়া টয়লেট ও রান্নার ঘর। দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি দম্পতি স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারেন দরকার হলে অতিরিক্ত ক্যাম্পখাট পাওয়া যেতে পারে দশ টাকায়। ফ্যামিলি হাটের দৈনিক ভাড়া ষাট টাকা। বিচ রিসর্ট আছে কল্পেনি কাবারাট্টি ও মিনিকয় দ্বীপে। তাতে জায়গা কম, আর ভাড়া বেশি। মাথাপিছু দৈনিক ভাড়া পঁচিশ

টাকা। কাডমাট দ্বীপে হনিমুন রিসর্ট আছে, তাতে দুটি দম্পতি থাকতে পারে। এক-একটির ভাড়া ষাট টাকা। আর দল বেঁধে গেলে কাডমাটের ইয়ুথ হস্টেলে থাকতে হয়। তার ডর্মিটরিতে মাথাপিছু দশ টাকা ভাড়ায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন থাকতে পারে। এইসব দেখে মনে হয় যে কাডমাট দ্বীপটিই বোধহয় ট্যুরিস্টদের কাছে বেশি প্রিয়।

আর এক রকমের ট্যুর আছে, তার নাম ব্লু ট্যুর। এতে গেলে তিন দিনে অনেকগুলি দ্বীপ ঘুরে দেখা যায়। কাবারাট্টিতে নেমে দ্বীপটা দেখা যায় কিছুক্ষণের জন্যে, আর অনেকগুলি অন্য দ্বীপ কাছে থেকে দেখা যায়। এইসব দ্বীপের নাম আগাট্টি, বঙ্গারাম, চেটলাট, কাডমাট ও কিল্টন। ইচ্ছে করলে কাডমাটেই দুটো দিন কাটানো যায়। কোচিন থেকে এই জাহাজও ছাড়ে বিকেল চারটেয় আর ফেরে চতুর্থ দিন সকালে। ভাড়া ডায়মণ্ড ট্যুরের সমানই। তবে শতকরা দশ টাকা ডিসকাউণ্ট পাওয়া যায়। কাডমাটের ভাড়া কিন্তু অতিরিক্ত দিতে হয়।

বাদল টেলিফোনে কথা বলে জাহাজ ছাড়ার দিনগুলো মনে রাখতে পারেনি। তাই দল নিয়ে পেঁছিবার পরে ডায়মণ্ড ট্যুর পাবে, না ব্লু ট্যুর তা জানে না। নিজেদের ইচ্ছেমত ট্যুর যেতে হলে কোচিনে দিনকয়েক থাকতে হতে পারে। বাদল বলেছে, তার জন্যে ভাবনা নেই। কোচিনে বসে সময় না কাটিয়ে তারা কন্যাকুমারী ঘুরে আসবে। দরকার হলে সমস্ত কেরল রাজ্যটাই দেখে নেবে। ছোট রাজ্য তো! জাহাজের টিকিট কেটে সময় অনুযায়ী ঘুরে ফিরে দেখতে কোন অসুবিধা হবে না।

বিন্দুর কাছে বাদল গোপনে আফশোস করেছে একটি ভুলের জন্যে। ডাক্তারবাবুকে তাদের যাত্রার কথা জানিয়ে আসা এবং তাঁর প্রোগ্রামটাও জেনে নেওয়া তার উচিত ছিল। তিনি আসবেন না বলেছিলেন আসতে পারবেন না তাঁদের কনফারেন্সের জন্যে। কিন্তু তাঁর এই কনফারেন্স কবে ও কোথায় তা জেনে নিলে ভাল হত। দক্ষিণ ভারতের কোন শহরে হলে ফেরার পথে একবার খোঁজ নেওয়া চলত। বড় শহরগুলি দেখার ইচ্ছে তো তাদেরও আছে!

বিন্দু তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, ভুলে গিয়ে ভালই হয়েছে।

কেন?

বলে বাদল তার মুখের দিকে তাকাতেই বিন্দু বলেছিল, কোচিনে হলে বিপদে পড়ে যেতে!

বাদল হেসে বলেছিল, তাও কি সম্ভব না কি !

সম্ভব নয় কেন ! এইসব কনফারেন্স তো আজকাল ঘুরেফিরে সব শহরেই হয় ! জাহাজের জন্য টিকিট কেটে আমরা বসে আছি, এমন সময়ে দেখা হয়ে গেল ডাক্তারবাবুর সঙ্গে !

বাদল সভয়ে বলে উঠেছিল, সর্বনাশ !

সর্বনাশ কেন ?

ডাক্তারবাবুরও ইচ্ছে ছিল লাক্ষা দ্বীপে যাবার। যদি বলতেন, আমিও যাব !

তাহলে কী হত ?

নির্মাল্যদি ফিরে যেতেন প্লেনের টিকিট কেটে।

বিন্দু সোৎসাহে বলেছিল, আর যদি দু'জনেই জাহাজে ওঠেন আন্দামানের মতো, তাহলে বেশ মজা হয়, তাই না ?

বাদল ভয়ে ভয়ে বলল : এবারে বোধহয় হাতাহাতি হয়ে যাবে !

বিন্দু বলল : অন্য কিছুও তো হতে পারে !

ধ্যেৎ।

বলে বাদল লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আর চলতি ট্রেনের বার্থে শুয়ে সে এই কথাই ভাবছিল। সত্যিই যদি কোচিনে তাদের দেখা হয়ে যায় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে, তাহলে সে কী ভাবে সামলাবে এই দুটি মানুষকে। নির্মাল্য মিশ্রর রসবোধ আছে, কিন্তু ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র বড় গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। মনটা নরম হলেও তাঁর বাইরেটা ঝুনো নারকেলের মতো শক্ত। নির্মাল্য মিশ্র কি তাঁর প্রকৃতি এখনও বুঝতে পারেননি ? 'দুর্গা' বলে বাদল তার যুক্ত কর কপালে ঠেকাল।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলে বাদলের মনে হ'ল যে বহু দূর থেকে একটা গানের সুর বুঝি ভেসে আসছে। বাদল তার চোখ বুজে ভাবতে লাগল, এ গান তার শোনা কিনা। হঠাৎ খট্ খটাং করে বিকট একটা শব্দ শুনেই সে সচকিত হয়ে উঠল। বুঝতে পারল যে এতক্ষণ যা শুনেছিল তা গানের সুর নয়, ট্রেনের একঘেয়ে শব্দই বোধহয় গানের সুর বলে তার মনে হয়েছিল। দেখতে পেল যে তার চোখের সামনে নিচের বার্থে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন নির্মাল্য মিশ্র। তাঁর দু'চোখ বন্ধ, কিন্তু ঠোঁট নড়ছে। কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থেকেই বুঝতে পারল যে তিনি বিড়বিড় করে কিছু পাঠ করছেন। গানের মতো সেই সুর। কিন্তু তার মুখ ছিল জানালার বাইরের

দিকে। রাতের অন্ধকার আর নেই, দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করে আছে রাতের পৃথিবী। তার জাগবার সময় হয়েছে বুঝি অনেকক্ষণ আগেই। বাদল ঘড়ি দেখল, তারপর লাফিয়ে নেমে পড়ল।

এক টুকরো কাগজে সে ৯০২ নম্বর এক্সপ্রেসের সময়সূচী লিখে এনেছিল। সেই কাগজের ওপর একবার সে চোখ বুলিয়ে নিল দ্রুত। উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরে এই ট্রেন পৌঁছবে ছ'টা আটচল্লিশ মিনিটে। ছ' মিনিট দাঁড়াবে সেখানে। এরপর দুপুর দুটো পনের মিনিটে ওয়ালটেয়ার। কাজেই গড়িমসি করবার উপায় নেই। বাথরুমের কাজ সেরে আসতে হবে। তাদের সঙ্গে জলযোগের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু চা নেই, চায়ের কথা বলে রাখাও হয়নি। তৎপরভাবে ব্যবস্থা করতে না পারলে সমস্ত দোষ তার ওপরেই পড়বে। দুপুরের ব্যবস্থাও করতে হবে। না, এ যাত্রায় কম খরচে ভাল খাওয়ানো সম্ভব নয়। ট্রেনের খাবারই খেতে হবে দু'দিন।

ওয়ালটেয়ারে ট্রেন কুড়ি মিনিট দাঁড়ায়। সন্ধ্যের আগে রাজামুন্দ্রিতে দাঁড়ায় পাঁচ মিনিটের জন্যে। তারপর বিজয়ওয়াড়ায় পনের মিনিট দাঁড়াবে রাত আটটার পরে। এরপর রাত চারটেয় ম্যাড্রাস। তখনও ভোর হয় না। কুড়ি মিনিট দাঁড়ানোয় যাত্রীদের কোন লাভ হয় না। সকাল সোয়া ছ'টার পর কাটপাডিতে দাঁড়ায় দু'মিনিটের জন্য। পরপর কয়েকটা স্টেশনে দাঁড়াবার পর কোইম্বাতুরে দুপুরের আহার সাড়ে বারোটার পরে, তা না হলে পালঘাটে প্রায় দু'টোয় অথবা ট্রেনের খাবারের ওপর ভরসা করে থাকতে হবে। ট্রেন এর্নাকুলম টাউন পৌঁছবে সন্ধ্যে ছ'টা পনের মিনিটে। তখন লাক্ষা দ্বীপের অফিস খোলা থাকবে না। রাতের আহার জুটতে পারে কোন ভাল জায়গায়। গোটা দুটো দিন এই ট্রেনেই তাদের কাটবে। বাদল তার প্রাতঃকৃত্যের জিনিস নিয়ে বাথরুমের দিকে ছুটল। কারও দিকে চেয়ে দেখবার তার সময় নেই। নির্মাল্য মিশ্রের ঠোঁটে হাসি লেগে ছিল। বোঝা গেল না তা বাদলের দিয়ে চেয়ে কিনা।

বিন্দু শুয়েছিল নির্মাল্য মিশ্রের ওপরের বাঙ্কে। বাদল চলে যাবার পর সে নেমে পড়ল, বসল নির্মাল্য মিশ্রেরই বার্থে। বুঝতে পারল যে নির্মাল্য মিশ্র গুণগুণ করে ভজন গাইছিলেন। ভারি মিষ্টি তাঁর কণ্ঠস্বর। তাঁর গান সে আন্দামান যাত্রার সময়ে জাহাজে শুনেছিল। ডাক্তার হিমাংশু মৈত্রও শুনেছিলেন এবং তাঁর ভাললাগার কথা জানাতেও দ্বিধা করেননি। ডাক্তারবাবু মনের ভাব গোপন করতে চান না। কিন্তু তা প্রকাশের

ধরনটা ঠিক আর পাঁচজনের মতো নয়। এমনভাবে কথা বলেন যে সবার মনে হয়, তিনি রেগে গেছেন। তাঁর ভাল কথাও সহজে বোঝা যায় না। নির্মাল্য মিশ্র তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। বাদল বোঝাবার চেষ্টা করে সফল হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল যে যাত্রীরা একে একে সবাই উঠে পড়েছেন এবং ভুবনেশ্বরে পৌঁছবার আগেই প্রাতরাশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। বিন্দু নির্মাল্য মিশ্রের অপেক্ষা করছিল। তাঁকে চোখ মেলে তাকাতে দেখেই জিজ্ঞেস করলঃ আপনাকে একটা কথা বলব নির্মাল্যদি।

নির্মাল্য মিশ্র সহাস্যে বললেনঃ কোন কথা বলবার জন্যেও তোমাকে আমার অনুমতি নিতে হবে! আর কী বলবে তা না জেনে আমি কী উত্তর দিতে পারি বল।

বিন্দু জানে যে এ কথার জবাব দিলে সে আইনের প্যাঁচে পড়ে যাবে অর্থাৎ উকিল নির্মাল্য মিশ্র তাকে প্রশ্নোত্তরের জালে জড়িয়ে ফেলবেন, এবং সে যা জানতে চাইছে তা আর জানতে চাওয়া হবে না। তাই তাড়াতাড়ি বললঃ লাক্ষা দ্বীপের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ এই সোজা কথাটা বলবার জন্যে কোন ভূমিকা করার তো দরকার ছিল না! এ আমাদের চরিত্রের একটা বড় দোষ। অকারণ আমরা বেশি কথা বলি।

বাদল লক্ষ্য করেছিল যে বিন্দু যাঁতাকলে পড়েছে। তাই হুড়মুড় করে এসে ঘোষণা করল যে চায়ের ট্রে নিয়ে বেয়ারারা এসে পড়েছে, আর কোন ভাবনা নেই। তারপরেই দিদিকে বললঃ খাবারের পুঁটুলিটা বার কর দিদি, ভাগাভাগি করতে করতেই চা এসে যাবে।

নির্মাল্য মিশ্র বাদলের দিকে চেয়ে হাসলেন, অর্থাৎ বুঝতে দিলেন যে সে-যে এইভাবে বিন্দুকে রক্ষা করল তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু বিন্দু লজ্জিত হয়েছে দেখে বললেনঃ লজ্জা পাবার মতো কিছু হয়নি, কেউ কিছু লক্ষ্যও করেনি। তুমি আইন পাস করে ওকালতি করবে ভাবছ বলেই তোমার সঙ্গে এইভাবে কথা বললাম। সর্বদা তোমাকে মনে রাখতে হবে যে প্রতিপক্ষকে কুপোকাত করাই তোমার পেশা হবে। তাই নিজের কথায় কাউকে কোন সুযোগ দেবে না। আক্রমণের সুযোগটা তুমি প্রথমেই ছিনিয়ে নেবে। এক সময়ে বাঙালিরা সাহেবদের কাছে সংলাপে তালিম

নিত পুরোপুরি সাহেবি কায়দায় কথা বলার অভ্যাসের জন্য। তোমাকে এখন থেকে উকিল হবার জন্যেই তালিম নিতে হবে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সাক্ষীদের জেরবার করে দেবে, সত্যি কথা অতর্কিতে বেরিয়ে আসবে।

ততক্ষণে তারাপদর দিদি সকলের জলযোগ বার করে ফেলেছিলেন, বললেন: বাদলের হুকুমমতো লুচি আর হালুয়া আনা হয়েছে। হালুয়ার বদলে আলুর দম হলে বোধ হয় আপনার বেশি ভাল লাগত। কিন্তু বাদল বলল যে খাবার সুবিধে হবে এতে।

বলে নির্মাল্য মিশ্রকেই সবার আগে এগিয়ে দিলেন একখণ্ড কাগজের ওপর রেখে।

বাদল চায়ের জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল। তাই নির্মাল্য মিশ্র বললেন: ও আছে বলেই তো আমাদের আসা হল। ওর ব্যবস্থা মেনে নিতেই হবে।

বাদলের সঙ্গেই ছিল বিকাশ ও ভানু। তিনজনের সমবেত চেষ্টায় চা এল, নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হল প্রথম দিনের প্রাতরাশ। দুপুরের আহারের ব্যবস্থাও হল রেল কোম্পানির নিরামিষ থালি। মাছ মাংস নিয়ে ভয় আছে অনেকের। নানা রকমের ভয়। তাই নিরামিষই ভাল। নির্মাল্য মিশ্র সব শুনে বললেন: কড়াপাকের সন্দেশ এনেছি কিছু, নিরামিষ খাবারের পর মন্দ লাগবে না।

বিন্দু বসেছিল নির্মাল্য মিশ্রের পাশে, আর বাদল এসে তাঁর সামনে বসল। তারাপদ আর তার দিদি অন্য ধারে ছিলেন। সদানন্দবাবু কাছেই ছিলেন। বললেন: তোমাদের কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে নাকি?

বিন্দু বলল: নির্মাল্যদি এবারে লাক্ষা দ্বীপের সম্বন্ধে কিছু বলবেন বাবা, যদি শুনতে চাও তো কাছে এসে বোসো।

নির্মাল্য মিশ্র রাগের ভান করে বললেন: আমি তোমাদের গাইড নই বিন্দু, গাইড বাদল। কিছু জানবার ইচ্ছে থাকলে বাদলকে জিজ্ঞেস কর।

বাদল ভয়ে আঁৎকে উঠে বলল: আমাকে!

ততক্ষণে সদানন্দবাবু উঠে এসে বাদলের পাশে বসে বললেন: আমরা শ্রোতা। শুনতে এসেছি। কে বলবেন তা আপনারাই ঠিক করুন।

বাদল বলে উঠল: এই ভয়েই তো আপনার জন্যে সেই বইখানা কিনে এনেছিলাম এসপ্লানেড থেকে—পাব্‌লিকেশন্স্‌ ডিভিসনের বই। তাতে কি কিছুই নেই?

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন: অমন ভয় পাচ্ছ কেন! কেউ কিছু না

জানলে যা ইচ্ছে তাই বলা যায়। ধরা পড়বার ভয় নেই তো! চেষ্টা করে দেখই না!

বাদল কাঁদকাঁদ হয়ে বলল: না নির্মাল্যদি, আমি ডাক্তারবাবু নই, আমাকে আপনি ভয় দেখাবেন না!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আমি তো ভয় দেখাচ্ছি না তোমাকে, ভয়ের যে কোনো কারণ নেই আমি সেই কথাই তোমাকে বলছি।

সদানন্দবাবু বললেন: আসলে আপনি নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছেন। তবে শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে আমরা আপনাকে বেয়াড়া ধরনের কোন প্রশ্ন করব না। আপনার যা জানা আছে বা মনে আছে, তাই বলুন। আমরা নীরবে শুনব।

বাদল বলল: আমরা সবাই একমত।

তারাপদ এল, বিকাশ ও ভানু এসেও দাঁড়াল। আর নির্মাল্য মিশ্র সবাইকে দেখে সহাস্যে বললেন: সামনে যখন বিপক্ষের কেউ নেই, তখন নির্ভয়েই বলতে পারি। কিন্তু কোন্‌খান থেকে আরম্ভ করব তাই ভাবছি।

বিন্দু বলল: আগে ভূগোল, তারপর ইতিহাস।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: ঠিক বলেছ, ভূগোলের কথাই আগে বলা দরকার। এই দ্বীপপুঞ্জ কোথায় এবং কী ভাবে এর উৎপত্তি হয়েছিল। আমরা আন্দামানে ঘুরে এসেছি। কিন্তু এর সঙ্গে লাক্ষা দ্বীপের তুলনা করলে খুব ভুল হবে।

কেন?

বলে বিন্দু তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বঙ্গোপসাগরে, তার আয়তন সাতশো বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা এক লক্ষ পনের হাজার। আর লাক্ষা দ্বীপ আরবসাগরে, তার আয়তন মাত্র বারো বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা বত্রিশ হাজার। এই দ্বীপপুঞ্জের সাতাশটা দ্বীপের মধ্যে দশটিতে মানুষের বাস আছে।

বাদল সবিস্ময়ে বলল: এতগুলো দ্বীপ মিলিয়ে মাত্র বারো বর্গমাইল! এ যে দেখছি কলকাতার একটা পাড়ার মতো!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: বত্রিশ বর্গ কিলোমিটারে আর কত বড় হবে!

বিন্দু বলল: এই নিয়ে একটা ইউনিয়ন টেরিটরি! এইটেই সবচেয়ে ছোট নাকি নির্মাল্যদি?

মনে হয় তাই। দিল্লি তো অনেক বড়, চণ্ডিগড় শহর একশো চোদ্দ বর্গ কিলোমিটার।

সদানন্দবাবু বললেন: দাদরা ও নগর হাভেলি শুনেছি খুব ছোট জায়গা!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: সে প্রায় পাঁচশো বর্গ কিলোমিটার।

বিন্দু বলল: সমুদ্রের মধ্যে এত ছোট ছোট দ্বীপ কী করে জেগে উঠল জানি না বাবা!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: পণ্ডিতরা নানা রকমের কারণ অনুমান করে থাকেন। তবে স্যার চার্লস্ ডারউইনের মতটাই মেনে নেওয়া হয়। তিনি মনে করেন যে, কোন পাহাড়ের চূড়া বা আগ্নেয়গিরির মুখ যখন নেমে যেতে আরম্ভ করে, তখন প্রবাল তার চারিদিক ঘিরে জমতে শুরু করে। জমি যতই বসে যায়, প্রবাল ততই বাড়ে এবং জলের ওপরে জেগে ওঠে। তারপর সমুদ্রের বাতাস ঢেউ আর জোয়ারে সেই প্রবাল গোলাকৃতি হয়ে যায়, আর বাতাসের বিপরীত দিকে তৈরি হয় একটি উপহ্রদ। ইংরেজিতে এই রকমের দ্বীপকে অ্যাটল ও উপ-হ্রদকে লেগুন বলে! লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

বিন্দু বলল: ভারি মজার ব্যাপার তো!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: শুধু লাক্ষা দ্বীপ কেন, মালদ্বীপও এইভাবেই হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। এই দ্বীপপুঞ্জে নাকি হাজার দুই প্রবাল দ্বীপ আছে। তবে আয়তন তিনশো বর্গ কিলোমিটারের কম, মানে একশো পনেরো বর্গমাইল। আগ্নেয়গিরির লাভা থেকেই এইসব প্রবাল দ্বীপের সৃষ্টি বলে আমরা বিশ্বাস করি।

একটু থেমে বললেন: এইসব দ্বীপের অবস্থানও জানতে হবে। আন্দামান ভ্রমণের সময়ে আমরা জেনেছি যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মাঝে টেন ডিগ্রি চ্যানেল আছে। তা হ'ল দশ ডিগ্রির অক্ষরেখা। লাক্ষা দ্বীপ এর ওপরে দশ ও বারো ডিগ্রি অক্ষরেখার মধ্যে শুধু মিনিকয় দক্ষিণে আট ডিগ্রি চ্যানেলের কিছু ওপরে। শ্রীলংকার নিচে। আর মাল দ্বীপ এই দশ ডিগ্রি অক্ষরেখা ও বিষুবরেখার মাঝখানে, অর্থাৎ শ্রীলংকার দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় দু'শো মাইল দূরে। এক সময়ে এই দ্বীপপুঞ্জ শ্রীলংকার অধীন ছিল, স্বাধীন হয়েছে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। আমাদের দেশ থেকে বিমানে এর রাজধানী মালেতে যাওয়া যায়।

বিন্দু জিজ্ঞেস করল : প্লেনে লাক্ষা দ্বীপ যাওয়া যায় না ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : না। এরোপ্লেন নামার মতো জায়গা বোধহয় কোন দ্বীপেই নেই, হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হবে বলে শুনেছি।

হেলিকপ্টারে উড়ে যাওয়া যায় না ?

কোচিন থেকে হেলিকপ্টারে যাবে সমুদ্র পেরিয়ে ! দূরত্ব জানো ?

বাদল বলল : কত ?

সবচেয়ে কাছের দ্বীপটি প্রায় দু'শো কিলোমিটার দূরে, মাইলের হিসেবে একশো কুড়ি মাইল। আর বাকিগুলো দু'শো মাইলের মধ্যে। কেরলের উপকূল আর লাক্ষা দ্বীপের মাঝখানের সমুদ্রকে বলে লাক্ষা দ্বীপ সাগর। এটা আরব সাগরেরই অংশ। অ্যান্ড্রথ দ্বীপ ছাড়া আর সব দ্বীপই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা শুধু অ্যান্ড্রথ দ্বীপ। কোন দ্বীপই বেশি প্রশস্ত নয়। যেখানটা বেশি প্রশস্ত, সেখানেই লোকজনের বাস। উপহ্রদ বা লেগুনগুলো সব পশ্চিমের দিকে। আর এগুলোই দক্ষিণ-পশ্চিমের বর্ষার সময়ে দ্বীপগুলোকে রক্ষা করে। দ্বীপের মাটি সমুদ্রতল থেকে বেশি উঁচু নয়, দশ থেকে তিরিশ ফুটের বেশি নয় কোথাও।

তারাপদ এতক্ষণ নীরবে সবকিছু শুনেছিল। নির্মাল্য মিশ্র থামতেই সে বলে উঠল : মনে হচ্ছে যে আপনি লাক্ষা দ্বীপ দেখে ঘুরে এসেছেন। তাই না বাদল ?

বাদল বলল : দেখে এলে আরও ভাল বর্ণনা দিতে পারতেন।

নির্মাল্য মিশ্র হাসছিলেন, বললেন : আমি এমন একজনের কথা বলছি যিনি ঐ দ্বীপে অনেকদিন কাটিয়েছেন।

কী রকম ?

বলে সদানন্দবাবু তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন : ভদ্রলোকের নাম উইং কমান্ডার মুকুট রমুনি, ভারতের বায়ুসেনায় কাজ করতেন, পরে আই. এ. এস. হয়েছিলেন।

বাদল বলল : ভদ্রলোকের নামটা অদ্ভুত।

বিন্দু চুপি চুপি বলল : মর্কট রমুনি হলে মনে রাখা সহজ যেত, কিন্তু তার আগেই সদানন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন : তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হল কোথায় ?

আলাপ হয়নি তো !

তবে ?

লাক্ষা দ্বীপের ওপরে তিনি একখানা বই লিখেছেন, ছেপেছে পাবলিকেশন্স ডিভিসন। তারা প্রায় সব রাজ্যের ওপরেই এক-একখানা বই প্রকাশ করেছে স্টেট্‌স্ অফ আওয়ার ইউনিয়ন সিরিজে।

বাদল বলল : আমি কি এই বইখানাই আপনাকে দিয়েছিলাম ?

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন : এখন দেখছি যে তুমি না জেনেই অনেক কাজ কর। জেনে করলে সহজেই বুঝতে পারতে যে এ ব্যাপারে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। দিনকয়েক সময় দিয়েছিলে, তাই হাতের কাছে যা পেয়েছি তা পড়ে এসেছি। তাতে নতুন জায়গা দেখার ও জানার সুবিধে হয়।

আমাদের দেশে এখন অনেক নতুন ট্রেন চালু হয়েছে—দূরগামী ও দ্রুতগামী ট্রেন। বাদলরা যে ট্রেনে চলেছে তা এই রকমেরই একটি ট্রেন। এই ট্রেনের নাম ছিল বিবেকানন্দ এক্সপ্রেস, এখন বলে ৯০২ নম্বর গৌহাটি ত্রিবেন্দ্রাম এক্সপ্রেস। গৌহাটি থেকে ছাড়ে রবিবার রাত সাড়ে এগারটায়, ত্রিবেন্দ্রামে পেঁছয় বুধবার রাত প্রায় সাড়ে দশটায়। বেশি স্টেশনে দাঁড়ায় না বলেই তিন দিনে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারে। একা যেতে হলে এই যাত্রা বিরক্তিকর মনে হবে। কিন্তু দল বেঁধে গেলে কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় তা বোঝা যায় না। বাদলরাও শুয়ে বসে গড়িয়ে গল্প-গুজবের ফাঁকে ফাঁকে লাক্ষা দ্বীপের সম্বন্ধে অনেক কথাই জেনে নিল নির্মাল্য মিশ্রর কাছে।

ইতিহাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল বিন্দু, বলল : ভূগোলের কথা তো জানা হয়েছে নির্মাল্যদি, এবারে ইতিহাসের কথা কিছু বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : কী শুনতে চাও বল।

বাদল কাছেই ছিল, সামনে এসে বসে বলল : সমুদ্রের মাঝে এইসব দ্বীপ কে আবিষ্কার করল তাই আগে বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আরব সাগরে যে এইসব দ্বীপ আছে, তা বহুদিন আগে থেকেই জানা ছিল। আরব থেকে কেরল উপকূলে বাণিজ্য করতে আসার সময়েই নাবিকেরা বোধহয় এই দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেছিল। সেকালের সমুদ্রের যে মানচিত্র ছিল, তাতে নিশ্চয়ই এর অবস্থান দেখানো ছিল। পেরিপ্লাসে আছে এখানকার কচ্ছপের খোলার কথা। লিমুরিক বা তামিলাকম থেকে তা রপ্তানি করা হত। সমুদ্রের এই দিকটাকে বলত লারাউই। এইসব দ্বীপে নাকি নানারকম পাথর পাওয়া যেত। কিন্তু এসব কথা ইতিহাসের বলব না। এ হল কিংবদন্তীর কথা। ইতিহাসের কথা

বলতে হলে কেরালার শেষ রাজা চেরামন পেরুমলের কথা দিয়েই আরম্ভ করতে হয়।

সদানন্দবাবু উঠে এসেছিলেন, বললেন ঃ তাই করুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তিনি ছত্রিশ বছর ধরে কেরলে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল ক্র্যাঙ্গালোরে। কোচিনের উত্তরে এই জায়গায় একটা বন্দর ছিল তাঁর আমলে। লোকে বলে যে তাঁর সভায় ধার্মিক মুসলমানরা আসতেন এবং রাজা নাকি ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করবেন, এমন কথা কাউকে কোনদিন বলেননি। তিনি তাঁর আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বলেছিলেন যে তাঁর আর রাজত্ব করার ইচ্ছে নেই, তিনি তাঁর বাকি জীবন কোন নিভৃত স্থানে কাটাতে চান। এরপর তিনি তিরুনাভে একটি উৎসব করলেন এবং তাঁর রাজত্ব আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

তারপর ?

বলে বিন্দু আগ্রহ প্রকাশ করল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তারপর আর কী ? তিনি তাঁর রাজপ্রাসাদেতেই ফিরে এলেন এবং সেখানেই বাস করতে লাগলেন।

রাজা মুসলমান হলেন না ?

তা বলতে পারব না। সে কথা কেউ জানে না। তবে রাজপ্রাসাদে নিভৃতে তাঁর আরব বণিক ও মুসলমান মোল্লাদের সঙ্গে মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা দেখে অনেকেই সন্দেহ করেছিল যে রাজা বোধহয় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছেন, আর একটা ঘটনার পর থেকে এই সন্দেহ ঘনিয়ে উঠল।

বাদল জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ ঘটনা ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ একদিন সকালবেলায় রাজাকে আর রাজপ্রাসাদে খুঁজে পাওয়া গেল না। আর ক্র্যাঙ্গালোরের বন্দরে যত আরব জাহাজ ছিল, দেখা গেল যে সেগুলোও আর বন্দরে নেই। রাতের অন্ধকারে সব জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে গেছে। সবাই ভাবল যে রাজাও বোধহয় এই বণিকদের সঙ্গে মক্কায় গেছেন, অর্থাৎ বণিকরাই রাজাকে মক্কায় নিয়ে গেছে। দেশের লোক রাজাকে খুবই ভালবাসত। তারা দলে দলে বেরিয়ে পড়ল রাজার খোঁজে। স্বেচ্ছায় তারা চারিদিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

বিন্দু বলল ঃ সমুদ্রে রাজাকে খুঁজে পাবে কেমন করে ?

সে চেষ্টাও হয়েছিল। তখন কোলাতুলাডের রাজা উদয় বর্মনের রাজধানী

ছিল ক্যানানোরে। সেখান থেকে এক বিরাট সেনাবাহিনী ছুটল একটা জাহাজে। সেকালের দুঃসাহসী নাবিকেরা ছিল সেই জাহাজে। তারা আরবদের জাহাজের পেছনে ছুটল। দূরে যখন একটা আরব বণিকদের জাহাজ দেখতে পেয়ে তারা আরও দ্রুতবেগে ধাওয়া করল, তখনই সমুদ্রের বুকে উঠল এক ভয়ংকর ঝড়। আর সেই ঝড়ের দাপটে তাদের জাহাজ পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। এই ঝড় একদিনে কমল না, কয়েক দিন ধরে সমুদ্রকে তোলপাড় করতে লাগল। তারপর একদিন তারা দেখতে পেল সমুদ্রের মধ্যে একটা ছোট দ্বীপ, আর আত্মরক্ষার জন্যে সেই দ্বীপে এসেই তারা নামল। এ কোন্ দ্বীপ জানো?

বাদল বলল: নিশ্চয়ই লাক্ষা দ্বীপ।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: লাক্ষা তো কোন দ্বীপের নাম নয়, এ একটা দ্বীপপুঞ্জ। কোলাতুনাডের রাজার সৈন্যরা এসে যে দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল, তার নাম বঙ্গারাম। দেশী ও বিদেশী ট্যুরিস্টদের এখন এই দ্বীপে থাকতে দেওয়া হয়। মানুষের বাস নেই এই দ্বীপে।

বিন্দু বলল: কেরল রাজার কী হ'ল?

চেরামন পেরুমলকে খুঁজে পাবে কেমন করে! তিনি যে আরব বণিকদের জাহাজেই মক্কা যাচ্ছিলেন, তার তো কোন প্রমাণ নেই! আর ঝড়ের পরে আরব বণিকদেরও আর দেখতে পাওয়া যায়নি। হয় তারা ঝড় উঠবার আগেই নিরপদ জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল, নয় ঝড়ের দাপটে ডুবে গিয়েছিল তাদের জাহাজ। কেরলের কোন বনে বা পাহাড়ে তিনি বানপ্রস্থে গিয়েছিলেন কিনা তাও জানা যায় না। অনেকে তো বলেন যে তিনি ম্যাড্রাসে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সেন্ট টমাস তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। আসল কথা হ'ল এই যে, তিনি মুসলমান হবার জন্যে মক্কা যাত্রা করেছিলেন না খ্রীষ্টান হতে ম্যাড্রাসে গিয়েছিলেন, সে কথা কেউ জানে না। তবে তিনি যে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হতে চেয়েছিলেন, এই রকমের একটা সন্দেহের কথা রটে গিয়েছিল।

সদানন্দবাবু এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। এইবারে প্রশ্ন করলেন: ইতিহাসে কী বলে?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: আমার মনেও এই প্রশ্ন জেগেছিল। তাই কেরলের ইতিহাস নিয়ে কিছু পড়াশুনো করেছিলাম। চেরা এই রাজ্যের প্রাচীন নাম। এই নাম ইতিহাসে আছে। আর ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজাদের

নাম যে পেরুমল হত, তা-ও ইতিহাসে আছে। এ কথাও ইতিহাসে আছে যে, কেরলের শেষ রাজা চেরামল পেরুমল তাঁর রাজ্য নিজের আত্মীয় ও দেশের অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তারপরে কী করেছিলেন তা জানা যায় না।

বিন্দু জিজ্ঞেস করল : যারা লাক্ষা দ্বীপে পৌঁছেছিল, তারা কী করল ?

ঝড়ের জন্যে তাদের অপেক্ষা করতে হল অনেক দিন, আগট্টি নামের আর একটা দ্বীপেও গিয়েছিল তারা। তারপর সমুদ্র শান্ত হয়েছে দেখে ভেবেছিল যে আর এগিয়ে কোন লাভ নেই, দেশে ফিরে যাওয়াই ভাল, ফেরার পথে তারা আরও কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ দেখতে পায়।

তারপর ?

তারপর স্বদেশে ফিরে তারা তাদের রাজা উদয় বর্মনকে বলেছিল, যে জন্যে তারা সমুদ্রে গিয়েছিল, সে কাজ তো উদ্ধার হয়নি। আরব বণিকদের একটা জাহাজ দেখতে পেয়েও ঝড়ের জন্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। তার বদলে তারা আবিষ্কার করে এসেছে আরব সাগরের কয়েকটি জনশূন্য দ্বীপ।

রাজা কী করলেন ?

রাজার উপযুক্ত কাজ। তাঁর সাহস ছিল, দূরদৃষ্টিও ছিল। তাই তিনি তাঁর কয়েকজন সাহসী অনুচরকে পাঠালেন এই দ্বীপগুলি দেখে আসবার জন্যে, নিজের প্রজাদের সেখানে পাঠানো যায় কিনা তারা দেখে আসবে। বললেন, যারা সেখানে বসবাস করবে তারা তাঁর কাছে সব রকমের সাহায্য পাবে। তাঁর রাজ্যে সাহসী নাবিক ও পরিশ্রমী মজুরের তো অভাব ছিল না। কয়েক মাসের মধ্যেই তারা সেখানে পৌঁছে গেল। এরা যে দ্বীপে গিয়ে উঠল, তার নাম রাখল আমিনি। তারপর সমুদ্র ঘুরে ঘুরে অন্য দ্বীপগুলিও আবিষ্কাব করল। সবচেয়ে দক্ষিণে ছিল কল্পেনি দ্বীপ। মিনিকয় তারা দেখতে পায়নি। কারণ তারা বোধ হয় ভাবতেও পারেনি যে, এত দূরে গেলে আরও একটা দ্বীপের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু এইসব দ্বীপে তারা বেশিদিন বাস করেনি। কতকগুলি দ্বীপের জলবায়ু ভাল ছিল না। সেসব দ্বীপে বারোমাস বাস করা নিরাপদ ছিল না। আবার কতক দ্বীপে পানীয় জলের অভাব ছিল। এইসব কারণে যারা এসেছিল, তাদের অনেকেই অসুখে মারা পড়ল, আর যাবা বাকি ছিল তারা ঘরের টানে দেশে ফিরে গেল।

বিন্দু জিজ্ঞেস করল : রাজা কী বললেন ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ রাজা তো খুশি হতে পারলেন না। কোন্ রাজা চান যে নতুন মাটি পেয়েও তা দখল না করতে! উদয় বর্মনও ভাবলেন যে, তাঁর প্রজারা গিয়ে সেখানে বসবাস আরম্ভ করলে তারাও জমি পাবে, আর তাঁর রাজত্বও বিস্তৃত হবে। তাই তিনি ঘোষণা করলেন যে, যারা ঐসব দ্বীপে গিয়ে চাষবাস করতে আরম্ভ করবে, সেই জমি তাদেরই হবে।

তারপর?

ভূমিহীন মানুষের তো অভাব নেই দেশে, আর জমির লোভ নেই এমন মানুষও কম। রাজার এই আদেশ শুনে অনেকেই সেখানে গিয়ে চাষবাস আরম্ভ করে দিল। চিরদিন সেখানে থাকবে বলেই তারা গিয়েছিল। তাদের বংশধররাই এখনও সেখানে বাস করছে। কিন্তু যখন তারা গিয়েছিল, তখন তারা হিন্দু ছিল। এখন আর কেউ হিন্দু নয়, এখন সবাই মুসলমান।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ তারা যে হিন্দু ছিল, তার কোন প্রমাণ আছে?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আছে। মাটির নিচে থেকে মাঝেমাঝেই ভাঙা দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। চুন বালি দিয়ে সেইসব মূর্তি তৈরি হয়েছিল। তাদের ধর্মান্তরিত হবার গল্পও আছে, তা পরে বলব, আগে ইতিহাসের কথা শেষ করি।

বিন্দু বলল ঃ তাই করুন।

লোকে একটা কথা স্বীকার করে যে এখন যারা লাক্ষা দ্বীপের অধিবাসী, তাদের সঙ্গে মিল বেশি ক্যালানোরের লোকের। ধরনধারণ জাতপাত এমনকি কথাবার্তাতেও নাকি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কেরলের অন্য জায়গার লোকের সঙ্গে নাকি এত মিল নেই। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, ক্যালানোরের লোকেরাই পৌঁছেছিল বেশি সংখ্যায়। মনে হয় যে যারা রাজাকে উদ্ধার করতে আরব বণিকদের জাহাজের পেছনে ধাওয়া করেছিল, ঝড়ে তাদের জাহাজডুবি হয়েছিল লাক্ষা দ্বীপের কাছেই। আর তা না হয়ে থাকলে রাজা উদয় বর্মনের গল্পটাই সত্যি। যারা সেখানে গিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল তিনটে জাত ঃ প্রথম জাত হল রাজার প্রিয়পাত্ররা, তারাই জমির মালিক হয়ে বসেছিল। দ্বিতীয় জাত হল নাবিকরা, তারা জাহাজ নিয়ে গিয়ে মাছ ধরা আর বাণিজ্যের কাজে লেগে গিয়েছিল। আর তৃতীয় জাত হল ভূমিহীন চাষীরা, তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জমিজমা চাষের জন্যে। তখন তারা হিন্দু ছিল, এখন মুসলমান। কিন্তু পুরনো জাতের বেড়া তারা আজও ডিঙোতে পারেনি।

নির্মাল্য মিশ্র একটু থেমে রইলেন, তারপর বললেন ঃ পৃথিবীতে ধর্মের চেয়ে জাতের বেড়াটা বড়। আর সেই জাত যদি অর্থ ও প্রতিপত্তির হয় তো মিল কোনদিনই হবে না। ধনী ও দরিদ্রে ভেদটা ঠিক তেল আর জলের মতো, কোনদিনই মিশ খাবে না।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ এ একটা দুর্ভাগ্যের কথা।

তারাপদ বলল ঃ ভয়ের কথাও।

বাদল এ রকমের আলোচনাকেই ভয় পায়। তাই তাড়াতাড়ি ধামাচাপা দেবার জন্যে বলল ঃ দ্বীপের হিন্দু অধিবাসীরা মুসলমান হল কী করে?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ইসলামধর্মের বয়স জানো?

বাদল বলল ঃ না।

ইসলামধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের জন্ম আনুমানিক ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে। আরব দেশের মক্কায় তাঁর জন্ম। ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আল্লার আদেশ পেয়েছিলেন একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রবর্তনের। অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর গোড়াতেই ইসলামধর্মের জন্ম আরবদেশে, আর সে দেশের বণিকরাই বাণিজ্য করতে বেরোত মুসলমান মোল্লাদের নিয়ে। তাই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, রাজার হারিয়ে যাবার গল্প আর এইসব দ্বীপের অধিবাসীদের ধর্মান্তরিত হবার গল্পে সত্য আছে কথাটা মনে থাকলে লাক্ষা দ্বীপে পেঁছে জেনে নেওয়া যাবে।

বিন্দু হঠাৎ বলে উঠল ঃ এইসব দ্বীপের নাম লাক্ষা দ্বীপ কেন হল তাই আমাদের জানা হল না।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ প্রশ্নটা খারাপ নয়।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ কিন্তু কঠিন প্রশ্ন, অর্থাৎ উত্তরটা জানা নেই বলে প্রশ্নটাই কঠিন মনে হয়।

বাদল বলল ঃ এইসব দ্বীপে নিশ্চয়ই অনেক লাক্ষা পাওয়া যায়!

নির্মাল্য মিশ্র মাথা নেড়ে বললেন ঃ না।

বাদল বলল ঃ তবে এখানকার অধিবাসীরা বোধ হয় লাক্ষার কারবার করে, অর্থাৎ কেনাবেচা।

তা-ও না।

তারাপদ বলল ঃ লক্ষের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই তো? লক্ষ দ্বীপ, কিংবা লক্ষ টাকার দ্বীপ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ মনে হয় যে সেই রকমই কিছু। লক্ষ দ্বীপ

তো হতে পারে না, তাই লক্ষ টাকার দ্বীপ হতে পারে কিনা তাই ভেবে দেখা যাক। ১৯৫৬ সালে ভারতসরকার এই দ্বীপগুলোর শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন এই দ্বীপপুঞ্জের নাম ছিল লাক্ষা দ্বীপ আমিনদিবি ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ। লাক্ষা লেখা হত Lacca, আর Lac মানে লক্ষ। লাক্ষা দ্বীপ বা Lakahadweep নাম হয়েছে ১৯৭৩ সালে। মনে হয় যে, এরই মধ্যে নামের মানে খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাদল বলল : আপনাকেই খুঁজে বার করতে হবে।

অগত্যা।

সদানন্দবাবু বললেন : আপনার কী মনে হয়?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে উত্তরে যে পাঁচটি দ্বীপ, তাদেরই নাম ছিল আমিনদিবি। এই দ্বীপগুলোর নাম আমিনি, কাডমাট, কিলটান, চেটলাট ও বিত্রা। মিনিকয় সবচেয়ে দক্ষিণের দ্বীপ। আর এর থেকেই অনুমান করে নিতে হয় যে লাক্ষা নাম ছিল মাঝখানের দ্বীপ কয়েকটির।

এদের নাম কী?

বলে সদানন্দবাবু নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন : যে দ্বীপ এখন রাজ্যের প্রধান শহর সেই দ্বীপের নাম কাবারট্টি। এ ছাড়া আর কয়েকটি নাম মনে আছে—অ্যানড্রট, আগাট্টি ও কল্পেনি। বোধ হয় এই চারটি দ্বীপকেই লাক্ষা দ্বীপ বলত। শুনেছি যে রাজারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভার দিয়েছিলেন এই চারটি দ্বীপ দেখাশোনা করার। তাদের লক্ষাধিক টাকা খরচ হবার পরই কোম্পানি এইসব দ্বীপের অধিকার পায়। এই জন্যে বোধহয় Lacca বা লাক্ষা দ্বীপ নাম হয়েছে।

সদানন্দবাবু বললেন : তাই হবে।

রেলগাড়িতে একই ট্রেনে দু'রাত দু'দিন কাটানো খুব সহজ কাজ নয়। একা তো এ কাজ অসম্ভব বলে মনে হয়। তবে সপরিবারে বা সবান্ধবে যাত্রা অন্য রকম। ট্রেনে সময় কাটানোর নানা উপায় আছে। এক দিকে তাস খেলা চলছে। সবচেয়ে মজার কথা হল যে কয়েকজন অপরিচিত লোকই সবচেয়ে বেশি জমিয়ে ফেলেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে একটা কোণায় তারা পয়সা রেখে ব্রিজ খেলছে। সময়ের হিসেব তাদের নেই, খাবার কথাও তারা ভুলে গেছে। যাদের সংরক্ষিত জায়গা, তারা জোর করে তুলে না দিলে হয়তো সারা রাত তারা তাস খেলেই কাটাত।

বাদলের দলের এ রকমের কোন নেশা নেই। যারা বই বা সাময়িকপত্র নিয়ে সময় কাটাবার চেষ্টা করেছিল, তারাই সবার আগে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবে দূরে একজনকে দেখা যাচ্ছে যে একটা বই পড়ে যাচ্ছে চোখ ঠিকরে। নির্মাল্য মিশ্র মাঝে মাঝেই তার দিকে চেয়ে দেখছেন। এক সময়ে বাদলকে ডেকে চুপি চুপি বললেন: বাদল, ঐ ভদ্রলোকের হাতে কী বই বলতে পার?

বাদল আন্দাজে উত্তর দেওয়া পছন্দ করে না, তাই বলল: দেখে এসে বলছি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: ভদ্রলোককে বিরক্ত কোরো না যেন!

বাদল কাছে গিয়ে কায়দা করে দেখে ফিরে এসে বলল: একখানা ইংরেজি পেপার ব্যাক।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: তা আমি দূর থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলাম।

কেমন করে?

সারাদিন ধরে অমন মনোযোগ দিয়ে পড়া যায়, এমন বই বাঙলায় আছে বলে শুনিনি।

বিন্দু বলল: কাল রাতে ট্রেনে উঠেও ওঁকে এইভাবে বই পড়তে দেখেছি। উনি বোধহয় গৌহাটি থেকে উঠেছেন।

বাদল বলল: সর্বনাশ!

কেন?

ওঁকে তো তাহলে তিনদিন তিন রাত এই ট্রেনে কাটাতে হবে!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: ওঁর কোন ভাবনা নেই। ওইভাবে বই পড়ার অভ্যেস করা আছে। সময় কাটানো তাঁর পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়। ট্রেনে ওঠবার সময়ে বই-এর স্টল থেকে পছন্দমতো দু'চারখানা বই কিনে উঠেছেন, পথেই শেষ হয়ে যাবে। বিদেশে তো শুনেছি পথের জন্যে কেনা বই পথেই ফেলে দিয়ে যায় যাত্রীরা, অথচ পথে সে বই মনকে এমনভাবে টেনে রাখে যে পথেই তা শেষ হয়ে যায়।

বিন্দু বলল: এ রকমের বই বাঙলায় লেখা হয় না কেন?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এক লেখক বলেছিলেন যে আমাদের সামাজিক অবস্থাই নাকি এর জন্যে দায়ী।

কেন?

বই-এর বিক্রি এত কম যে পাঁচ বছর খেটে একখানা বই লিখলে চলে না,

বছরে পাঁচখানা বই লিখতে হয় অথবা পেটের জন্যে চাকরি বা অন্য কিছু করতে হয়।

বিন্দু বলল : বিদেশের লেখকদের কি তা করতে হয় না ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : সব দেশের কথা বলতে পারব না, তবে ইংরেজি ভাষায় যাঁরা লেখেন, তাঁদের একখানা বই বেরোলে আর চাকরিবাকরি করার দরকার থাকে না। ইংরেজি বই-এর বাজার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। দেখতে না দেখতে কয়েক লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে যাবে। একখানা বই-এর টাকায় লেখকের পাঁচ দশ বছর চলে যাবে। তারপর আমেরিকায় শুনেছি বই-এর বাজারে এজেণ্ট আছে, তারা লেখক ও প্রকাশক সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। পাঁচ বছর ধরে কোন নতুন বিষয়ে বই লেখার জন্যে প্রকাশকরা লেখকের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে থাকেন।

সে বই ফ্লপ্ করলে ?

লোকসানটা প্রকাশক বড় মনে করেন না, কারণ ক্লিক করলে লাল হয়ে যাবেন। আমাদের গরিব বাঙলা আরও গরিব হয়ে যাচ্ছে।

কেন ?

বলে বাদল তাঁর দিকে তাকাতে নির্মাল্য মিশ্র বললেন : ধনী বাঙালিরাই এর জন্যে দায়ী। গরিব বাঙালিদের কথা না ভেবে তারা নিজেরা আরও ধনী হবার কথা ভাবছে। ছেলেমেয়েদের তৈরি করছে অবাঙালির মতো করে। ভাবছে, বাঙালি থেকে তো লাভ নেই, লাভ আছে সাহেব হয়ে। সাহেব হতে হলে সবার আগে ভুলতে হবে বাঙালী সংস্কৃতি, আর শিখতে হবে ইংরেজী আদবকায়দা। তাই যে বাঙালির পয়সা আছে, সে বাঙলা পড়ে না, বাঙালির হাতে ক্ষমতা আছে, সে অবাঙালির সঙ্গে জোট বাঁধে নিজের ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে। কাজেই বাঙলা আর বেশিদিন বাঙালির থাকবে না। অবাঙালির হাতেই মার খাবে বাঙালিরা। তাতে দুঃখ ছিল না যদি ভারত হত ভারতীয়দের। কিংবা পৃথিবীটা বিশ্ববাসীর। নদী সমুদ্রে হারিয়ে দুঃখ পায় না, দুঃখ পায় মরুভূমিতে হারিয়ে। আমরা ভারতীয় হবার ইচ্ছাটাকেই হারিয়ে ফেলেছি।

সদানন্দবাবু গম্ভীর হয়ে সব কথা শুনছিলেন। বললেন : এসব মারাত্মক কথা। লোকে আপনাকে ভুল বুঝবে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : লেখক হলে এসব কথা আমি লিখতাম।

কোন অবাঙালি তাহলে আপনার কাছে মামলা নিয়ে আসত না।

বাঙালিরাও আসত না, কারণ বাঙালিরাই বাঙালিদের বড় শত্রু বলে আমি মনে করি, অবাঙালিরা নয়। তারা আজও বাঙালির সংস্কৃতি ভাল বলে স্বীকার করছে বলেই বাঙালির সংস্কৃতি টিকে আছে। তাদের আনুকূল্যেই গরিব বাঙলা আজও তার অস্তিত্ব হারায়নি। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটছিল দ্রুতবেগে। রাজমুন্দ্রিতে সবাই চা খেয়েছেন, রাতের আহার পাওয়া যাবে বিজয়ওয়াড়ায় আটটার পরে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তে হবে। কারণ কারও করার মতো কিছু নেই। এ ট্রেন ম্যাড্রাস পেরিয়ে যাবে শেষ রাতের অন্ধকারে। পুরনো ট্রেন ম্যাড্রাস এলে সকালে ট্রেনে বদল করতে হত। কিন্তু এ ট্রেন কাউকে বদল করতে হবে না। ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত যাবে পূর্বাঞ্চলের এই এক্সপ্রেস ট্রেন।

পরদিন যখন সকলের ঘুম ভাঙল, তখন ম্যাড্রাস ছেড়ে ট্রেন পশ্চিমমুখো ছুটছে। যথাসময়ে প্রাতরাশ এল—দক্ষিণী খাবার। বাদল বলল: যত্র দেশে যদাচারঃ।

তারপরেই জিজ্ঞেস করল: আচারঃ, না আচারম্?

জিজ্ঞেস করেছিল কাকে তা বোঝা যায়নি। কিন্তু উত্তরটা দিলেন নির্মাল্য মিশ্র। তিনি বললেন: কোন সংস্কৃত পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস কোরো। এ দেশের পণ্ডিতও সংস্কৃত জানেন, বিশেষ করে কেরলের পণ্ডিত। তাঁদের মালয়ালম ভাষায় নাকি সংস্কৃত শব্দেরই প্রাধান্য। তাই না সদানন্দবাবু?

সদানন্দবাবুকে নিয়েই চা-এর আসর বসেছিল। তিনি বললেন: অনুস্বার না বিসর্গ তা জেনে আমাদের কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে যেখানে আমরা যাচ্ছি সেখানকার সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এ তো বিপদের কথা, একজনকেই যদি আপনারা বারবার আক্রমণ করেন, তাহলে সুবিচার তো হয় না!

সদানন্দবাবু লজ্জিতভাবে বললেন: কী করব বলুন, আমাদের যা বিদ্যে-বুদ্ধি তাতে জানবার ইচ্ছে আছে, কিন্তু নিজেদের জ্ঞানের পরিধিটা বড় ছোট।

নির্মাল্য মিশ্র কিছু লজ্জা পেয়ে বললেন: এ কথা বলবেন না, বলুন যে, বইপত্র ঘেঁটে নানা কথা জানবার সময় ও সুযোগ পান না। আমিই কি কিছু জানতাম! বাদল একখানা বই দিয়ে গিয়েছিল, আর তার ভয়ে কিছু পড়ে ফেলেছিলাম। তাইতেই এখন পণ্ডিতের মতো কথা বলছি।

বিন্দু বলল: তাহলে আরও কিছু বলুন নির্মাল্যদি। বিকেলের

দিকে তো আমরা ট্রেন থেকে নামবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ব, তখন আর নিশ্চিন্তে মন দেওয়া যাবে না।

সদানন্দবাবু বললেনঃ ঠিক বলেছিস।

নির্মাল্য মিশ্র বিন্দুর দিকে চেয়ে বললেনঃ কী বলব বল!

বিন্দু বললঃ ইতিহাসের কথা এখনও বাকি আছে। এই দ্বীপগুলো এতদিন কার হাতে ছিল, কত উন্নতি হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আমি যে বই পড়েছি, তার লেখক মনে করেন যে ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দীতেও এই দ্বীপগুলির অবস্থানের কথা শুধু কেরলের মানুষ নয়, আরবী বণিকরাও জানত এবং সারা বছর এখানে বসবাস না করলেও সময়ে অসময়ে আসত কড়ি ও শঙ্খের জন্যে। আরবদেশের ভ্রমণবৃত্তান্তে নাকি এর উল্লেখ আছে। শোনা যায় যে দক্ষিণ ভারতের চের, চোল ও পাণ্ড্য রাজারাও নাকি দ্বীপগুলি নিজেদের অধিকারের বলে দাবি করতেন। শোনা যায় যে রাজা রাজচোল লাক্ষা দ্বীপ ও মাল দ্বীপ জয় করেছিলেন।

তারপর?

তারপরের কথা আর জানি না। দক্ষিণ ভারতে যখন বড় বড় রাজা ছিল, তখন তাঁরা সমুদ্রে ও বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তারপর তাঁদের প্রতিনিধিরা কী ভাবে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যান, সে-কথার উল্লেখ কোথাও পাইনি। লোকের বিশ্বাস যে ওবেদুল্লা নামে একজন নাকি মহম্মদের স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন দূরদেশে ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য। একদিন নয় পরপর তিনদিন এই স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারপর জেড্ডা থেকে তিনি জাহাজে বেরিয়ে এই লাক্ষা দ্বীপে এসে পৌঁছেছিলেন। ঝড়ে তাঁর জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। জাহাজের একখানা কাঠের টুকরো ধরে তিনি আমিনি দ্বীপে এসে উঠলেন। স্বপ্ন দেখলেন ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য। কিন্তু গ্রামের মোড়ল তাঁকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলল। কিন্তু একটি মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়ে বিয়ে করে ফেলল। মেয়েটির নাম হল হামিদাৎ বিবি। কিন্তু মোড়ল তাঁকে প্রাণে মারবে জেনে ছোট একটা নৌকোয় তাঁরা অ্যাণ্ড্রথ দ্বীপে চলে গেলেন। সেখানেও তাঁকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বারেবারেই তিনি অলৌকিক উপায়ে বেঁচে গেলেন এবং একে একে সমস্ত দ্বীপের মানুষকে ধর্মান্তরিত করলেন।

সদানন্দবাবু বললেনঃ এ ঘটনা কোন্ সময়ের?

কিংবদন্তী অনুসারে এই ঘটনা ৪১ হিজরির অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর। কিন্তু রাজা চেরামল ছিলেন নবম শতাব্দীর মানুষ। তাঁর সময়ে লাক্ষা দ্বীপের কথা জানা ছিল না। রবিন্সনা সাহেব এই দ্বীপে এসেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। অ্যান্ড্রুথের কাজী তাঁকে বলেছিলেন যে, সেন্ট ওবেদুল্লা এই দ্বীপে এসেছিলেন তাঁর একুশ পুরুষ আগে। সাহেব হিসেব করে বলেছিলেন, সে ঘটনা তা হলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর। এই তারিখ ক্যানানোরের আলি রাজা পরিবারের উত্থানের সঙ্গেও মেলে। মালবারে তখন এই একটিই মুসলমান রাজবংশ যাঁরা ইসলামধর্ম প্রচারের সহায়তা করেছিলেন।

তারপর?

তারপর পর্তুগীজ জলদস্যুদের কথা। লাক্ষা দ্বীপের অভিজ্ঞ নাবিকেরা তখন দেশবিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করছে—ভারতের সুরাটে ও আরবের মস্কট ও অন্যান্য বন্দরে। মিনিকয় দ্বীপের জাহাজে মালদ্বীপ শ্রীলংকা ও বাঙলার সঙ্গেও বাণিজ্য চালাত। গোয়া থেকে আনত নুন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্যানানোরের এইসব দ্বীপের বাণিজ্য নিজের অধিকারে আনতেই অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল। পর্তুগীজরা এখানকার নারকেলের ছোবড়া নিত জাহাজের দড়ি তৈরির জন্যে। তারা দ্বীপে লুঠ করতে শুরু করল। তারপর আমিনি দ্বীপ জোর করে দখল করে বসল, আর সেখান থেকেই শাসন করতে লাগল অন্যান্য দ্বীপগুলো। এই খবর পেয়েই ক্যানানোরের রাজা একজন বুদ্ধিমান লোককে পাঠালেন কৌশলে পর্তুগীজদের তাড়াবার জন্যে।

বিন্দু বলল: তা কি সম্ভব?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: সম্ভব হয়েছিল বলেই জানি। তবে এটা নিছক গল্প না সত্যি, তা বলতে পারব না।

বাদল বলল: বলুন না গল্পটা!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: ক্যানানোরের রাজার সাহস ছিল না পর্তুগীজদের সঙ্গে সংঘর্ষে নামার। তাই তিনি তাঁর এক চতুর অনুচর পুরকাতকে এই ভার দিলেন। পুরকাত একটি জাহাজে খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রসম্ভার নিয়ে যাত্রা করল। আমিনি দ্বীপের পূর্বদিকে এসে নোঙর ফেলবার আগে জাহাজের পানীয় জল সব সমুদ্রে ফেলে দিল। পর্তুগীজরা এসে বলল যে জাহাজ এখানে নোঙর করা চলবে না। পুরকাত বলল, আমরা শুধু পানীয় জল

চাই, তা পেলেই চলে যাবে। পর্তুগীজরা জাহাজে উঠে দেখল যে জাহাজে অনেক খাবার ও কাপড় আছে। এ সব তাদের দরকার। তাই দ্বীপ থেকে জল নেবার অনুমতি দিল এবং জিনিসপত্রের দাম নিয়ে দরাদরি করতে লাগল। নাবিকদের দ্বীপে নেমে থাকবার জন্যে বাড়িও দিল। পর্তুগীজ যখন জিনিস কিনছে, তখন পুরকাত তাদের জন্যে একটা পার্টির আয়োজন করল। তারা তাদের দেশের প্রথায় জাহাজের ক্যাপটেনের কল্যাণে একসঙ্গে মদ খেল আনন্দ করে ; আর সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়ল। পুরকাত নাকি সেই মদে সাপের বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল।

বিন্দু সভয়ে বলে উঠল ঃ সত্যি ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ সত্যি বলেই মনে হয়।

কেন ?

বলে বাদল তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আমিনি দ্বীপে নামলে দু'টি জিনিস দেখতে হবে। সেই দ্বীপে নাকি একটি মসজিদের নাম সাপের মসজিদ। এই ঘটনার জন্যেই মসজিদের এই নাম হয়েছিল।

আর একটা কী ?

আর একটা হ'ল, পুরকাত ভূমি। পুরকাত ক্যানানোরে ফিরে গিয়ে রাজাকে এই সংবাদ দিলে রাজা খুশি হয়ে তাঁকে এই গ্রামে জমি নিয়ে থাকতে বলেছিলেন। পুরকাতের সেই জমির নাম নাকি এখনও পুরকাত ভূমি।

বাদল বলল ঃ এইসব দেখতেই হবে।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ তার পরের ঘটনা বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বই পড়ে একটা কথা ভাল বুঝতে পারিনি। সেটা হল যে কেরল রাজাদের দু'টো পরিবারের নাম পাওয়া যায়—চিরাক্কাল পরিবার হিন্দু ও আরাক্কাল পরিবার মুসলমান। মনে হয় যে ক্যানানোরের আরাক্কাল রাজারা এক সময়ে চিরাক্কাল রাজাদের অধীনে ছিলেন এবং চিরাক্কাল রাজারা তাঁদের কাছ থেকে এইসব দ্বীপের জন্য কর আদায় করতেন। আরাক্কাল রাজারা স্বাধীনভাবে এইসব দ্বীপ শাসন করতেন ষোড়শ শতাব্দী থেকে। হিন্দু রাজাদের সময়ে দ্বীপের মানুষেরা ছিল নিজেদের জমির মালিক, কিন্তু শাসনভার তাঁর ওপর দেওয়া হয়। এ'রা অধিবাসীদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন। অত্যাচারও করতেন। আগাট্টি দ্বীপের কার্যকর রাজার জুলুম মানতে চাননি। বলে রাজার সৈন্যরা

তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে হত্যা করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। এই সময়ে দস্যুর উপদ্রবও খুব বেড়ে যায়। দ্বীপের অধিবাসীদের কষ্টের আর সীমা ছিল না। দস্যুরা সব কেড়ে নিত, মেয়েদেরও লুকোতে হত। এই রকমের এক দস্যুর নাম ছিল কুট্টি আহমেদ। তার নামে অনেক দ্বীপে ছোট ছোট পাহাড় আছে।

বিন্দু বলল: কী করল তারা?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: কার্যকরদের অত্যাচার যখন অসহ্য হয়ে উঠল, তখন আমিনি দ্বীপের লোকেরা তাদের কার্যকরকে বেঁধে মেরে একটা নৌকোয় ফেলে ক্যানানোরে পেঁছে দিল, আর শাস্তির ভয়ে ম্যাঙ্গালোরে গিয়ে টিপু সুলতানকে সব ঘটনা জানাল। বলল, আরাক্কালের ক্যানানোর বিবি তো কার্যকরদের হাতে সব ছেড়ে দিয়েছেন, টিপু সুলতান রক্ষা না করলে তাদের মরতে হবে।

কী করলেন টিপু?

ভাল কাজই করলেন। ক্যানানোরের বিবির সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল। তাঁকে লিখে পাঠালেন যে তাঁর সঙ্গে কথা বলার আগে যেন দ্বীপের লোকদের তিনি শাস্তি না দেন। বিবি তাঁর সেনাদল পাঠাচ্ছিলেন, কিন্তু টিপুর চিঠি পেয়ে থমকে গেলেন। দুজনের কথাবার্তা হল। ঠিক হল যে টিপু চিরাক্কাল ফিরিয়ে দেবেন বিবিকে, তার বদলে পাবেন লাক্ষা দ্বীপের সাতাশটি দ্বীপের মধ্যে পাঁচটি। এই পাঁচটিই আমিনদিবি নামে পরিচিত হল; বাকি বাইশটা রইল বিবির অধীনে।

তারপর?

১৮০১ সালে টিপুর পতনের পর ইংরেজ হল এই দ্বীপের মালিক। ১৮৪৭ পর্যন্ত বাকি দ্বীপগুলির মালিক ছিলেন বিবি। তাঁর মৃত্যুর পর এক বিধ্বংসী ঝড়ে দ্বীপের যত লোক মারা পড়ল, তত ঘরবাড়ি ও নারকেলের গাছ নষ্ট হয়ে গেল। লোকেরা এসে রাজার সাহায্য চাইল। রাজা ধ্বংসের পরিমাপ করতে নিজে গেলেন, তাঁর সঙ্গে গেল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রবিন্সন সাহেব। লোকেরা যা চাইল, তা রাজা দিতে পারলেন না। রবিন্সন সাহেব দিলেন রাজাকে ধার হিসেবে। চার বছরে এই ধার লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গেল। ইংরেজ বলল, টাকা ফেরত দাও। রাজা সেই টাকার বদলে দ্বীপগুলোই দিয়ে দিলেন ১৮৫৪ সালে। লক্ষ টাকার পরিবর্তে দিলেন বলে দ্বীপের নাম হল লাক্ষা দ্বীপ, ইংরেজীতে **Lacca dive**। ইংরেজ

ভারত থেকে কার্যকর নিযুক্ত না করে দ্বীপেরই একজন বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিকে আমিন নিযুক্ত করল।

বিন্দু বলল ঃ আমিন থেকেই কি আমিনদিবি হয়েছে ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বোধ হয় তা নয়। যে পাঁচটি দ্বীপ আমিনদিবি নামে পরিচিত, তার প্রধান হল আমিনি। আমিনি দ্বীপ থেকেই আমিনদিবি! কালক্রমে সবই এল ইংরেজের অধিকারে—যার নাম রাখা হল লাক্ষা দ্বীপ। ১৮০১ সালে এই নতুন নামকরণ হয়েছে।

বিকেলের চা খাবার পর বাদল বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। যথানিয়মে ট্রেন কিছু পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ত্রিবান্দ্রামে সময়মতো পৌঁছে দেবার জন্য খুব দ্রুত ছুটছে। একজন এর্নাকুলমের যাত্রী বাথরুম থেকে ফিরে এসে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছেন দেখেই, সে সচকিত হয়ে উঠল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ আমরা কি এর্নাকুলম এসে গেছি ?

ভদ্রলোক 'হ্যাঁ' বলতেই বাদলের রূপ এক মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তৎপরভাবে ঘোষণা করল ঃ সবাই তৈরি হয়ে নাও। আমাদের এবারে নামতে হবে।

বিন্দু বলল ঃ এ কত নম্বরের ঘোষণা হল ? এরপর আর কবার হবে ?

বাদল বলল ঃ এটাই লাস্ট্। এরপর আমরা এর্নাকুলমের মাটিতে পা রাখব।

টাইম-টেবলের সময় দেখেই বাদল সবাইকে তৈরি হয়ে নেবার জন্য বলতে আরম্ভ করেছিল। এবারে জিনিসপত্র দরজার কাছে নিয়ে চলল। নির্মাল্য মিশ্র হাসছিলেন। কিন্তু তারাপদ বলল ঃ অমন ব্যস্ত হচ্ছ কেন! ট্রেন তো স্টেশনে দশ মিনিট দাঁড়ায়!

বাদল বলল ঃ দেখছ না, কী ভাবে মেক-আপ করছে! দশ মিনিটের বদলে হয়তো দু মিনিট দাঁড়াবে।

তারাপদ বলল ঃ না দাঁড়াতেও পারে! কী বল ?

শেষ পর্যন্ত এর্নাকুলম টাউন স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়াল। আগেই জানা গিয়েছিল যে এই ট্রেন জংশন স্টেশনে যাবে না, কোচিনেও যাবে না। টাউন স্টেশন থেকেই দক্ষিণে কোট্টায়াম কুইলন হয়ে ত্রিবেন্দ্রাম পর্যন্ত যাবে। বাদল প্ল্যাটফর্মে নেমে বলল ঃ আর তাড়া করে কোন লাভ নেই। কোচিনের অফিস এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে।

বলে রাত্রিবাসের জন্য একটা হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। এই শহরে হোটেলের কোন অভাব নেই, আর বাদল ট্রেনের যাত্রীদের কাছে সংবাদ

সংগ্রহেও কোন ত্রুটি করেনি। নানা জনের মত নিয়ে সে আগেই ঠিক করে রেখেছিল, কোন হোটেলে উঠবে, আর কখন কোচিনে গিয়ে জাহাজের অফিসে হানা দেবে। শুনেছে যে এ সময়ে ডেকে জায়গা পেতে অসুবিধা হবে না, আর দূরের যাত্রা নয় বলে তাতে কষ্টও নেই। তবে সমুদ্রের দুলুনিতে বমির ভাব আসতে পারে বলে জাহাজ ছাড়বার কিছু আগে একটা অ্যাভোমীন জাতীয় বড়ি খেয়ে নেওয়া নিরাপদ।

বাদল বলেছিল ঃ আন্দামান যাত্রায় আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে সমুদ্রে দুলুনির। কোন ওষুধের দরকার হবে না।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র বলেছিলেন ঃ একটা বড়ি খেয়ে নিতে আপত্তি কিসের! কারণে-অকারণেই তো আমরা আজকাল ওষুধ খাচ্ছি!

সদানন্দবাবু সমর্থন করে বলেছিলেন ঃ ঠিক বলেছেন!

বাদল তার বিশ্বস্ত সঙ্গীদের নিয়ে সকালবেলাতেই কোচিনে চলে গেল। বলে গেল ঃ একটা ব্যবস্থা না করে ফিরব না।

বিন্দু বলল ঃ দুর্গা দুর্গা!

বাদলের ফিরতে বেশ দেরি হল, কিন্তু লাক্ষা দ্বীপ ভ্রমণের ব্যবস্থা পাকা করেই সে ফিরল। অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে জাহাজের টিকিটও কেটে এনেছে। আগামী কাল জাহাজ ছাড়বে বিকেল চারটেয়। বাদল সদানন্দবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বলল ঃ নির্মাল্যদি, চয়েসের কোন উপায় ছিল না, আপনাদের মতামত জানতে এলে টিকিট কাটা হত না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ মতামত আবার কিসের?

বাদল বলল ঃ প্যাকেজ টুর তিন রকমের ছিল—ডায়মণ্ড ট্যুর ব্লু ট্যুর, আর তিন নম্বর ট্যুরে শুধু কাবারাট্টি আর কাডমাটে থাকা। কাল ডায়মণ্ড ট্যুরেই যাওয়া যাবে। মানে আমরা ভারতসীমা জাহাজে কল্পেনি কাবরাট্টি আর মিনিকয় দ্বীপ দেখতে পাব। ব্লু ট্যুরে গেলে দেখতে পেতাম কাবারাট্টি অ্যানড্রট আর কাডমাট, আগাট্টি বাঙ্গারাম আমিনি আর কিল্টনও কাছে থেকে দেখা যেত।

নির্মাল্য মিশ্র তৎপরভাবে বললেন ঃ মিনিকয় দেখা তো হত না। ঐ দ্বীপটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে শুনেছি। জাহাজেও একটু বেশি বেড়ানো হবে।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ অনির্দিষ্ট কাল বসে থাকতে তো হচ্ছে না, সেটাই বড় কথা।

তারাপদর দিদি জিজ্ঞেস করলেন ঃ মাথাপিছু কত খরচ পড়ল ?

বাদল বলল ঃ ডেকের টিকিটের ভাড়া সাড়ে তিনশো থেকে বেড়ে তিনশো আশি হয়েছে। কিন্তু আর কোন খরচ লাগবে না। কাল দুপুরে খেয়েদেয়ে জাহাজে গিয়ে উঠব। আর তিনদিন তিনরাত জাহাজের ডেকে কাটিয়ে সকালে এসে জাহাজ থেকে নামব। তারপর দক্ষিণ ভারতটা দেখে বাড়ি ফেরা।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ফেরার জন্যে কারও তাড়া থাকলে কোচিন থেকেই প্লেনে উঠতে পারবে।

বাদল বলল ঃ দেখে এসেছি। উইলিংডন আইল্যাণ্ডে একটা এয়ারপোর্টও আছে। বন্দর কোচিন আইল্যাণ্ডে, আর মেনল্যাণ্ডে এর্নাকুলম। শহরটা চিনে ফেলেছি। তাই না বিকাশ ?

বিকাশ বলল ঃ বিকেলবেলায় ঘরে বসে কী করবে সবাই ! লঞ্চে করে সব দেখিয়ে আনো না !

বাদল বলল ঃ না। বাসে ফোর্ট কোচিনে চলে যাব, সেখান থেকে বাসেই চলে আসব মাট্টাশচেরি, সেখান থেকে ফেরি লঞ্চে ফিরব।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বুঝেছি, তোমরা অনেক কিছু জেনে এসেছ !

দুপুরে সবাই হোটেলেই খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নিলেন। রাতটাও এই হোটেলে কাটাতে হবে। সদানন্দবাবু একা বেরিয়ে চারিদিকটা দেখে এসেছিলেন। বিন্দু গল্প করেছে নির্মাল্য মিশ্রর সঙ্গে। এক সময়ে সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ল।

পরিচ্ছন্ন পথঘাট। জনতার ভিড় নেই এ সময়ে। বাসও প্রায় ফাঁকা যাচ্ছে। একটা মোড়ে তারা ধীরে সুস্থে বাসে উঠে জাঁকিয়ে বসল। বাদল বলল ঃ কলকাতা শহরে কোনদিন এরকম হবে না।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ এক সময়ে এইরকমই ছিল। আমাদের চোখের সামনেই সব বদলে গেল। আর শুধু কলকাতা কেন, দেশটাই বদলে যাচ্ছে। দেশের মানুষও।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বিদেশের মানুষও। আমরা তাদের দিকে ঝুঁকছি, তারা ঝুঁকছে আমাদের দিকে।

বাস একটা প্রশস্ত পুলের উপর দিয়ে এর্নাকুলম শহর থেকে উইলিংডন দ্বীপ, তারপর ফোর্ট কোচিনে গিয়ে উপস্থিত হল। একটা গাছের ছায়ায় এই যাত্রার শেষ। একটু ঘোরাঘুরি করতেই এখানকার মাছ ধরা দেখতে পাওয়া গেল। জাল ফেলে মাছ ধরা হচ্ছে, কিন্তু এ আমাদের দেশের মতো একজনে

ছড়িয়ে ফেলার জাল নয়, এ জাল শক্ত খুঁটিতে দড়ি-দড়া দিয়ে বাঁধা। পুরনো আমলে চীন থেকে নাকি আমদানি করা হয়েছিল, অর্থাৎ চীনারা তাদের দেশ থেকে এই জাল নিয়ে এসেছিল এ দেশে মাছ ধরতে। সেইরকম জালে এখনও মাছ ধরা হচ্ছে।

এরপর সবাই ফোর্ট কোচিন থেকে মাট্টাসচেরিতে এসে নামল। এখানে ধর্মমন্দির সিনাগগ দেখবার জায়গা আছে অনেক। প্রথমে ইহুদিদের ধর্মমন্দির সিনাগগ দেখল ভেতরে ঢুকে। খুব পুরনো সিনাগগ। তারপর দেখল ডাচদের তৈরী একটা প্যানেল। কোচিনের রাজা এখানে বাস করতেন। এখন জাদুঘরের মতো করে রাখা হয়েছে। তার কাছেই একটা হিন্দু মন্দির। কিন্তু দেখলে মন্দির বলে মনে হয় না। কয়েকটা গির্জাও আছে পুরনো। কিন্তু সবাই সমুদ্র দেখবার জন্যেই ব্যস্ত হয়েছিল বলে তারা ফেরিঘাটে এসে উপস্থিত হল। তারপর টিকিট কেটে উঠল একটা মোটরলঞ্চে।

বিন্দু বলল: আমাদের জাহাজে উঠতে হবে কোথায়?

বলে বাদলের দিকে তাকাতেই সে বিব্রত হয়ে বলল: সেজন্যে ভাবতে হবে না। এই কোচিন দ্বীপেই জাহাজঘাটা।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: দেখে এসেছ তো।

বাদল আমতা আমতা করে বলল: ফোর্ট কোচিনের কাছেই আসতে হবে। যখন-তখন তো সেখানে ঢুকতে দেবে না! আর যখন মানপত্র নিয়ে আসব, তখন তো আর বাসে আসব না!

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন: বুঝেছি।

বুঝবেনই তো!

বলে বাদল বলল: এই যে দেখুন, আমাদের লঞ্চ ছাড়ল। এবারে চারিধারটা দেখতে দেখতে চলুন। আমরা কোচিন আর উইলিংডন এই দুই দ্বীপের মাঝখান দিয়ে যাব, তারপর—কী নাম যেন ঐ দ্বীপটার?

বলে বিকাশের মুখের দিকে তাকাতে ভানু বলল: বোলঘাট্টি।

বাদল তার কথাটা লুফে নিয়ে বলল: হ্যাঁ হ্যাঁ। ঐ বোলঘাট্টি দ্বীপেই আছে এখানকার ট্যুরিস্ট বাঙলো। এক সময়ে নাকি রাজাদের বাড়ি ছিল।

লঞ্চ এগিয়ে যাচ্ছিল। ডান হাতে দেখা যাচ্ছিল উইলিংডন দ্বীপের রেল-লাইন। কোচিনের রেলস্টেশন এই উইলিংডন দ্বীপেই। এই দ্বীপের উত্তরে একটি সুন্দর বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। বাদল বলল: এটা এখানকার বড় হোটেল। নাম মালাবার হোটেল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : তুমি এখানেও এসেছিলে নাকি ?

বাদল বলল : এই দ্বীপেই তো আসতে হয়েছিল। ল্যাঙ্কা দ্বীপের অফিস, ট্যুরিস্ট অফিস, কোচিন স্টেশন, এয়ারপোর্ট সবই এই দ্বীপে। অথচ এই দ্বীপটা নাকি কোচিন বন্দরের জন্যে সমুদ্রের মাটি কেটে তৈরি হয়েছিল।

তার মানে ?

সমুদ্র গভীর না হলে তো বড় জাহাজ ভিড়তে পারবে না, তাই মাটি কেটে এই খালেই ফেলা হয়েছিল।

তারাপদর দিদি হঠাৎ তারাপদকে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন : ডাক্তারবাবু না ?

ডাক্তারবাবু !

বলে চারিদিকে তাকাল তারাপদ। কিন্তু তার দিদি বললেন : এখানে ওই হোটেলে !

বাদল উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল : কোন্ ডাক্তারবাবু ?

তারাপদর দিদি বললেন : আমি আমাদের ডাক্তারবাবুর কথা বলছি। হিমাংশু ডাক্তার !

কিন্তু বাদল বলল : তিনি এখানে আসবেন কেন !

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : তাঁর কন্‌ফারেন্স্‌টা কোথায় ?

জানিনে।

কবে হবার কথা ছিল ?

বাদল বলল : তা-ও জানিনে।

নির্মাল্য মিশ্র আবার প্রশ্ন করলেন : কলকাতা থেকে বেরোবার আগে তুমি তাঁকে বলে এসেছিলে ?

না।

কেন ?

বাদল ভয়ে ভয়ে বলল : আপনার ভয়েই।

নির্মাল্য মিশ্র বলে উঠলেন : আমার ভয় কিসের ?

আপনি বলেছিলেন, ডাক্তারবাবু এলে আপনি আসবেন না। তাই আপনি রাজী হবার পর আর ডাক্তারবাবুর খোঁজ নিইনি।

তারাপদ তার দিদিকে জিজ্ঞেস করল : তুমি ঠিক দেখেছ দিদি ?

তারাপদর দিদি বললেন : ঠিক-বেঠিক বলতে পারব না। এক নজরে মনে হ'ল যে ডাক্তারবাবুর মতো একজনকে দেখলাম আর কয়েকজন

ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। ঠিক দেখেছি কিনা তা বলতে পারব না।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ চোখের ভুলও হতে পারে। দুনিয়ায় একরকম মানুষের তো অভাব নেই !

তারাপদর দিদি বললেন ঃ তা হতেই পারে।

মোটরলঞ্চ তখন ঘুরে এর্নাকুলম ফেরিঘাটের দিকে চলেছে।

সামনে ঘরবাড়ি, বিরাট হোটেল। আর বাঁ হাতে বোলখাট্টি দ্বীপে সেই ট্যুরিস্ট বাংলো। ফেরিঘাট থেকে মোটরলঞ্চ বেরিয়ে উত্তরে ও দক্ষিণের দিকে যাচ্ছে। নদীর মতো প্রশস্ত জলরাশি : এরই নাম ব্যাকওয়াটার। কেরলা রাজ্যের বৈশিষ্ট্য এটা। এই জলপথ দিয়ে কেরলের বাণিজ্য চলে সারা বছর। দক্ষিণের দিকে অ্যালেপ্পি নাকি নৌকোর রাজত্ব। ভেম্বলাভড লেক পেরিয়ে কোট্টায়ামে যাওয়া যায়। এই কোট্টায়ামের ওপর দিয়ে ট্রেন ত্রিবেন্দ্রামে পৌঁছবে। তারপর কন্যাকুমারী। এখন সেখানেও ট্রেন যাচ্ছে।

বিন্দু গম্ভীর হয়েছিল। বাদল বসে পড়তেই বলল ঃ ডাক্তারবাবু তো ভূত নয় যে অমন ভয় পেতে হবে! তিনি এখানে এসে থাকলেই বা আমাদের এমন ভয় পাবার কী আছে !

বাদল বলল ঃ ভয় নয়, ভাবনার কথা। আমরা তাঁকে ফেলে এসেছি জানতে পারলে তিনি দুঃখ পাবেন।

তিনিও তো আমাদের ফেলে এসেছেন! সময়মতো বললেই তো পারতেন যে কোথায় কবে তাঁর কনফারেন্স !

বলে সদানন্দবাবু এর্নাকুলম শহরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নির্মাল্য মিশ্র বাদলকে বললেন ঃ তোমার মন খারাপ করার দরকার নেই, তুমি লঞ্চেই ফিরে এসে হোটেলে খবর নাও। তাঁকে পেলে আমাদের লাক্ষা দ্বীপ যাত্রার কথা বোল।

বাদল চমকে উঠে বলল ঃ তারপর ?

তিনি যেতে রাজী হলে টিকিটের ব্যবস্থা কোরো।

আপনি তাই বলছেন ?

কিন্তু বিন্দু আপত্তি করে বলল ঃ না, ঝামেলা আর বাড়িয়ো না। তাঁকে সামলানো সোজা কথা নয় !

বাদল নিরুৎসাহ হয়ে বলল ঃ কিন্তু মানুষটা বড় ভাল। সোজা সরল মানুষ। রেখেঢেকে কথা বলতে পারেন না বলেই সবাই ভুল বোঝে।

অন্ধকার হবার আগেই লঞ্চ এসে ঘাটে লাগল। সবাই নেমে গেল একে একে। কিন্তু বাদলের মনটা যেন ভারি হয়ে রইল।

বাদল সকালবেলায় একবার বেরোতে চেয়েছিল। বলেছিল: জাহাজের ব্যাপারটা ভাল করে জেনে আসি—কোথা থেকে ছাড়ে, কখন পেঁছতে হবে ইত্যাদি।

বিন্দু আড়ালে ছিল। তৎপরভাবে বেরিয়ে এসে বলল: সেসব তো জেনেই এসেছিলে! আবার নতুন করে জানবার দরকার হল কেন?

তারাপদ বলল: বুঝতে পারছ না, সেই সঙ্গে ডাক্তারবাবুর খবরটাও জেনে আসা যাবে।

বিন্দু বলল: তাঁর টিকিটের জন্যে ভাবতে হবে না। নির্মাল্যদি নিজের টিকিটটাই দিয়ে দেবেন। তার চেয়ে চল, একটা ওষুধের দোকান থেকে বমির ওষুধ কিনে আনি, জাহাজে উঠে এক-একটা বড়ি খেয়ে নিলে বমির ভয় আর থাকবে না।

অতএব সকালে হোটেল থেকে বেরোনো আর হল না। হোটেলের ম্যানেজার ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিলেন। দুখানা ট্যাক্সি সব আরোহী ও মালপত্র নিয়ে ঠিক সময়ে জাহাজঘাটায় পেঁছে দিয়ে আসবে।

শেষ পর্যন্ত তাই হল। সবাই নিরাপদে জাহাজঘাটায় পেঁছে যথানিয়মে জাহাজে উঠে পড়ল। ভারতসীমা জাহাজখানা একনজরেই সবার পছন্দ হয়ে গেল। আন্দামানের মতো খোলের ভিতরে ঢুকতে হবে না, ডেকের ওপরেই রাত কাটানো যাবে। কাছাকাছি বসেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এবারে এইভাবে একসঙ্গে যেতে পারাই আমার সবচেয়ে বড় লাভ। আগের বারে আমাকে বেশ এক ঘরে করে রেখেছিলেন আপনারা।

বলে সদানন্দবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন: আগের বারে আপনি ছিলেন উকিলবাবু, এবারে নির্মাল্যদি হয়েছেন।

নির্মাল্য মিশ্র লজ্জিতভাবে বললেন: তাই বলে আপনিও আমাকে দিদি বলবেন না সদানন্দদা!

সদানন্দবাবু সহাস্যে বললেন: ছোটবোনকেও দিদি বলা যায়, তাই না দিদি?

বলে তারাপদর দিদির দিকে তাকালেন।

বাদল বলল: হ্যাঁ, সবাই এক নামে ডাকলে সবারই সুবিধে হয়।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: কিন্তু তুমি যে আবার বিন্দুর বাদলদা হয়ে বসে

আছো! দা ছেড়ে বাদল হয়ে যাও, অনেক সহজ হতে পারবে তোমরা। একালের ছেলেমেয়ে হয়েও তোমরা তুই-তোকারি না করলে চোখে একটু কেমন-কেমন লাগে।

তারাপদ বলল: মানে?

মানে, একটু বোকা-বোকা ভাব। কখনও এরকম হয় জানো তো? ঐ যে কী বলে—মানে—

বাদল বাধা দিয়ে বলল: না না, আপনাকে আর মানে বলতে হবে না! আদালতে চেঁচামেচি করে মুখে আর কোন আগল নেই আপনার!

নির্মাল্য মিশ্র হেসে একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিন্দু তৎপরভাবে বলল: আমরা তো লাক্ষা দ্বীপ দেখতে যাচ্ছি। কিন্তু এইসব দ্বীপকে প্রবাল-দ্বীপ বলে কেন নির্মাল্যদি? প্রবাল তো এরকম পাথর। প্রবালের আংটি পরে লোকে!

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন: ঠিক আছে, বাদলের কথার উত্তর আমি দেব না, তোমার প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছি। লাক্ষা দ্বীপকে প্রবাল-দ্বীপ কেন বলে তা জানতে হলে প্রবাল জিনিসটা কী, তা-ই আগে জানা দরকার। প্রবাল হীরের মতো খনি থেকে ওঠে না। আবার মুক্তোর মতো ঝিনুকের পেট থেকেও বেরোয় না। প্রবাল হল একরকমের সামুদ্রিক প্রাণী। বেশির ভাগই একনালী গোষ্ঠীর। এদের বাইরের ত্বক থেকে আঠাল রস বেরোয়, সমুদ্রের চুনের সঙ্গে মিশে সেই রস তার দেহের চারদিকে একটা কঠিন আবরণ সৃষ্টি করে। কালক্রমে এই আবরণই জমে পাথরের মতো কঠিন হয়ে যায়। এই পাথরই প্রবাল। বাঙলায় পলা, আর সংস্কৃতে বিদ্রুম বলে।

সদানন্দবাবু বললেন: প্রবাল যে এক রকমের প্রাণী তা জানতাম না।

বিন্দু বলল: কিন্তু প্রবালের দ্বীপ কিভাবে হয়?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: তা বলছি। আমাদের দেশের জ্যোতিষীরা গ্রহ-শান্তির জন্যে যে প্রবাল আংটিতে ধারণ করতে বলেন, তা হল রক্তপ্রবাল। গয়নায় এর ব্যবহার আছে, কোবরেজি ওষুধে প্রবালের ভস্ম ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই প্রবাল আসে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলি থেকে। প্রাচীনকাল থেকেই রক্তপ্রবাল এদেশে আসছে ঐখান থেকেই। কিন্তু প্রবাল নানা রঙের হয়, সাদা কালো লাল নীল হলুদ ও আরও অনেক রঙের। পণ্ডিতরা লক্ষ্য করেছেন যে এই প্রাণীর জন্ম ও বৃদ্ধির জন্যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও সমুদ্রের গভীরতা দরকার।

বাদল বলল ঃ বেশী ঠান্ডা, না বেশী গরম—কোন্‌টা সহ্য হয় না ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বেশী গরমে জন্মায়, কিন্তু ঠান্ডা একেবারেই সইতে পারে না। বিষুবরেখার দু'দিকে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যে ভালো থাকে। আরও কিছু উত্তরে ও দক্ষিণেও দেখা যায়। এই ধর, আটাশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা থেকে আটাশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা হল এদের বাসভূমি।

আর সমুদ্রের গভীরতা ?

তা আশি হাতের মধ্যে হওয়া দরকার। সাধারণত এইরকম গভীরতায় জলের তাপমান আঠারো থেকে বাইশ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে হয়।

বাদল সবিস্ময়ে বলল ঃ এইসব প্রাণীর মৃতদেহই কি জমে জমে দ্বীপ সৃষ্টি করে ?

নির্মাল্য মিশ্র সহাস্যে বললেন ঃ একদিনে নয়, দীর্ঘদিন ধরে এইসব প্রাণী জন্মের পর একই ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চুনের সঙ্গে মিলে কঠিন হয়ে সমুদ্রের তলদেশ থেকে জমতে জমতে উঁচু হয়ে ওঠে। যখন সমুদ্রের জলের ওপরে জেগে ওঠে, তখন তাকে চুনাপাথরের পাহাড় বলে মনে হয়। কিন্তু জলের ওপরে আর বেশি উঁচু হয় না। তার কারণ সমুদ্রের জল না পেলে প্রবাল প্রাণীর জন্ম বন্ধ হয়ে যায়। এইরকমের প্রবাল-দ্বীপ সমুদ্রের তীরের কাছে হয় ; দূরেও হয়। শ্রীলংকা নিকোবর বা মরিশাসকে বলে ফ্রিঞ্জিং রিফ। এরা মূল ভূখণ্ডের কাছে। আর অ্যাটল বলে দূরের দ্বীপকে। তাদের আকার গোল বা ঘোড়ার ক্ষুরের মতো। অথবা ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি মাঝখানে উপহ্রদ, তার নাম লেগুন। লাক্ষা দ্বীপ, মালদ্বীপ বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এই রকমের।

আর একরকমের দ্বীপ কী ?

তাকে বেরিয়ার রিফ বলে, তার আকার প্রাচীরের মতো। খুব স্থূল, আর সমুদ্রের দিকের জলও খুব গভীর।

তারাপদ বলল ঃ গ্রেট বেরিয়ার রিফ তো অস্ট্রেলিয়ার কাছে !

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ঠিক বলেছ। ভূগোল আরও অনেক প্রবাল-দ্বীপের নাম পাবে। আর প্রবাল-দ্বীপ দেখবার জন্যে শ্রীলংকায় একরকমের নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়। তার নিচে কাচ লাগানো বলে জলের তলায় প্রবালের পাহাড় দেখা যায়।

বাদল বলল ঃ লাক্ষা দ্বীপেও এইরকমের নৌকো আছে বলে শুনেছি।

বিন্দু বলল ঃ তাহলে আমরাও নৌকোয় চেপে প্রবাল-দ্বীপ দেখব। সমুদ্রে নৌকোয় চাপতে ভয় করবে না?

বলে বাদল নির্মাল্য মিশ্রের মুখের দিকে তাকাল। নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ভয় পেলে কোন বড় কাজই করা যায় না। জীবনটা উপভোগ করতে হলে ভয়কে সবার আগে জয় করতে হয়। এই যে আজ আমরা জাহাজে চেপে নির্ভয়ে লাক্ষা দ্বীপের দিকে যাচ্ছি, এই সাহস আমাদের কোথা থেকে এলো? আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রাণের মায়া ছেড়ে যদি সমুদ্র জয় করতে না বেরোত, তাহলে এই সাহস আমরা কোথা থেকে পেতাম? একজনকে দেখেই তো আর একজনের সাহস বাড়ে!

বাদল ভয় পেয়েছে দেখে বিন্দু বলল ঃ জাহাজ ছাড়তে তো এখনও দেরি আছে নির্মাল্যদি, কোচিনের সম্বন্ধে কিছু বলবেন না?

সদানন্দবাবু বললেন ঃ ইতিহাসের কথাই বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বাদল কি আমাকে এই কাজের জন্যেই দলে নিয়েছ?

বাদল বলল ঃ আপনি অনেক কিছু জানেন কিনা, তাই সবাই আপনার কাছেই জানতে চায়।

বিন্দু বলল ঃ আর বলারও একটা কায়দা আছে। সেটাও আয়ত্ত করার জিনিস।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বুঝেছি।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ তবে বলুন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ কোচিন খুব প্রাচীন বন্দর নয়। মানে ছ-সাতশো বছর আগে এটি কোকাটি নদীর তীরে একটি ছোট শহর ছিল। শুনেছি যে ১৩৪১ সালের একটি প্রবল বন্যায় এই অঞ্চলটা অন্যরকম হয়ে যায়, আর কোচিন একটি বন্দরে পরিণত হয়।

তারপর?

ভাস্কো ডা গামার কথা মনে পড়ে? তিনি ছিলেন পর্তুগীজ নাবিক এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে তিনি ইউরোপ থেকে সমুদ্র-পথে ভারতে আসার পথ আবিষ্কার করেন। প্রথমবারে তিনি কালিকটের নিকটে এসে পৌঁছেছিলেন এবং দ্বিতীয়বারে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে দ্বিতীয়বার এসে কোচিনে একটি কুঠি স্থাপন করেন। এদেশে তাঁর প্রধান কাজ হল আরব বণিকদের হাত থেকে বাণিজ্য ছিনিয়ে

নেওয়া। তার জন্যে তিনি তাদের সঙ্গে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করেছেন, ভয় দেখিয়েছেন, এমনকি অত্যাচারও করেছেন। তাঁর পরে আলবুকার্ক এদেশে এসে কোচিনে একটা দুর্গ নির্মাণ করেন। তার নাম ম্যানুয়েল কোট্টা। তাঁরা আসবার পরেই কোচিন শহরের পত্তন হয়। আর উন্নতি হয় ওলন্দাজদের অধিকারে আসবার পরে। ইংরেজ এই স্থান অধিকার করে ১৮১৪ সালে।

সদানন্দবাবু সবিস্ময়ে বললেন : সন তারিখও আপনার মনে আছে!

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন : এসব তো কোন পাঠ্যপুস্তকে পড়িনি। এদিকে আসব বলে বইপত্র দেখে এসেছি। সম্প্রতি দেখেছি বলেই মনে আছে, ফিরে যাবার পর হয়তো আর মনে থাকবে না। যাই হোক, স্বাধীন ভারতে কোচিন একটি প্রধান বন্দর। এখান থেকে নারকেল তেল, ছোবড়া, কাঠ, তুলো, গোলমরিচ প্রভৃতি বাইরে রপ্তানি হয়। যে বই থেকে এসব বলছি, তাতে লেখা আছে যে সরকার এখানে একটি জাহাজনির্মাণের কারখানা, তৈল-শোধনাগার প্রভৃতি স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তৈরি হয়েছে কিনা বলতে পারব না।

বাদল বলল : ভাস্কো ডা গামা নামেও একটি বন্দর আছে শুনেছি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : বন্দর নয়, শহর। বন্দরের নাম মার্মাগাও। এই বন্দর গোয়ায়। মাইল দুই ভেতরে ভাস্কো ডা গামা হল একটি শহর। বন্দর ও শহরের মধ্যে মালবাহী ট্রেন চলাচল করে। বম্বে থেকে বাসে বা ট্রেনে গোয়ায় আসা যায়। যাত্রীবাহী জাহাজ বম্বে থেকে গোয়ার রাজধানী পানাজিতে আসে। এর দক্ষিণে ম্যাঙ্গালোর বন্দর। কোচিন আরও দক্ষিণে।

সদানন্দবাবু বললেন : আমার ধারণা ছিল যে কালিকট থেকে লাক্ষা দ্বীপ যেতে হয়।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আমিও তাই জানতাম। কিন্তু আগে কালিকট থেকেই যেতে হত কিনা তা বলতে পারব না। কারণ আন্দামান-ফেরত অনেকের সঙ্গেই পরিচয় আছে। কিন্তু লাক্ষা দ্বীপে কেউ গেছেন বলে এখনও শুনিনি।

বাদল সগৌরবে বলল : আমরাই বোধ হয় প্রথম ট্যুরিস্ট। অন্তত আমাদের পাড়া থেকে এর আগে কেউ যায়নি।

পাড়া তো খুবই ছোট, তাই সেখানে প্রথম হয়ে গর্ব করবার কিছু নেই। বাঙলায় যদি কিছু লিখতে পারো, তাহলেই এই যাত্রা সার্থক হবে।

বিকাশ ও ভানু এই আসরে ছিল না, তারা জাহাজের চারদিকে ঘুরে

দেখতে গিয়েছিল। হঠাৎ তারা হন্তদন্ত হয়ে এল। তাদের দু'চোখে ত্রাসের দৃষ্টি। বিকাশই প্রথমে কথা কইল, বলল ঃ সর্বনাশ!

দম দেওয়া পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে উঠে বাদল বলল ঃ কী হয়েছে?

ভানু বলল ঃ যে ভয় পেয়েছিলে, তাই হল।

মানে?

বিকাশ ভয়ার্ত স্বরে বলল ঃ তোমার দক্ষিণ রায়!

এখানে?

এই জাহাজে। কেবিনের বাইরে বসে পাইপ টানছেন! দূর থেকে দেখেই আমরা পালিয়ে এলাম।

বাদল বলল ঃ তোমরা ঠিক দেখেছ?

বিকাশ বলল ঃ দক্ষিণ রায়কে চিনতে পারব না আমরা!

সদানন্দবাবু বললেন ঃ তাহলে হীরা বাঘ, তুমি তোমার প্রভুকে একটা প্রণাম করে এসো।

তারাপদর দিদি হাসতে লাগলেন। বললেন ঃ এবারে তো আমরা সুন্দরবন পেরিয়ে যাচ্ছি না। এবারে আমাদের দক্ষিণ রায়কে ভয় কিসের!

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র এসব কথায় কান দিলেন না। আন্দামানযাত্রার সময়ে তিনিই ডাক্তার হিমাংশু মৈত্রকে দক্ষিণ রায় বলেছিলেন। দক্ষিণ রায় সুন্দরবনের লোকের কাছে বাঘের দেবতা বলে পুজো পান। তাঁর বাহনের নাম হীরা বাঘ। এই নামটি বাদলকে দিয়েছিল বিন্দু, দক্ষিণ রায়ের গল্প শোনাবার পরে। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র সেদিনের মতো তরল উপহাসে আজ যোগ দিলেন না। তিনি বরং গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বাদল বলল ঃ আমি তাহলে দেখেই আসি, কী বলেন?

বলে সদানন্দবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন ঃ দেখবে বৈকি। তবে আমাদের মধ্যে তাঁকে টেনে এনো না।

বাদল সম্মত হয়ে বিকাশকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

বাদল আর বিকাশ ডাক্তার হিমাংশু মৈত্রর খোঁজ নিতে যাবার পর অনেক সময় কেটে গেল। চারিদিকের শব্দ ও ব্যস্ততা দেখে মনে হচ্ছিল যে এবারে বোধ হয় জাহাজ ছাড়বে। কিন্তু বাদলরা ফিরছিল না। বিন্দু অস্থিরভাবে তাকাচ্ছিল চারিদিকে। তাই দেখে নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তোমার ভাবনা কিসের?

বিন্দু বলতে পারল না যে ভাবনা নির্মাল্য মিশ্রর জন্যেই। ডাক্তারবাবুর

কাণ্ডজ্ঞান কম, মতির কোন স্থিরতা নেই। তিনি কেবিন ছেড়ে ডেকে চলে আসতে পারেন। আবার নির্মাল্য মিশ্র ডেকে আছেন শুনলে তাঁর জন্যে কেবিনের ব্যবস্থা করতেও বলতে পারেন। সবই তাঁর মেজাজের ওপর নির্ভর করছে। বাদল এইসব কথা মনে রাখতে না পারলেই বিপদ। তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়নি। ডাক্তারবাবুর কথায় সে যে কী ব্যবস্থা করছে তা না-জানার জন্যেই বিন্দুর উদ্বেগ। এদিকে নির্মাল্য মিশ্রকে ফেলে কোথাও যাওয়া যায় না। তাঁর মেজাজ বোঝা যাচ্ছে না শান্ত চেহারা দেখে। ডাক্তারবাবু নাম শুনে তিনি আরও শান্ত হয়ে গেছেন। তাঁকে এদিকে আসতে দেখলে হয়তো জাহাজ থেকে নেমেই যাবেন। সে ভয়ও আছে বিন্দুর। তাই তাঁকেও পাহারা দিতে হচ্ছে, আর অপেক্ষা করতে হচ্ছে জাহাজ ছাড়ার। জাহাজ ছাড়লেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। যদি গোলমাল কিছু হয় তো জাহাজেই হবে, জাহাজ থেকে নেমে যাবার সুযোগ পাবেন না কেউ।

এক সময়ে সত্যিই জাহাজ ছাড়ল। এ গঙ্গা নয়, গঙ্গাসাগর নয়, বঙ্গোপসাগরও নয়। এ হল আরব সাগর। অনেক শান্ত ও স্থির জল। এ সাগরে আকাশ-ছোঁয়া ঢেউ আসে না গর্জন করে, কালনাগিনীর মতো মাথা তুলে ফোঁস করে না সারাক্ষণ। তার জন্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষা করতে হয় ঝড়ের। ঝড় না উঠলে সমুদ্রের জল উত্তাল হয়ে উঠবার সময় পায় না। তাই আরবসাগর সমুদ্রের মতো দুরন্ত নয়, শান্ত সরোবরের মতো।

ভারতসীমা জাহাজ যাত্রা করল লাক্ষা দ্বীপের দিকে। সারারাত চলে সকালে পৌঁছবে সবচেয়ে কাছের দ্বীপ কল্পেনিতে। দূরত্ব দুশো কিলোমিটারেরও কম। তাই ভোরবেলায় হয়তো চোখ মেলেই দেখা যাবে কল্পেনি দ্বীপকে। ঘণ্টা পাঁচ-ছয় সেখানে জাহাজ দাঁড়াবে। এই সময়ের মধ্যেই যতটা সম্ভব দেখে নিতে হবে। আসলে যাত্রীর জন্যে জাহাজ নয়, জাহাজ পণ্যবহনের জন্য। সেই ফাঁকে যাত্রীরা দ্বীপ দেখে। যাঁরা এইসব দ্বীপে আসেন, তাঁরা নির্দিষ্ট দ্বীপে নামবার জন্যেই টিকিট কাটেন।

সূর্যাস্তের তখনও দেরি ছিল। পশ্চিমের আকাশ তখন তার প্রসাধন শেষ করেনি, রঙের ছোঁয়া লেগেছে শুধু। সমুদ্রের জলে প্রতিবিম্ব ক্ষণে ক্ষণে পাল্টাচ্ছে। জল এখনও নীল আছে, কোথাও হাল্কা নীল, তার ওপরে সূর্যকিরণের ছটা। কিছুক্ষণ পরেই কালো হয়ে যাবে সবকিছু। আকাশে তারা উঠলে তারই ছায়া পড়বে নিচু ঢেউয়ের মাথায় মাথায়। মনে

হবে যেন সমুদ্রের জলে নৃত্যের সভা বসেছে আকাশের নক্ষত্রদের। নির্মাল্য মিশ্র অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্যে।

এই সময়ে বাদল এসে উপস্থিত হল হুড়মুড় করে, পিছনে বিকাশ। বলল: খুব বিপদে পড়ে গেছি।

সদানন্দবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন: বিপদ কিসের!

বাদল বলল: ডাক্তারবাবু কেবিন ছেড়ে আমাদের সঙ্গে থাকতে চাইছেন।

আমাদের সঙ্গে কেন?

তাঁর একা ভাল লাগছে না।

নির্মাল্য সচকিত হয়ে বললেন: তিনি তো একাই এখানে এসেছিলেন এবং একা থাকতেই তিনি ভালবাসেন! হঠাৎ তাঁর এই পরিবর্তন কেন?

বাদল বলল: বড় খেয়ালী মানুষ তিনি। যখন যেটা জেদ ধরেন, তখন একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে যান।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: খেয়ালী, না খামখেয়ালী?

বাদল বলল: ঐ যা বলেন আপনি।

সদানন্দবাবু বললেন: ব্যাপারটা একটু খুলে বল তো বাদল। এখানে এই জাহাজে তিনি উঠলেন কেন?

বাদল বলল: এই কোচিনেই ছিল তাঁর মেডিকেল কনফারেন্স। কলকাতায় আমার খোঁজ করেছিলেন, না পেয়ে কোন খবর না দিয়েই উড়ে চলে এসেছিলেন। তারপর লাক্ষা দ্বীপের জাহাজ আজ ছাড়ছে শুনে একাই জাহাজে এসে উঠেছেন।

নির্মাল্য মিশ্র গম্ভীর হয়ে বললেন: বুঝেছি।

তারাপদর দিদি বললেন: আমিও বুঝেছি।

বলে বাদলের দিকে তাকাতেই বাদল আর্তনাদের সুরে বলে উঠল: বিশ্বাস করুন আমাকে, আমি এর কিছুই জানতাম না।

তারাপদর দিদি বললেন: বিন্দুবিসর্গও নয়!

বিন্দু বলে উঠল: আমাকে এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন?

তারাপদ বলল: একটু সন্দেহের ব্যাপারই বটে।

বাদল কাঁদকাঁদ স্বরে বলল: আর কেউ না করুক, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন নির্মাল্যদি! সত্যিই আমি কিছু জানলে আপনার কাছে লুকোতাম না। বিপদটা তো আমারই। আমি কেন বিপদের মুখে সেধে আসব বলুন!

সদানন্দবাবু বললেন ঃ তা বিপদটা কিসের! ডাক্তারবাবু যদি আমাদের সঙ্গে এসে থাকতে চান তো থাকবেন! কেবিনটা যেন ছেড়ে দিয়ে না আসেন।

কেন ?

এখানে যদি তাঁর ভাল না লাগে তো আবার সেখানে ফিরে যাবেন। অথবা অন্য কেউ বিরক্তিবোধ করলে তিনি তারই কেবিনে চলে যেতে পারবেন।

বিন্দু বলে উঠল ঃ বাবা খুব ভাল কথা বলেছে। ডাক্তারবাবু কাউকে জ্বালাতন করলে তিনি তাঁরই কেবিনে গিয়ে থাকবেন।

সবাই জানে যে ডাক্তারবাবুর ব্যবহারে বিরক্ত হন শুধু নির্মাল্য মিশ্র। কিন্তু তিনি একটিও কথা বললেন না।

বাদল বলল ঃ তাহলে ডাক্তারবাবুকে এই কথাই বলি !

নির্মাল্য মিশ্র সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন। কোচিন বন্দর চোখের সামনে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এক সময়ে মিলিয়ে যাবে। তারপর অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেলে শহরের বাতি দেখা যাবে তারার মতো। নির্মাল্য মিশ্র গুনগুন করে একটা গানের সুর ধরলেন। শুধু সুর, কোন কথা নয়।

বাদল নিচু গলায় বলল ঃ নির্মাল্যদির কথা জানতে চাইছিলেন। বলছিলেন, গানের গলা তাঁর ভারি মিষ্টি। আন্দামানের পথে যে ভজন গানটি শুনিয়েছিলেন, তেমন গান অনেকদিন শোনেন নি।

তারাপদর দিদি বললেন ঃ তাহলে ডেকে আনো না ডাক্তারবাবুকে। তিনি এলে নির্মাল্যদিকে গাইতে বলা যাবে।

বাদল সোৎসাহে বলে উঠল ঃ ডেকে আনব ?

বিন্দু গম্ভীর গলায় বলল ঃ না। তিনি নিজে থেকে এলে অন্য কথা।

কিন্তু বাদল ততক্ষণে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেছে কেবিনের দিকে। তার উল্লাস লক্ষ্য করে সদানন্দবাবু বললেন ঃ কী রকম খুশি হয়েছে দেখ।

বলে মেয়ের দিকে তাকালেন। মেয়ে বিন্দু তখন নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর মনের ভাব অনুভব করার চেষ্টা করছিল।

নির্মাল্য মিশ্র হঠাৎ চোখ তুলে বললেন ঃ ডেকের ওধার থেকে অকূল সমুদ্র কেমন দেখায় দেখবে না বিন্দু ?

বলে তিনি উঠে পড়লেন।

বিন্দু এই রকমই আশংকা করেছিল। বলল : আপনি কি ওধারে যাবেন ?

তুমিও আসবে ?

বলে নির্মাল্য মিশ্র ধীর পদক্ষেপে অন্য ধারে চলে গেলেন। বিন্দু তাঁকে অনুসরণ করল।

নির্মাল্য মিশ্র বিন্দুর পায়ের শব্দ পেয়ে বললেন : এই অঞ্চলের ম্যাপটা মনে করবার চেষ্টা কর। আমরা কোচিন থেকে সোজা পশ্চিমে চলেছি। ভারতের মূল ভূখন্ড ও লাক্ষা দ্বীপের মাঝে আরব সাগরের এই অংশকে বলে লাক্ষা দ্বীপ সী। সামান্য একটু উত্তরে উঠলে কল্পেণি দ্বীপ, আর দক্ষিণে নামলে মিনিকয়। মাঝখানে নাইন ডিগ্রি চ্যানেল। কোচিনের উত্তরে কালিকট বন্দর। সেখান থেকে সোজা পশ্চিমে এলে কিল্টন দ্বীপ, দক্ষিণে অ্যানড্রট, কল্পেণির ঠিক উত্তরে। ম্যাঙ্গালোর ও কালিকটের মাঝখানে ক্যানোনোর বন্দর। সেখান থেকে পশ্চিমে এলে চেট্‌লাট দ্বীপ, কিল্টন দক্ষিণে। কল্পেণি থেকে আমরা কাবারাট্টি যাব। তাকে এই দ্বীপপুঞ্জের মাঝখানে বলতে পার। পাখিদের দ্বীপ পিট্টি কাবারাট্টির পশ্চিমে, উত্তরে আমিনি ও কডমট। আগাট্টি ও বঙ্গারামও পশ্চিমে। বিট্‌রা চেট্‌লাটের পশ্চিমে।

তারপরেই জিজ্ঞেস করলেন : মনে থাকবে !

বিন্দু ভয়ে ভয়ে বলল : না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : শুনে এসব মনে রাখা খুবই কঠিন। একখানা ম্যাপ দেখাতে পারলে মনে রাখার সুবিধে হত। এখানে আসবার আগে আমি একখানা ম্যাপ দেখে এসেছিলাম। এইটুকু মনে রেখো যে, এই দ্বীপগুলো কেরলের মালাবার উপকূলের কাছে লাক্ষা দ্বীপ সী পেরিয়ে। কোচিন থেকে কল্পেণি যেতে বারো ঘণ্টা সময় লাগে। আর মিনিকয় থেকে কোচিন আসতে ষোল ঘণ্টার দরকার। আর এ দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াত করতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। ট্রেনে একটা বড় স্টেশন থেকে আর এক বড় স্টেশনের মতো।

বিন্দু বলল : জাহাজ ছাড়তে ও আর এক জায়গায় ভিড়তেই তো অনেক সময় লেগে যায়। তাই না ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : উপায় তো নেই। তীরের কাছে জল কম থাকে বলেই খুব সাবধানে জাহাজ জেটির কাছে আনতে হয়। তারপর নৌকোয় করে তীরের কাছে। নৌকোয় ওঠা-নামা করতে হয় কসরত করে।

পশ্চিমের আকাশে তখন রঙের খেলা শুরু হয়ে গেছে। সেই দিকে চেয়ে তিনি হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন। কিন্তু বিন্দু দেখল যে একজন অল্প-বয়সী ভদ্রলোক তাঁদের লক্ষ্য করছিলেন। নির্মাল্য মিশ্রর দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়েছিল কিনা বিন্দু তা বুঝতে পারল না। কিন্তু ভদ্রলোক পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে হিন্দিতে বললেন : নমস্তে।

বিন্দু কোন উত্তর দিল না, কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র সমুদ্রের দিকে চেয়েই বললেন : নমস্তে।

ভদ্রলোক বললেন : আপনারা কি লাক্ষা দ্বীপে এই প্রথম যাচ্ছেন ?

নির্মাল্য মিশ্র এবারে মুখ তুলে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন কঠিন দৃষ্টিতে। তাঁর আপাদমস্তক দেখে বললেন : লাক্ষা দ্বীপে কেউ বারে বারে যায় বলে শুনিনি।

ভদ্রলোক এই মহিলার কঠিন দৃষ্টি ও মন্তব্যে কিছু কুঁকড়ে গিয়ে বললেন : আমাদের বারে বারেই যেতে হয়।

কেন ?

বলে নির্মাল্য মিশ্র ফিরে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক তাঁর সংকোচ কাটিয়ে বললেন : পেটের দায়ে চাকরি করতে গেলে ঘরের মায়া ছেড়ে যাওয়া যায় না তো! তাই যাতায়াত না করে আর উপায় কী!

বিন্দু বলল : আপনি তাহলে অনেকদিন আছেন সেখানে!

কয়েক বছর।

কেমন লাগে আপনার ?

ভদ্রলোক বললেন : প্রথম প্রথম ভাল লাগত।

এখন সুযোগ পেলেই পালিয়ে আসব।

নির্মাল্য মিশ্র এবারে প্রশ্ন করলেন : পালিয়ে আসবেন কেন ?

ভদ্রলোক বললেন : ঘরবাড়ি ছেড়ে বেশিদিন সেখানে ভাল লাগে না। আপনারা তো বেড়াতে যাচ্ছেন, আপনাদের ভাল লাগবে। কিন্তু ভদ্রলোক থামতেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন : বলুন, কী বলতে চান।

ভদ্রলোক বললেন : আপনারা কিছুদিন থাকবেন তো ?

না।

সেকি, আপনাদের কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব নেই ?

লাক্ষা দ্বীপে ?

হ্যাঁ, আমি দ্বীপেই পরিচিত মানুষের কথাই জিজ্ঞেস করছি।

বিন্দু বলল ঃ এখানে আমাদের কে থাকবে বলুন ! আমরা তো কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি !

তবে কি আপনারা এই জাহাজেই ফিরে যাবেন ?

ঠিক তাই !

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ তাহলে আপনারা লাক্ষা দ্বীপের কী দেখবেন ! এত পয়সা খরচ করে এত দূরে এসে এইভাবে ফিরে যাবেন আপনারা !

মনে হল যে তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না সব কথা। ভাবছিলেন যে সংসারে এমন বোকা কে আছে যে এই দুর্মূল্যের বাজারে এইভাবে পয়সা নষ্ট করে !

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ পয়সা খরচ করবার জন্যেই এসেছি। কেউ যা নষ্ট হচ্ছে মনে করে, অপরে তাকেই সঞ্চয় ভাবে। আমরা পয়সা খরচ করে কিছু আনন্দ সঞ্চয় করে ফিরে যেতে চাই।

ভদ্রলোক থমকে গেলেন এই উত্তর শুনে। তারপর সরে যেতে যেতে বললেন ঃ আমাকে ক্ষমা করবেন।

না।

বলে নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ নিজের পরিচয়টা দিয়ে যান। আমার নাম নির্মাল্য মিশ্র। আর এর নাম বিন্দু।

ভদ্রলোক ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমাকে সদাগোপালন বলবেন। আমি এদিকেরই লোক।

নির্মাল্য মিশ্র এগিয়ে গিয়ে বললেন ঃ কত দিন আছেন এখানে ? মানে লাক্ষা দ্বীপে ?

ভদ্রলোক বললেন ঃ বছর তিনেক হতে চলল। বদলির জন্যে তদ্বির করতে গিয়েছিলাম। দ্বীপে তো কোন সোর্স নেই, তাই দেশের আত্মীয়দের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোন ফল হল না। আজকাল কেউ কারও জন্যে কিছু করতে চায় না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ সবাই যে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত !

ঠিক বলেছেন।

বিন্দু বলল ঃ আপনি কি এখন এই দিকেই থাকবেন নির্মাল্যদি ?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তুমি বরং ফিরে গিয়ে বল যে আমি আরও কিছুক্ষণ এই দিকেই আছি। আসুন মিস্টার সদাগোপালন, ঐ দিকটায় বসে আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটাই।

বলে সদাগোপালনকে একটা কোণার দিকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন। বিন্দু কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরে গেল নিজেদের দলের কাছে।

তাকে একা ফিরতে দেখে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত হলেন ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র। বললেন ঃ ভদ্রমহিলাকে কোথায় রেখে এলে ?

বিন্দু একবার তার বাবার দিকে তাকাল, তারপর বাদলের দিকে চেয়ে বলল ঃ মিস্টার সদাগোপালনের কাছে।

তিনি আবার কে ?

বলে গর্জন করে উঠলেন ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র।

বিন্দু ভয়ে ভয়ে বলল ঃ একজন যাত্রী।

তবে আর ভাবনা কী! যত সব!

বলে তিনি দুমদুম করে পা ফেলে ফিরে চললেন। বাদল পেছনে যেতে যেতে বলল ঃ তাহলে কি আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন না ?

থেকে আর লাভ কী হবে!

তারাপদ এগিয়ে এসেছিল, বলল ঃ শুধু লোকসানই হবে। কেবিনের আরাম কি ডেকে আছে ? আর দিনেরবেলায় তো আমরা একসঙ্গেই বেড়াব। যাবও একসঙ্গে।

তার মানে ? বাদল বলল

ডাক্তারবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ জাহাজে আমাদের আলাদা খাবার ; কেবিনে আপনি অনেক ভাল খাবেন। কিন্তু দ্বীপে নামলে সবার জন্যেই এক ব্যবস্থা। সেখানে আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই।

হুঁ।

বলে ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র তাঁর কেবিনে চলে গেলেন। আর বাদল ফিরে এসে একটা হাঁপ ছেড়ে বিন্দুকে বলল নির্মাল্যদিকে এই খবরটা দিয়ে আসতে। ডাক্তারবাবু ফিরে গেছেন শুনলেই ভদ্রমহিলা ফিরে আসবেন বলে তাদের ধারণা।

সূর্য তখন অস্তাচলে যাচ্ছে। আরব সাগরের নীল জলে আলোর খেলা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। এবারে জলের রঙ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে লাগল। পূবের আকাশ থেকে অন্ধকার নামলেই জলের রঙ হয়ে যাবে মিশ-কালো। তার ওপরে তারার আলো চিকচিক করে নাচবে মন্দ বাতাসে।

সকালবেলায় জাহাজ থেকে নামবার সময়ে নির্মাল্য মিশ্রকে খুঁজে পাওয়া

গেল না। গতকাল ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র বিরক্ত হয়ে ডেক ছেড়ে চলে যাবার কিছু পরেই তিনি এসেছিলেন। রাতে সবার সঙ্গে বসে খেয়েছিলেন। জানা গিয়েছিল যে ভোর রাতেই এই জাহাজ কম্পোনি দ্বীপের কাছে নোঙর করবে। বেলা বারোটার আগেই দ্বীপের দর্শনীয় সর্বকিছু দেখে জাহাজে ফিরে আসতে হবে। বারোটায় জাহাজ ছাড়বে এবং বিকেল পাঁচটার মধ্যেই কাবারাট্টি দ্বীপে পেঁছানো যাবে। সকালবেলায় তাড়াহুড়ো করে জাহাজ থেকে নেমে পড়তে হবে বলে সবাই যে যার মতো ব্যস্ত ছিল, কেউ কারও কোন খবর রাখবার চেষ্টা করেনি। জাহাজ থেকে নৌকোয় নেমে দ্বীপে পেঁছতে হবে বলে সবার মনেই ভয় ছিল অপরিসীম। কিন্তু নামবার সময়ে নির্মাল্য মিশ্রকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র কেবিন থেকে ডেকে চলে এসেছিলেন। তিনি নির্মাল্য মিশ্রের এই অন্তর্ধানের খবর পেয়ে রীতিমতো ক্ষেপে গেলেন। বললেন: তোমাদের যে কোন দায়িত্বজ্ঞান নেই, তা জানতাম না। একজন মহিলাকে সঙ্গে এনেছ, অথচ তাঁকে চোখে চোখে রাখছ না।

সদানন্দবাবু বললেন: তিনি তো বাচ্চা মেয়ে নন যে তাঁকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হবে!

তারাপদর দিদি বললেন: এ কাজের ভারটা আপনিই নিন না ডাক্তারবাবু! আমরা যখন পারছি না—

তাই নিতে হবে দেখছি!

বলে গটমট করে এগিয়ে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন: বাদল।

বাদলের পিলেসুদ্ধ চমকে উঠল, ভয়ে ভয়ে তাকাল ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে।

ডাক্তারবাবু বললেন: জাহাজের ক্যাপ্টেনকে একটা খবর দেবে না?

এই সময় বিকাশ আর ভানু ছুটে এসে খবর দিল যে নির্মাল্য মিশ্র আগেই জাহাজ থেকে নেমে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন সদাগোপালন নামের সেই ভদ্রলোক। তিনিই নির্মাল্য মিশ্রকে দ্বীপটা দেখাবেন বলে আগেভাগেই নেমে পড়েছেন।

ডাক্তারবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন: কার কাছে এ খবর পেলে?

বিকাশ বলল: জাহাজের খালাসিদের কাছে। সদাগোপালন তাদের পরিচিত। তাই তারা আগেই তাদের নামবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

বুঝেছি।

বলে ডাক্তারবাবু এগিয়ে গেলেন।

তারাপদর দিদি বললেন : ভাই বাদল, নির্মাল্যদির জন্যে একটা কেবিন পাওয়া যায় কিনা চেষ্টা করে দেখো না! তা নাহলে তোমাকে অনেক বকুনি খেতে হবে।

নির্মাল্য মিশ্র সত্যিই সদাগোপালনের সঙ্গে জাহাজ থেকে নেমে গিয়েছিলেন। খালাসিরা সদাগোপালনকে চেনে সরকারী লোক বলে। তাই তাঁদের আগেই নেমে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সকালে সূর্য উঠবার আগেই দুজনে দ্বীপটা ঘুরে দেখবার জন্যে তৈরি হয়ে নিয়েছিলেন। একসঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সদাগোপালন বললেন : এইসব দ্বীপ পায়ে হেঁটে দেখা সম্ভব নয় ভাববেন না। এই কল্পেনি দ্বীপটা লম্বা-চওড়ায় কত বড় তা বলতে পারব না। তবে আমিনি দ্বীপ লম্বায় তিন কিলোমিটার আর চওড়ায় তার অর্ধেক বলে জানি। তার মানে দু'মাইল লম্বা আর এক মাইল চওড়া। এর তিরিশ মাইল দূরে কিল্টন দ্বীপ লম্বায় সমান হলেও চওড়ায় আধ মাইলেরও কম। আর দ্বীপটা তো ঝড়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : কী রকম?

সদাগোপালন বললেন : শুনেছি যে ১৮৪৭ সালে এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছিল কয়েকটি দ্বীপের ওপর দিয়ে। তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল এই দ্বীপেই। ঝড়ে সমুদ্রের জল উত্তাল হয়ে উঠে বিপুল বেগে দ্বীপের সরু অংশের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। তাতে সব গাছপালা এবং পঞ্চাশ-ষাটটা বাড়ি ভেসে যায়, নিখোঁজ হয়ে যায় শ'দুই মানুষ। আর সমুদ্রের ধারে একটা প্রবালের প্রাচীর উঁচু হয়ে ওঠে। এই ঝড় চলেছিল এক ঘণ্টা ধরে। তারপর ঝড় থামলে নেমে আসে একটা অদ্ভুত নীরবতা। দ্বীপে যেন আর মানুষজন নেই। একটা সরকারী হিসেবে জানা গেছে যে, ঝড়ের আগে এই দ্বীপে বাড়ির সংখ্যা ছিল তিনশো আটচল্লিশ, আর এই দ্বীপের মোট অধিবাসীর সংখ্যা দেড় হাজারের কিছু বেশি। ঝড়ের পরে একটি বাড়িও আর মাটির উপর দাঁড়িয়ে ছিল না।

আর মানুষ?

দু'শো ছেচল্লিশ জন জলে ভেসে গিয়েছিল, কিংবা ডুবে মারা গিয়েছিল। পরের পাঁচ মাসে না খেয়ে বা রোগে মারা পড়েছিল একশো বারো জন। ভেসে গিয়েও প্রাণরক্ষা করতে পেরেছিল তিনশো ছিয়াত্তর জন।

দ্বীপে যে ন'শো আট জন ছিল, তার পাঁচভাগের বার ভাগই শিশু ও স্ত্রীলোক।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: এই দ্বীপটা দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল বলেছিলেন।

সদাগোপালন বললেন: ঠিকই বলেছি। কম্পোনির ঠিক উত্তরেই চোরিয়রাম দ্বীপ। এই ঝড়ের নাকি চোরিয়রাম দ্বীপটি কম্পোনির মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন এই দুই দ্বীপের মাঝখানে একটি রিফ গড়ে উঠছে। ভাঁটার সময়ে জল শুকিয়ে গেলে হেঁটে চলে যাওয়া যায় এই দ্বীপ থেকে ওই দ্বীপে।

সত্যি!

সত্যি বলেই তো জানি।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: হেঁটে সমুদ্র পার হয়ে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাওয়া ভারি রোমাঞ্চকর ব্যাপার বলে মনে হয়। দু'ধারেই তো গভীর সমুদ্র!

তারপরেই বললেন: আসুন, এই ছায়ায় বসে অন্য দ্বীপগুলির কথাও শুনে নিই আপনার কাছে।

বলে একটি পরিচ্ছন্ন জায়গা দেখে বসলেন। সদাগোপালন বসলেন খানিকটা তফাতে নির্মাল্য মিশ্রের দিকে মুখ করে। বললেন: সব কথা আমিও জানিনে, যতটুকু জানি তা বলছি।

বলুন।

কাবার্রাট্টু দ্বীপ এখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে। এই দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপ এটি। বিকেলেই আমরা সেখানে পেঁছে যাব এবং সবই দেখবেন নিজের চোখে। এই দ্বীপটি লম্বায় মাইল তিনেক হবে, আর লেগুনটা প্রশস্ত হবে মাইলখানেকের মতো। লেগুন বোঝেন তো!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: একটু বুঝিয়ে বলুন।

লেগুন হ'ল সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত একটা জলাশয়। সব দ্বীপেই একটি করে লেগুন আছে পশ্চিমের দিকে, আর অ্যাণ্ড্রট ছাড়া আর সব দ্বীপই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। দ্বীপের মাটি তো সমুদ্র থেকে পাঁচ থেকে পনের হাতের বেশি উঁচু নয়। তাই মৌসুমী বর্ষার সময়ে এই লেগুনগুলোই দ্বীপ রক্ষা করে ঝড়ের দাপট থেকে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: ১৮৪৭-এর ঝড়ে কি কাবার্রাট্টু দ্বীপেরও ক্ষতি হয়েছিল?

হয়েছিল বৈকি। শুনেছি যে সে দ্বীপে ঝড়ের আগে জনসংখ্যা ছিল আড়াই হাজারের বেশি। আর ঝড়ের পরে বেঁচেছিল মাত্র ন'শো জন। তাদের মধ্যেও অনেকে পালিয়ে গিয়েছিল অন্য দ্বীপে।

তারপর বলুন।

সদাগোপালন বললেন ঃ ম্যাঙ্গালোরের দিক থেকে এলে প্রথম দ্বীপ পেতেন চেট্‌লাট। পর্তুগীজ জলদস্যুরা এই দ্বীপে অনেক অত্যাচার করেছে। কিন্তু দ্বীপের লোকেরা খুব সাহসী, তারা আরব বণিকদের জাহাজে সারেঙের কাজ করত। ভাল নৌকো তৈরি করাও জানে তারা, আর মাছ ধরার কাজেও দক্ষ। এই দ্বীপের কিছু পশ্চিমে বিট্‌রা দ্বীপের লেগুনটিই সবচেয়ে বড়, অথব দ্বীপটি আয়তনে সবচেয়ে ছোট। আগে এই দ্বীপে অসংখ্য পাখি থাকত, কিন্তু মানুষের বাস হবার পরে তারা উড়ে গেছে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ কোথায় গেছে?

কাবারাট্টির কাছে পিট্টি দ্বীপে। সে দ্বীপে মানুষের বাস নেই, আছে শুধু পাখি। অন্য দ্বীপের মানুষ সেখানে ডিম আনতে যায়। লোকে বলে যে এক সময়ে নাকি এই দ্বীপে দিনে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডিম পাওয়া যেত। সাহেবরা নাকি এসব কথা লিখে রেখে গেছে।

অত ডিম নিয়ে কী করত লোকে?

তা জানিনে। আমার তো এসব কথা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

কিন্তু কেন বিশ্বাস করেছি তা আপনাকে বলছি।

বলুন।

মেজর অ্যাক্‌ককের লেখা একখানা বই পড়েছি। বইখানার নাম 'A Naturalist in Indian Sias'. ভদ্রলোক ১৮০১-র মে মাসের কথায় লিখেছেন—তাঁর পিট্টি দ্বীপের অভিজ্ঞতার কথা। কাবারাট্টি থেকে এই দ্বীপের দূরত্ব মাত্র পনের মাইল, কিন্তু জাহাজ তো দূরের কথা, নৌকোও পারে ভেড়ানো যায় না। সেই সাহেব দু'জন দেশী লোকের পেছনে নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে পারে গিয়ে উঠেছিলেন।

তারপর?

যা লিখেছেন তা কতকটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। লিখেছেন যে দ্বীপে গাছপালা তো নেইই, ঘাস পর্যন্ত নেই। কিন্তু বালির ওপরে যেন একটা কার্পেট বিছানো। পাখির কার্পেট। জাহাজ থেকে তাঁরা এই দ্বীপে শুধু বালি দেখেছিলেন। কিন্তু নৌকো যখন পারের কাছে আসছিল, তখন আকাশ

ছেয়ে গিয়েছিল পাখিতে, আর তাদের ডাকে। দ্বীপে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন এক বীভৎস দৃশ্য।

নির্মাল্য মিশ্র উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন: কী দেখলেন?

পাখিতে ঢাকা আছে দ্বীপের বালি—জ্যান্ত ও মৃত দু'রকমেরই পাখি।

নির্মাল্য মিশ্র চমকে উঠে বললেন: জ্যান্তর সঙ্গে মরা মাখি!

হ্যাঁ। সাহেব লিখেছেন যে, দু'জাতের টার্ন পাখির বাচ্চার সঙ্গে বহু মরা পাখি—কোনটা মরে পচে যাচ্ছে, কোনটার কঙ্কাল পড়ে আছে পালক-সুদ্ধ। কিন্তু পাখিদের কোন বাসা নেই, বা চিহ্ন নেই বাসা বাঁধার।

তার মানে পাখিরা জন্মায় আর বালির উত্তাপেই মরে যায়?

সদাগোপালন বললেন: না, তা নয়। সাহেব বলেছেন যে, এক জাতের রাক্ষুসে কাঁকড়া আছে দ্বীপে। তারাই বাচ্চাগুলো খেয়ে ফেলে উড়তে শেখার আগে। তাই ঝাঁকে ঝাঁকে বড় পাখি বাচ্চাদের আগলে রাখে যতটা সম্ভব। জাহাজের আওয়াজে আর মানুষের পায়ের শব্দে পাখিরা আকাশে উড়ে যেতেই নিচের সেই বীভৎস দৃশ্য তাঁদের চোখে পড়েছিল। পাখির ছানারা তখনও উড়তে শেখেনি, কিন্তু লাফাতে পারে। ঝপঝপ করে উড়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে পা ফেলবার জায়গা দিচ্ছিল তারা। আর অসংখ্য ডিমও তাঁরা দেখেছিলেন।

কাঁকড়া দেখেননি?

দেখেছিলেন। পাহাড়ের মতো উঁচু জায়গা থেকে নেমে এসে তারা ডিম নিয়ে যাচ্ছিল। এই কাঁকড়ারা নাকি ডিম খায়, পাখির ছানাও খায়। বড় বড় পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছিল তাঁদের মাথার ওপরে।

সদাগোপালন একটু ভেবে বললেন: আরও একটা দৃশ্য তাঁরা দেখেছিলেন।

কী?

সমুদ্রের ধার তো পাহাড়ের মতো উঁচু। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসে তীরের কাছে, ধরবার লোক নেই বলে জলে তারা একেবারে নির্ভয়।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: অন্য দ্বীপগুলোর কথাও বলুন।

সদাগোপালন বললেন: পিট্টির কাছেই আগাট্টি ও বঙ্গারাম দ্বীপ। আগাট্টি এই দ্বীপপুঞ্জের একেবারে পশ্চিমে। আর শুনে আশ্চর্য হবেন যে বঙ্গারাম দ্বীপে আছে বিদেশীদের জন্যে ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিস্ট রিসর্ট অথচ সেখানে কোন মানুষের বাস নেই। কাছাকাছি আরও দ্বীপ আছে স্টিন্নাকারা

ও পয়ালি নামে, সেখানেও লোকের বাস নেই। যেসব দেশী ও বিদেশী ট্যুরিস্ট সমুদ্রে মাছ ধরতে চান বা বালির ওপরে শুয়ে সূর্যস্নান করতে ভালবাসেন, তাঁদের জন্যে খুব ভাল ব্যবস্থা আছে বঙ্গারামে। মাথাপিছু হাজার দেড়েক টাকা খরচ করলে বঙ্গারামের ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিস্ট রিসর্টে ছ'সাত দিন থাকা যায়, আর দিন তিনেক আরব সাগরে ঘুরে বেড়ানো যায়।

তারপরেই বললেন: আপনারা অবশ্য ডায়মণ্ড ট্যুরে না এসে রুবু ট্যুরে এলে ভাল করতেন।

কেন?

তাতে কাবারাট্টিতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে কাছে থেকে অগাট্টি বঙ্গারাম ও ছোট দ্বীপগুলো দেখতে পেতেন, তারপর চেটলাট কাডমাট ও কিল্টনও দেখতেন। ইচ্ছে করলে কাডমাটে দু'দিন কাটিয়ে ফিরে যেতেন।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: তাহলে তো মিনিকয় দ্বীপ দেখা হত না!

সদাগোপালন মেনে নিয়ে বললেন: তা হত না।

এবারে তাহলে ঐসব দ্বীপের কথাই বলুন।

কিল্টন বা আমিনি দ্বীপের কথা বোধ হয় বলিনি।

না।

কিল্টন দ্বীপ আমিনি থেকে মাইল তিরিশেক দূরে। দ্বীপটা লম্বায় মাইল দুই। কিন্তু চওড়ায় আধ মাইলেরও কম সবচেয়ে প্রশস্ত জায়গায়। কিন্তু এডেন বন্দর থেকে কলম্বো যাবার সমুদ্রপথের ধারে বলে কিছুদিন আগে একটা লাইট হাউস তৈরি হয়েছে এই দ্বীপে। আমিনি দ্বীপটা লম্বায় এর সমান হলেও চওড়ায় প্রায় মাইলখানেক। এই দ্বীপে দ্রষ্টব্য হল দুটো কামান। প্রায় চারশো বছর আগে একটি জাহাজডুবি হয়েছিল। সেই জাহাজেরই কামান। পর্তুগীজরা নাকি এই দ্বীপে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল। কিন্তু তার কিছুই এখন আর নেই। ভাস্কো ডা গামাও এই দ্বীপে এসেছিলেন। পর্তুগীজরা এই দ্বীপে অনেক অত্যাচার করেছে।

তারপর?

কাডমাট দ্বীপের কথা। এই দ্বীপের একটা নতুন কথা হল একটি বাচ্চা মেয়ের গল্প। ১৯৪৮ সালে সেই মেয়েটি বালি নিয়ে খেলবার সময় একটি সোনার মুদ্রা পেয়েছিল। তারপর আরও কিছু মুদ্রা সেখানে পাওয়া যায়। পরে জানা গেছে যে, সেসব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর রোম সম্রাটদের সময়ের। কেউ বলেন যে দস্যুদের ভয়ে দ্বীপেরই কোন লোক এসব বালির

নিচে পুঁতে রেখেছিল। আবার কেউ বলেন যে, সে দেশের কোন নাবিক হয়তো জাহাজডুবির পরে এই দ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: কেউ কি মনে করেন না যে সে সময়ে রোমের সঙ্গে এই দ্বীপের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল।

সদাগোপালন বললেন: না, এমন কথা কারও কাছে শুনিনি।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র বললেন: সেকালে কত জাহাজই তো ঝড়ে দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে নানা নতুন জায়গায় পৌঁছত। সেইভাবে রোমানরা যে এখানে পৌঁছয়নি তা-ও বোধ হয় বলা যায় না।

সবই সম্ভব।

সকালের রোদ প্রখর হতে শুরু করেছিল। কিন্তু দু'জনের কথা হচ্ছিল ছায়ায় বসে। নারকেলগাছের পিছনে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল—আকাশের মতো তার নীল জল, টারকোয়েশা পাথরের মতো যেন একটু সবুজের ছোঁয়া আছে সেই নীলে। সূর্যের আলো পড়ে ঢেউ-এর ওপরে চিকচিক করে উঠছে।

হঠাৎ চমকে উঠলেন দু'জনেই। দূর থেকে বাদল দেখতে পেয়েছিল তাঁদের। আর চিৎকার করে ডেকে উঠেছিল, নির্মাল্যদি!

নির্মাল্য মিশ্র এই ডাকের প্রতিধ্বনিও শুনছেন। কিন্তু উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সদাগোপালনকে বললেন: আসুন, আমার দলের লোকেরা ব্যস্ত হয়ে আমাকে খুঁজছে।

সদাগোপালন বললেন: আপনার আত্মীয় এঁরা?

না, আত্মীয় নয়, বন্ধু। দল বেঁধে একসঙ্গে এসেছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সদাগোপালন বললেন: এখানে আমারও কেউ নেই—আত্মীয় বা বন্ধু কেউ না। একা থাকি, একেবারে নিঃসঙ্গ। বই পড়ে আর রেডিও শুনে সময় কাটে না। আর নতুন নতুন বইও তো পাওয়া যায় না!

বলে সদাগোপালন উঠে দাঁড়িয়ে ফেরার পথ ধরলেন। নির্মাল্য মিশ্র তাঁর পাশে পাশে চলতে লাগলেন নিঃশব্দে।

বেলা বাড়ছে।

নির্মাল্য মিশ্র ভেবেছিলেন যে ডাক্তার হিমাংশু মৈত্রকে এড়িয়ে জাহাজে উঠবেন। কিন্তু তা পারলেন না। ডাক্তারবাবু পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন: এমন ছেলেমানুষের মতো সব কাণ্ড করেন!

নির্মাল্য মিশ্র কোন উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবু যেন নাছোড়বান্দা, বললেন : সেবারে কাউকে কিছু না বলে সেই সর্দারজীর সঙ্গে চলে গেলেন নিকোবরে, আর দলসুদ্ধ সবাই আপনার জন্যে ভেবে সারা। এখানেও তাই করছেন !

নির্মাল্য মিশ্র বিরক্তভাবে বললেন : আমি তো নাবালক নই যে অভিভাবকের মত নিয়ে চলতে হবে !

ডাক্তারবাবু বললেন : মত নেওয়ায় নয়, দলের একটা ডিসিপ্লিন, মানে নিয়মকানুন আছে তো !

তাহলে তারা বার করে দিক দল থেকে।

বাদল কাছেই ছিল এবং ঝগড়া বাধবার ভয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল : এই দিক দিয়ে আসুন নির্মাল্যদি।

ডাক্তারবাবু বললেন : ও দিক দিয়ে কেন, এটাই তো যাবার পথ ! বলে নিজেও এগোলেন।

তারাপদর দিদি বিন্দুকে দেখতে পেয়ে বললেন : ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি মিটে গেল বলে মনে হচ্ছে !

বিন্দু বলল : এই তো শুরু ! এর পর—

বলেই সে থেমে গেল।

বেলা বারোটায় জাহাজ ছাড়ল। বিকেল পাঁচটার আগেই কাবারাট্টি পেঁছিবে। সেখানে অন্ধকার হবার আগেই সব দেখে নিতে হবে। কারণ জাহাজ ছাড়বে রাতে, আর পরদিন ভোরবেলায় মিনিকয় দ্বীপে কাটবে সারাদিন। ঐটেয় নাকি সবচেয়ে ভাল দ্বীপ। অথচ দুপুরে ঘুমোবার অভ্যেস তাঁর নেই। বাদল ব্যাপারটা সন্দেহের চোখে দেখেছিল, তাই কোন প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেনি। কিন্তু তারাপদর দিদি বললেন : খবরটা তোমার দক্ষিণ রায়কে দিয়ে এসো, তিনি আবার এখানে এসে না জোটেন।

বাদল কোন উত্তর না দিয়ে সরে গেল। কিন্তু বিন্দু বলল : ভদ্রলোক যেন কেমন বেহায়া ধরনের ! সেবারে নিজেই অপমান করলেন নির্মাল্যদিকে, আর এবারে গায়ে পড়ে কথা বলতে আসছেন।

তারাপদর দিদি বললেন : বাদলের গুরু তো ! বয়সটা কম বলেই ওর চলে যাচ্ছে।

উত্তর দিলেই বিপদ হবে বলে বিন্দু চুপ করে গেল।

জাহাজ পশ্চিমের দিকে চলছে।

কেবিনের যাত্রী হিমাংশু মৈত্র লাঞ্চের পর কিছুক্ষণ ধরে পাইপ টানলেন। তারপর ডেকে চলে এলেন। তাঁর এখানে আগমন, যেন খুবই প্রত্যাশিত ছিল। এইভাবে সবাই তাঁকে অভ্যর্থনা করল। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্রকে ঘুমোতে দেখে তিনি রেগে গেলেন। বললেন ঃ দুপুরে ঘুমনো একটা অত্যন্ত বদ্ অভ্যেস। জাগিয়ে দাও ভদ্রমহিলাকে।

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কিন্তু কেউই সাহস পেল না নির্মাল্য মিশ্রকে জাগাতে। তারাপদর দিদি বললেন ঃ জেগে ঘুমোলে জাগাবে কে!

তারাপদ স্বগতভাবে বললেন ঃ উনি ফিরে গেলে নিজেই উঠে বসবেন।

শেষ পর্যন্ত তাই হল। ডাক্তারবাবু চলে যেতেই বিন্দু এসে নির্মাল্য মিশ্রর পায়ের কাছে বসে বলল ঃ চলে গেছেন নির্মাল্যদি।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র বোধ হয় লজ্জা পেয়েছিলেন তাঁকে নিয়ে এইসব আলোচনার জন্যে। তাই ঘুমের ভান করে আরও অনেকক্ষণ শুয়ে রইলেন।

বিকেলের দিকে কাবারট্টি দ্বীপ নজরে এল। আর কিছুক্ষণ পরেই এই দ্বীপে জাহাজ ভিড়বে। তাই চায়ের পর্বটা জাহাজ থেকে নামবার আগেই সেরে নিতে হল সবাইকে। নির্মাল্য মিশ্র সময়মতোই চোখ মেলেছিলেন। বিন্দু বলল ঃ এবারে আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। এই দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর তো! ভাল করে সব দেখে নিতে হবে।

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ তাহলে আর কারও সঙ্গ নিও।

আপনার সঙ্গে নয় কেন?

আমি এদিকের মানুষের সঙ্গে একটু মেলামেশা করে দেখতে চাই। মানুষ না চিনলে নতুন দেশ দেখা তো সম্পূর্ণ হয় না। কম্পোনিতে দ্বীপের কোন মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়নি।

সন্ধ্যে হতে দেরি নেই বলে সবাই হুড়মুড় করে জাহাজ থেকে নেমে পড়লেন। দ্বীপ দেখানোর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র দলের সবাইকে এড়িয়ে সদাগোপালনের সঙ্গে নামলেন। বললেন ঃ তোমরা দর্শনীয় স্থান সব দেখে এসো, আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যাচ্ছি।

বিন্দু করুণ চোখে তাকাল নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে। আর ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র হুঙ্কার দিয়ে বললেন ঃ চলে এসো সবাই। এখানে আমরা সময় নষ্ট করতে আসিনি।

বলে গটগট করে এগিয়ে গেলেন।

কাবারট্টি দ্বীপে উজ্জুরা মসজিদটিই নাকি সবচেয়ে বড়, আর ফিশারিজ

মিউজিয়ম একটি দর্শনীয় জায়গা। তা ছাড়া, নানারকমের শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে এই দ্বীপপুঞ্জে। কোথাও টুনা মাছ ধরে টিনে ভর্তি করা হয়, কোথাও নারকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি তৈরি হয়, নৌকো তৈরি হয় কোথাও। এক-এক দ্বীপে এক-এক রকমের শিল্প ছিল চিরকাল, সরকারী সাহায্যে সেসব নাকি চাঙ্গা হয়ে উঠছে। কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা অনেক জায়গায়। এই সবই এখানে দেখতে হয়, দেখানো হয় ট্যুরিস্টদের। বিন্দুর দিকে চেয়ে নির্মাল্য মিশ্র হাসলেন এবং সদাগোপালনকে বললেন : চলুন।

চলতে চলতে সদাগোপালন বললেন : সবাই বোধ হয় আমার ওপরেই বিরক্ত হলেন।

কেন ?

ও'দের সঙ্গে না গিয়ে আপনি আমার সঙ্গে এলেন বলে ও'রা অসন্তুষ্ট মনে হল।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : আমারও তো কিছু স্বাধীনতার দরকার! আমি এই দ্বীপের কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানতে চাই তাদের সুখ-দুঃখ। আপনি এদের ভাষা বোঝেন, আমাকে বোঝাতে পারবেন, এ সুযোগ আমি কেন হারাই বলুন!

সদাগোপালন কোন কথা বললেন না। দু'জনে নীরবে হাঁটতে লাগলেন গ্রামের কয়েকটি বাড়ি লক্ষ্য করে। হঠাৎ তাঁদের দেখা হয়ে গেল একজন বৃদ্ধের সঙ্গে। বয়স কত হয়েছে বোঝা গেল না। কিন্তু বয়সের ভারে যে নুয়ে পড়েছে তা বোঝা গেল। নির্মাল্য মিশ্র বললেন, এই বুড়োকেই ধরা যাক। কিন্তু আমি তো এদিকের ভাষা বুঝি না, আপনিই কিছু জেনে নিয়ে আমাকে বলুন।

আচ্ছা। বলে ভদ্রলোক সেই বুড়োকে অনেক প্রশ্ন করলেন এবং উত্তর শুনলেন মনোযোগ দিয়ে। তারপর নির্মাল্য মিশ্রের দিকে ফিরে বললেন : এই বুড়ো বলছে যে বছর প'চিশেক আগেও এইসব দ্বীপের সঙ্গে ভারতের কোন যোগাযোগ-ব্যবস্থা ছিল না। ভারত স্বাধীন হবার কথা তারা শুনেছে। উৎসব হয়েছিল। কোন বড় নেতা এসেছিলেন। কিন্তু স্থায়ী কোন উন্নতি হয়নি। যেমন ইংরেজ আমলে, তেমনি স্বাধীন ভারতেও তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। সকালে উঠে নারকেলগাছের তাড়ি সংগ্রহ, জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি, নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি আর মাদুর তৈরি, লেগুনে মাছ ধরা, আর মসজিদের আজান শুনে নমাজ পড়া—এই তো জীবন!

নিজেদের জিনিস নিয়ে পাল-তোলা নৌকোয় দশ দিনে সমুদ্র পেরিয়ে কেরলে পেঁছুলে কিছু বিক্রি হবে, প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস আনা যাবে। তা না হলে দ্বীপের প্রধানের ওপরেই ভরসা। বিনিময়ে যা পাওয়া যাবে তাই নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। এই দ্বীপের বাইরেও যে একটা জগৎ আছে এবং সেখানে যে মানুষ অন্য রকম ভাবেও জীবন যাপন করে, তা এতদিন অজানা ছিল। এখন দিন পালটেছে। নিয়মিতভাবে জাহাজ আসে যায় প্রত্যেকটি দ্বীপে। সব জিনিসই পাওয়া যায়—খাদ্য, ওষুধপত্র, খবরের কাগজ, এইসব দ্বীপের মানুষ যা কখনও দেখেনি সেইসব জিনিস। ছেলেমেয়েরা এখন স্কুলে পড়ছে, কাজকর্ম শিখছে, উপার্জন করছে, স্বপ্নও দেখছে। এই তো কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী এসে ঘুরে দেখে গেছেন। দ্বীপের মানুষ এখন সাগ্রহে অপেক্ষা করছে তাঁর সচক্ষে সব দেখে যাবার ফলের প্রত্যাশায়।

কিছু না পেলে তাদের মন হতাশায় ডুবে যাবে।

সদাগোপালনের সঙ্গে নির্মাল্য মিশ্র এগোতে লাগলেন। একসময়ে নির্মাল্য মিশ্র প্রশ্ন করলেন: এদিকে তো আপনি অনেকদিন আছেন, কোথায় আপনার কী ভাল লেগেছে?

সদাগোপালন ভাবলেন এক মুহূর্ত, তারপর বললেন: এখানে এসে যখন নামি, তখন এই আসাটা শাস্তি বলে মনে হয়েছিল। সমুদ্রের ধারে বসে থাকতাম একা, লেগুনের ধারে বসে পান্নার মতো সবুজ জল দেখতাম, হীরের মতো ঝকঝকে ঢেউ এসে প্রবালের প্রাচীরে আছড়ে পড়ত। নীল আকাশ, আর নীল সমুদ্র, আর অজস্র সবুজ গাছ নারকেলের। দ্বীপের এক ধার থেকে আর এক ধার পর্যন্ত হেঁটে দেখলাম যেন একটি নৌকো ধনুকের মতো বেঁকে আছে। কিছুদিনের মধ্যেই দ্বীপের মানুষদের চিনে দেখলাম—কী দরিদ্র অসহায় মানুষ, কিন্তু কী রকম বন্ধুর মতো দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিতে চায় বাইরের মানুষকে। কিছুদিন যেতে-না-যেতেই বুঝতে পারলাম যে আমি তাদের মতো অসহায় নই। বালির ওপরে আমাকে শুতে হয় না বালি দিয়ে বালিশ তৈরি করে, বৃষ্টিতে ভিজতে হয় না রাতে, জীবনধারণের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয় না। জানি না কেমন করে আমি তাঁদের একদিন ভালবেসে ফেললাম।

সদাগোপালন বোধ হয় নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলেন অতীতের কথায়। তাই নির্মাল্য মিশ্র তাঁর কাছে দর্শনীয় স্থানের কথা জানতে চাইলেন। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি বললেন: হ্যাঁ, আপনার প্রশ্ন আমার মনে আছে।

আপনার সঙ্গীরা উজ্রা মসজিদে কাঠের কারুকার্য দেখবেন, দেখবেন ফিশারিজ মিউজিয়াম, আর নৌকো তৈরির কারখানা। আরও কী দেখবেন জানি না। এখানে দিনকয়েক থাকলে আপনাকে পিট্টি দ্বীপের পাখি দেখে আসতে বলতাম—নডি আর টার্ন পাখি, রাক্ষুসে কাঁকড়া। কাডমাট দ্বীপের লেগুনে সাঁতার কেটে আপনার ভাল লাগত। প্রবাল দেখতেন বঙ্গারাম দ্বীপে, ইণ্টারন্যাশনাল ট্যুরিস্ট রিসর্টে থেকে সমুদ্রবেলায় সূর্যস্নান করতেন, আর মাছ ধরতেন। অ্যাণ্ড্রট দ্বীপে কোন লেগুন নেই দেখে আশ্চর্য হতেন। আর আমার জন্যে কল্পেনি দ্বীপে তো কিছু দেখতেই পেলেন না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আপনার জন্যে ভাববেন না, আমি নিজেই কিছু দেখতে চাইনি। তাই আপনার কাছে জেনে নিয়েছি জানবার সব কথা।

সদাগোপালন বললেন ঃ সব কথা বলবেন না, আমি আর কতটুকু জানি বলুন।

যা জানেন তাই আমার কাছে যথেষ্ট। এবার মিনিকয় সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সদাগোপালন বললেন ঃ আমার কাছে মিনিকয় দ্বীপ আরও সুন্দর বলে মনে হয়। সম্ভব হলে দিনকয়েক সেখানে থাকবেন।

কেন বলুন তো!

মনে হয় আপনার ভাল লাগবে। গ্রামের বাড়িগুলো খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আসবাবপত্রে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ওদের ভাষার নাম মহল্। আমরা আরও সহজে বুঝি। কেরলের নীল জীবনযাত্রার সঙ্গে অনেক মিল আছে।

কী রকম?

বলে নির্মাল্য মিশ্র ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন ঃ আমি সমাজব্যবস্থায় মিলের কথা বলছি। বিয়ের পরে ছেলেরা স্ত্রীর বাড়িতে এসে তার সঙ্গে বাস করে, আর তারই উপাধি নেয়। পূর্বভারতেও নাকি এইরকম সমাজব্যবস্থা আছে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ থাকলেও সবার মধ্যে নয়, কোন গোষ্ঠীর মধ্যেই এইরকম ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ। আর কী দেখেছেন বলুন।

সদাগোপালন বললেন ঃ এদের মেয়েদের স্বাধীনতা একটু বেশী। পতি নির্বাচনের অধিকারও আছে। নিজেরা শিক্ষিত এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার দায়িত্ব তাদেরই। আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, অধিবাসীরা তো

মুসলমান, কিন্তু পুরুষেরা একটির বেশী বিয়ে করে না। সে নিয়ম নেই। বিয়ের সময়ে পাত্র-পাত্রীকে কোন যৌতুক দিতে হয় না, বরং পাত্রীই উপহার পায়।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: মনে হয় যে কেরল থেকে যারা সেখানে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করে, তারা নিজেদের সমাজব্যবস্থা বজায় রেখেছে। ধর্মটা পরে বদলেছে।

সদাগোপালন বললেন: আমি তাদের সমাজে পুরুষ ও মেয়েদের দেখেছি, তাদের নানা রকমের নিয়মকানুন আছে।

কী রকম ?

ঠিক জানিনে। আপনি দিনকয়েক থাকলে জেনে নেবেন। শুধু এইটুকু জেনেছি যে গ্রামকে তারা আট্টিরি বলে। আর সব গ্রামেই আছেন একজন নির্বাচিত প্রধান। তাঁকে সবাই মুপান বলে। মেয়েদেরও একজন মুপতি আছেন, তিনিও নির্বাচিত হন। এমনকি শিশুদের মধ্যেও একজন প্রধান আছে। প্রত্যেক আট্টিরির নিজস্ব নৌকো আছে—মাছ ধরার নৌকো, বাণিজ্যের জন্য বড় নৌকো, এমনকি রেস খেলার জন্যে স্নেক বোটও।

নির্মাল্য মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন: এসব সরকারী না মেয়েদের সম্পত্তি ?

সদাগোপালন বললেন: যত দূর জানি, এসব গ্রামেরই সম্পত্তি। সঠিক জানতে হলে আপনি মুপানের কাছেই জেনে নেবেন। এদিকের অন্য দ্বীপগুলোর সমাজব্যবস্থার কতকটা একই রকম হলেও মিনিকয় দ্বীপের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেখানে তা নিজের চোখে না দেখলে আমি মুখে বলে আপনাকে সব বোঝাতে পারব না।

অন্ধকার নামছিল পুবের আকাশ থেকে। সদাগোপালন একটু লজ্জিতভাবে বললেন: আমার জন্যে আপনার কিছুই দেখা হল না। কম্পোনিতেও গল্প করে কাটালেন। এখানেও গেলেন না কোথাও। একটু পরেই আবার জাহাজে উঠে চলে যাবেন মিনিকয় দ্বীপে। যা দেখবার সেখানেই ভাল করে দেখবেন। আমার মতো কারও পাল্লায় যেন পড়বেন না।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: চোখ মেলেই আছি, দেখতে পাচ্ছি সবই। আর আপনার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারছি যা চোখ দেখা যায় না তাই। সেটাই আমার উপরি লাভ।

সদাগোপালনের হাতে একটা ব্যাগ ছিল। সেই ব্যাগ থেকে একটা টর্চ বার করে তিনি পথ দেখিয়ে নির্মাল্য মিশ্রকে জাহাজে তুলে দিয়ে বিদায়

নিলেন। এই দ্বীপেই তাঁকে থাকতে হয়। দিনকয়েকের জন্যে তিনি বাড়ি গিয়েছিলেন, ফিরলেন আজ।

রাতের আহারের পরেই জাহাজ ছাড়ল কাবারাট্টি থেকে। সকালে পেঁছিবে মিনিকয় দ্বীপে। নিশ্চিন্ত মনে রাতে ঘুমনো যাবে বলে নির্মাল্য মিশ্র খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র ডেকে এসে জিজ্ঞেস করলেন: সবাই ফিরেছেন তো?

বাদল বুঝতে পারল যে তিনি নির্মাল্যদির কথাই জানতে চাইছেন। কারণ আর সবাই একসঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু নির্মাল্যদির একটা কথা তার ভাল লাগেনি বলে মনটা খারাপ হয়েছিল। জাহাজে ফিরেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মিনিকয় দ্বীপটা ভাল লাগলে তিনি দিনকয়েক সেখানে থেকে যাবেন। অর্থাৎ ফিরবেন পরের জাহাজে। অবশ্য তাঁর জন্যে কোচিনে কাউকে অপেক্ষা করতে হবে না, দরকার মনে করলে তিনি প্লেনে ফিরে যাবেন।

বাদল জিজ্ঞাসা করেছিল: জাহাজের টিকিটের কী হবে?

নির্মাল্য মিশ্র বলেছিলেন: ওটা আমার হাতে দিও। পরের জাহাজে ওই টিকিট কাজে না লাগলে নতুন টিকিট কেটে নেব। আর মাল দ্বীপ সম্বন্ধেও খোঁজখবর নেওয়া যাবে। এত দূরেই যখন এসে পড়েছি, তখন শ্রীলঙ্কার সঙ্গে এদের সম্বন্ধ কী রকম তা-ও জানার চেষ্টা করব। মানে রামায়ণের আমলে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান কী রকম ছিল, তা নিয়ে কেউ অনুসন্ধান করেছেন কিনা তা জানা দরকার।

বাদল গম্ভীর হয়ে বলেছিল: বুঝেছি।

কী বুঝেছ?

আপনি আমাদের সঙ্গে ফিরতে চান না।

নির্মাল্য মিশ্র হেসেছিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দেননি। এইবারে বাদল ডাক্তারবাবুকে তার ক্ষোভের কথা জানাল। বলল: হ্যাঁ, ফিরেছেন সবাই, কিন্তু মিনিকয় থেকে সবাই ফিরবেন না।

ডাক্তারবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন: মানে?

মানে নির্মাল্যদি সেখানেই থেকে যাবেন বলছেন।

কেন? কী আছে সেখানে?

বাদল বলল: তাঁর অনেক অনুসন্ধানের কাজ আছে।

ডাক্তারবাবু বললেন: তা হলে তোমরা সবাই থেকে যাও না। দু'চারদিন দেরি হলে এমন আর কী ক্ষতি হবে!

সদানন্দবাবু শোবার উদ্যোগ করছিলেন, বললেন : আপনিই থেকে যান।

আমি! কিন্তু—

তারাপদর দিদি বললেন : কিন্তু আবার কিসের! আমাদের তো তীর্থের টান আছে কিনা—কন্যাকুমারী রামেশ্বর—তাই বলছিলাম, আপনিই থেকে যান। একেবারে একা এই দ্বীপে থাকা তো নির্মাল্যদির পক্ষে নিরাপদ নয়, তাই এ কথা বলছি।

ডাক্তারবাবু বললেন : ভেবে দেখার মতো কথা!

তারপর নির্মাল্য মিশ্রকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন : ও মশাই, শুনছেন? ব্যাপারটা কী জানতে পারি?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : মশাই নয়, মহাশয়া। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয়, আগে তাই শিখুন।

ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র একেবারে চুপসে গিয়ে বললেন : বাঙলা ব্যাকরণে বরাবরই একটু কাঁচা ছিলাম, বুঝলেন! তা আর তো কোন ভুল করিনি!

ভুল নয়, ম্যানার্স শিখুন।

ডাক্তারবাবু সদানন্দবাবুর দিকে চেয়ে বললেন : কী মশাই, কী করেছি বলুন তো!

তারপর নিজেই বললেন : উকিলবাবুদের সঙ্গে কথা বলাই বিপদ! পানের থেকে চুন খসলেই মানহানির মামলা।

তারাপদর দিদি বললেন : আবার যে ব্যাকরণ ভুল হয়ে গেল! উনি উকিলবাবু নাকি?

ডাক্তারবাবু বললেন : মুশকিলের কথা! ওঁকে কী বলি বলুন তো!

বিন্দু বলল : নির্মাল্যদি যখন রাগ করছেন, তখন—

বাদলের চোখের দিকে তাকিয়ে সে থেমে গেল। কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন : তখন কী? নির্মাল্যদি বলব, না নির্মাল্যদেবী? উনি চাইলে মিস্ মিশ্রও বলতে পারি।

তারাপদ বলল : কিছু না বললেই সবচেয়ে ভাল।

কিন্তু আমি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছিলাম। মানে, উনি গাইতে পারেন তো, গানের গলাটি ভারি মিষ্টি, উনি যখন ভজন গান, তখন আর ওঁকে উকিল বলে মনে হয় না। সেবারের সেই গানখানা—মনে নেই?

বিন্দু বলল : শুরু করুন না আপনি।

ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র বললেন ঃ আমি গাইব! আমার তো গানের গলা নেই, গাইতেও শিখিনি!

তারাপদর দিদি বললেন ঃ গান যখন এত ভাল লাগে, তখন গাইতেও পারবেন। আপনি ধরুন, আমরা ধুয়ো ধরছি।

ভদ্রলোকের হাতে চুরুট ছিল, তিনি তা সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুনগুন করে গাইলেন—

তোমার কাছে ক্ষমা আমার চাহিতে নাহি হয়,
তুমি যে মোরে গোপনে ভালবাসো।
দুঃখের ঝড়ে দেখে আমার চরম বিপর্যয়,
অন্তরালে লুকিয়ে তুমি হাসো।

ডাক্তারবাবুর গলায় গান শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! তিনি যে গাইতে পারেন এবং পুরনো গানের কথা মনে রেখে গাইতে পারবেন, এ কথা কেউই ভাবতে পারেনি। তাই যাঁরা তাঁকে অপদস্থ করবার জন্যেই গাইতে বলেছিলেন, তাঁরা লজ্জায় মাথা নিচু করলেন।

পরিবেশটা সহজ করে দেবার জন্যে নির্মাল্য মিশ্র গেয়ে উঠলেন—

আমায় নিয়ে জানি
তুমি মত্ত সারাবেলা,
তোমার গড়া পুতুল নিয়ে
তোমার ছেলেখেলা।
যে দুখ আসে জীবনে মোর সে তোমারই দান,
ভুলে যে যাই আমায় ভালোবাসো।
দুঃখ-তাপের ব্যথিত বুকের সকল অভিমান
নীরবে হেরি আড়ালে তুমি হাসো।

ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র বলে উঠলেন ঃ চমৎকার! এ আপনার নিজের রচনা বলেছিলেন, তাই না? নতুন কোন গান বেঁধেছেন?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আজ নয়, কাল শোনাব।

আজ তাহলে ঘুমোন!

বলে ডাক্তারবাবু তাঁর কেবিনে ফিরে গেলেন।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটবার পর বাদল বলল ঃ ডাক্তারবাবু যে গান গাইতে পারেন, এ কথা কেউই জানে না।

বিন্দু বলল ঃ আর নির্মাল্যদির গান যে এভাবে মনে রেখেছেন, তা কি ভাবা যায় ?

সদানন্দবাবু বললেন ঃ সত্যিই গান ভালবাসেন, তা না হলে গানের কলি ও সুর মনে রাখতে পারতেন না।

বাদল বলল ঃ সারাদিন এত রোগী দেখতে হয় যে সঙ্গীতচর্চার সময় আর পান না।

বিন্দু বলল ঃ সে যাই করুন, নিজের জন্যে একটুখানি সময় বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ সেটাই নিয়ম। ভোরবেলায় উঠে শরীরের জন্যে যোগাভ্যাস করুন বা গঙ্গায় সাঁতার কাটুন, নয় হেঁটে আসুন কিছুক্ষণের জন্যে।

তারাপদর দিদি বললেন ঃ ভগবানের নাম করতে বললেন না ?

বিশ্বাস থাকলে তা করতে পারেন। ধ্যান করলে চিন্তাশক্তি বাড়ে, দূরদৃষ্টি আসে। আর রাতে সব কাজ শেষ হবার পর পৃথিবী নীরব হয়ে গেলে করুন শিল্পচর্চা। তারই নাম ভগবানের আরাধনা।

তারপর বিন্দুর দিকে চেয়ে নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ বুঝলে বিন্দু, ব্যর্থ হতে দিও না। যে সৃষ্টির মূলে জীবন, তা জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই জীবন সৃষ্টির পূর্ণবিকাশে সহায়তার জন্যে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকে আনন্দময় করবার জন্যে। তাই মৃত্যুকেই জীবনের শেষ মনে করে থেমে গেলে চলবে না।

সদানন্দবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঃ খুব বড় কথা বললেন।

বড় কথা নয় সদানন্দদা, এ হল জীবনের প্রথম পাঠ। আমরা কতটুকু জানি আর কতটুকু বুঝি ! এইভাবে দেশ দেখতে বেরিয়ে এই কথাটাই জেনে যাই যে আমরা কত ছোট, কত অজ্ঞ, কত তুচ্ছ ! আর তাই নিয়ে কত বড়াই করি আমরা। যত অজ্ঞ, বিজ্ঞের অভিমান তত বেশি।

যে যার মতো বিছানা বিছিয়ে ফেলেছিল। তাই দেখে বাদল বলল ঃ আজ শুয়ে পড়া যাক। কাল সারাদিন আমাদের ধকল আছে।

তারাপদর দিদি বললেন ঃ ধকল বলে ধকল। এইরকম কসরত করে জাহাজ থেকে ওঠানামা করতে হয় জানলে কে আসত এদেশে ! এর চেয়ে সার্কাসে খেলা দেখানো ভাল ছিল।

বিন্দু বলল ঃ জাহাজ থেকে দড়ি ধরে নৌকোয় নামতে যা ভয় করেছিল—

বাদল বলল ঃ ভয়ের কী আছে ! এ দিকের লোকেরা নামছে না !

তা নামছে।

জলে পড়েছে কেউ ?

বিন্দু বলল : পড়তে তো পারে !

বাদল বলল : নৌকোর লোকেরা আছে কী জন্যে ! ঠিক সময়মতো ওরা ধরে ফেলবে। আর জলে পড়ে গেলেও টেনে তুলবে।

নির্মাল্য মিশ্র বললেন : ভয় ! সব কাজেই আমাদের ভয় !

বলে শুয়ে পড়লেন। চোখ বুজে। একে একে সবাই শুয়ে পড়লেন। এই জাহাজ সারারাত চলে ভোরবেলায় পেঁছবে মিনিকয় দ্বীপে। সমুদ্রে পথ হারাবার সম্ভাবনা আছে বলে জাহাজের ক্যাপ্টেনরা এই দ্বীপে সকালে পেঁছতে চান। তাতে সারাদিনটা হাতে পাওয়া যায়। রাতে এই দ্বীপে পেঁছবার চেষ্টা নিরাপদ নয়।

নির্মাল্য মিশ্রর মনে পড়ল যে তিনি মার্কোপোলোর কথা পড়েছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে তিনি একটি দ্বীপের উল্লেখ করেছেন 'প্রমীলা দ্বীপ' বলে। অর্থাৎ যে দ্বীপে মেয়েদেরই রাজত্ব। অনেকেই মনে করেন যে মার্কোপোলো এই মিনিকয় দ্বীপের কথাই লিখেছিলেন। কারণ একশো বছর আগেও এক সাহেব এসে এই দ্বীপে এগারো শো ঊনআশিজন স্ত্রীলোক দেখেছিলেন, আর পুরুষের সংখ্যা মাত্র তিনশো একান্ন। তারা বৃদ্ধ ও অক্ষম। সুস্থ ও সক্ষম পুরুষেরা দ্বীপে থাকে না। তারা দুঃসাহসী নাবিক, কাজ করে না দেশের জাহাজে। কিছু লোক দূরসমুদ্রে মাছ ধরে, আর বিক্রি করে প্রতিবেশী দেশে। ব্যবসা-বাণিজ্যও করে। নিজেদের দ্বীপের নারকেলজাত নানা পণ্য ও শুকনো মাছ নিয়ে মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কায় যায়, কললাতার বাজারেও নাকি তাদের পণ্য বিক্রি হয়। অনেকে বর্মার আরাকানেও চলে যায় বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে। প্রচুর চাল নিয়ে আসে সেখান থেকে। নিজেদের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে রেখে বাকি চাল বিক্রি করে দেয় শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের বাজারে, আর সেখানকার পণ্য কিনে নিয়ে আসে। এসব কিছুদিন আগের কথা। এখন ভারতসরকারের চেষ্টায় তাদের দ্বীপেই সব পাওয়া যাচ্ছে।

সদাগোপালন বলেছেন যে মিনিকয়ে মেয়েরাই প্রধান। ছেলেরা নিজেদের বাড়িতে থাকতে পারে যতদিন তাদের বিয়ে না হচ্ছে। নিজের বাড়ি মানে তো মায়ের বাড়ি। আর বিয়ে হলেই বউ-এর বাড়ি। এই ব্যবস্থার সঙ্গে পূর্ব-ভারতের তুলনা করলে বোধ হয় ভুল হবে। সেদিকে শোনা যায়

যে, ছেলেরা অলস এবং মেয়েরাই সবরকম কাজকর্ম করে সংসার চালায়। তাই তাদের পুরুষেরা মেয়েদের আশ্রিত। কিন্তু মিনিকয়ের পুরুষেরা তো অলস নয়। তারা কাজকর্ম নিয়ে দেশের বাইরেই বেশিদিন কাটায় বলে সংসারের দায়িত্ব পড়েছে মেয়েদের ওপর। তাই ঘরবাড়ি তাদের, বিষয় সম্পত্তিও। পুরুষরা তাদের অতিথি।

একটা কথা নির্মাল্য মিশ্রর ভাল লেগেছে। মিনিকয়ে বহুবিবাহ নেই। পুরুষেরা একটা বিয়ে করে এবং মেয়েরাও স্বৈরাচারী নয়। বইয়ে পড়েছে যে, ব্যভিচার এ দ্বীপে নিন্দিত ও প্রকাশ্যে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা আছে ব্যভিচারীকে। তিনি পড়েছেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক না হলে ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে না। ছেলেদের বিয়ের বয়স কুড়ি। আর মেয়েদের ষোল। তাই মেয়েরা পছন্দ করেই বিয়ে করে। আর বিবাহবিচ্ছেদ বড় একটা দেখা যায় না। আর সবচেয়ে মজার কথা হল যে মায়ের সম্পত্তিতে ছেলেদের কোন অধিকার নেই, বিয়ে হলেই তাকে অন্য মেয়ের সংসারে যেতে হবে, তার নামও পাল্টে যাবে স্ত্রীর নামে।

নির্মাল্য মিশ্র আরও একটা ব্যবস্থার কথা মনে করে বেশ আশ্চর্য হয়েছিলেন। মিনিকয় দ্বীপের অধিবাসীদের শৃঙ্খলাবোধ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা। গোটা দ্বীপে গ্রাম আছে ন'টা। এরা তো গ্রাম বলে না, বলে আট্টারি। কিন্তু গ্রামের ঘরবাড়িগুলো সব গায়ে গায়ে, অথচ খুব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। নিজেদের গ্রাম ঝকঝকে রাখার দায়িত্ব ছোটদের ওপরেই। মিনিকয় দ্বীপের দক্ষিণে ভিরিঙ্গেলিল নামে একটা ছোট্ট দ্বীপ আছে। কারও বসন্ত হলে তাকে সেই দ্বীপে পেঁৗছে দেওয়া হয়। আর কুষ্ঠরোগীদের রাখা হয় একেবারে উত্তরের দিকে মাইল দুই দূরে। রোগীদের দূরে রাখার ব্যাপারে এরা এমনই সংঘবদ্ধ যে কেউ পালিয়ে আসার সাহস পায় না। এখন নাকি কুষ্ঠরোগীদের পাড়াও একটি ছোটখাট গ্রামে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য গ্রামের মতোই পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। প্রত্যেক রোগীর এক-একটি আলাদা কুঁড়ে-ঘর আছে, তাতে আসবাবপত্র আছে নিজের গ্রামের বাড়ির মতোই। এই গ্রামের পরিচালনার ভার নিয়েছেন সরকার। কলের জলের ব্যবস্থা আছে, প্রার্থনার জন্যে মসজিদ তৈরি হয়েছে। আর রোগীদের চিকিৎসার জন্যে একটি ক্লিনিক আছে। সরকারী ডাক্তার আসেন প্রতি দিন। রোগীদের খাওয়া-পরার সমস্ত দায়িত্ব সরকারের। তাদের মুরগি ছাগল আছে, সবজি-বাগান আছে, মাছ ধরার ছিপ ও নৌকো আছে। রোগীরা আনন্দেই থাকে।

আর সবচেয়ে আশার কথা এই যে, ডাক্তার কোন রোগীকে ভাল হয়ে গেছে বললেই সে তার গ্রামে ফিরে যায়। তাকে নিজেদের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে কারও আপত্তি হয় না। ডক্টর জাকির হোসেন যখন ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তখন তিনি কুষ্ঠরোগীদের এই গ্রাম দেখে বলেছিলেন, এটা বৃদ্ধদের থাকবার জন্যে একটা আদর্শ ক্যাম্প।

সকালবেলায় জাহাজ দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু মনে হচ্ছিল না যে নামবার সময় হয়েছে। ভানু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল: বিকাশ, সবাই নামতে শুরু করেছে।

বাদল আশ্চর্য হয়ে বলল: সে কিরে? হৈ-হল্লা চেঁচামেচি নেই, সবাই নামছে মানে! এখানে কি নৌকোয় করে জাহাজঘাটায় যেতে হবে না?

বিকাশ ছুটে গিয়ে দেখে এসে বলল: এখানে ব্যাপার একেবারে অন্যরকম।

কী রকম?

নৌকো এসে কিউয়ে দাঁড়িয়েছে, সব চুপচাপ।

বলিস কি?

বলে বাদলও দেখতে গেল। সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। অন্য জায়গার মতো চেঁচামেচি মারামারি গালাগালি নেই। জাহাজের ক্যাপ্টেন এখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্যত্র তাঁর সংহারমূর্তি দেখা গেছে ডিসিপ্লিন রক্ষার চেষ্টায়। নৌকোগুলোও ভাল, নতুন রঙ-করা চেহারা। একটার পর একটা নৌকো এসে দাঁড়াচ্ছে। যাত্রী ভরে গেলেই সরে যাচ্ছে নিচ থেকে। আর একখানা নৌকো এসে তার জায়গায় দাঁড়াচ্ছে। দূরে জাহাজঘাটাও দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত বাঁধানো পথ। এখানকার ব্যবস্থা দেখে সবচেয়ে বেশি খুশি হলেন নির্মাল্য মিশ্র। বললেন: দ্বীপে ভাল থাকবার জায়গা পেলে কয়েকটা দিন এখানে থেকেই যাব। বুঝলে বাদল, সুটকেশটা গুছিয়ে রেখে এসেছি, তুমি নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা কোরো। জাহাজ থেকে নেমেই এখানকার বিচ রিসর্টে যাব, ব্যবস্থা ভাল হলে রিজার্ভেশন করেই তোমাদের সঙ্গে ঘুরব।

বিন্দু বলল: আপনি তাহলে আমাদের সঙ্গে ফিরবেন না?

নির্মাল্য মিশ্র বললেন: না ভাই, এই সমুদ্রের ধারেই কয়েকটা দিন কাটাব ভেবেছি। তবে ফেরার পথে তোমাদের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

কেমন করে?

বলে বাদল তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেনঃ তোমরা তো কন্যাকুমারী যাবে, রামেশ্বরেও যাবে। আরও কয়েক জায়গা দেখে ম্যাড্রাস থেকে ফেরার ট্রেন ধরবে। হয়তো দেখবে যে, আমিও সেই ট্রেনে ফিরছি।

বিন্দু বলল ঃ আপনি না থাকলে কিছুই ভাল লাগবে না!

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ যা ভাবছ তা নয়। নতুন জায়গা দেখার আনন্দ কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

এক সময়ে তাঁরাও জাহাজ থেকে নামলেন। প্রথম নামবার ভয় ও ভাবনা অনেক কমে গিয়েছিল। এখানে একজন অপরকে নামতে সাহায্য করে, সাহস দেয়। নৌকোয় উঠেও আর তেমন ভয় করে না। নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ অন্য দ্বীপে তো কিছুই দেখিনি, এই দ্বীপটা ভাল করে দেখব— এখানকার লাইট হাউস, লেগুন, রেসের নৌকো, কাচ-লাগানো নৌকোয় চেপে সমুদ্রের নিচের প্রবাল দেখব। আর দেখব এখানকার মানুষজন, তাদের সুখদুঃখ, আর সুযোগ পেলে তাদের লাভা নাচ।

জাহাজের দিকে নজর রেখেছিলেন নির্মাল্য মিশ্র। বাদলও মুখ ঘুরিয়ে দেখছিল। কিছু দূরে যাবার পরে বাদল বলল ঃ ডাক্তারবাবুকে দেখতে পেলাম না।

সদানন্দবাবু বললেন ঃ তিনি বোধ হয় আগেই নেমে গেছেন।

বাদল চিন্তিতভাবে বলল ঃ তা মনে হয় না। আমাদের ওপরে বোধ হয় রেগে আছেন। রাগবারই কথা।

কেন?

এবারে আমরা তাঁর খোঁজখবরই নিচ্ছি না!

তিনি তো আমাদের দলে নেই! তিনি নিজেই এসেছেন আলাদাভাবে!

কিন্তু বাদলের মুখ দেখে মনে হল না যে সে কোন আশ্বাস পেয়ে এই কৈফিয়ত শুনে।

দ্বীপ দেখার সরকারী ব্যবস্থা আছে। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্রর জন্যে আগে ট্যুরিস্ট রিসর্টে যেতে হল। ব্যবস্থা পছন্দ হতেই তিনি পরের জাহাজ পর্যন্ত থাকবেন বলে ঘর রিজার্ভ করলেন। তারপর সবার সঙ্গে দ্বীপ দেখতে গেলেন।

দুপুরের আহার পাওয়া গেল সরকারী ব্যবস্থায়। জাহাজের সব যাত্রী এখানে একসঙ্গে আহার করবে। বাদল দেখল যে এখানেও ডাক্তারবাবু নেই। তিনি যে জাহাজ থেকে নামেননি, সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হল।

বলল ঃ ডাক্তারবাবুর অসুখ করেনি তো ? রাতে জাহাজ বেশ দুলেছিল। হয়তো বমি-টমি করে এখন শুয়ে আছেন তাঁর কেবিনে।

তারাপদর দিদি বললেন ঃ গিয়ে একবার দেখে এসো তাঁকে।

কিন্তু বাদল সভয়ে বলল ঃ না বাবা, বিপদ দুদিকেই।

কেন ?

জাহাজে ওঠা-নামাতেও বিপদ, বিপদ বাঘের মুখে গেলেও।

তারাপদর দিদি অভয় দিয়ে বললেন ঃ না ভাই হীরা বাঘ, দক্ষিণ রায় তোমাকে দেখলে খুশীই হবেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার হবার আগেই তারা জাহাজে ফিরে গেল। নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আমি ট্যুরিস্ট রিসর্টেই যাচ্ছি, আমার সুটকেশটা পাঠিয়ে দিও।

বাদল বলল ঃ কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে আপনার কাছে পেঁছিবে তো ?

বিন্দু বলল ঃ তুমি জাহাজে উঠো না, নৌকোতেই থেকো। আমি নির্মাল্যদির সুটকেশটা নামিয়ে দেব। তুমি তা পেঁছে দিয়ে ফিরে এসো।

সেই ভাল।

বলে নির্মাল্য মিশ্র ট্যুরিস্ট রিসর্টের দিকে চলে গেলেন, আর সবাই গেল জাহাজঘাটার দিকে।

বিন্দুর কথামতো বাদল যখন একটা লোকের মাথায় সুটকেশটা চাপিয়ে নির্মাল্য মিশ্রর কাছে এসে উপস্থিত হল, তখন তার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। ট্যুরিস্ট রিসর্টে নির্মাল্য মিশ্রর পাশে বসে আছেন ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র। প্রসন্ন তাঁর মুখ। সস্নেহে বাদলকে বললেন ঃ তোমরাও থেকে গেলে পারতে, বাদল। জায়গাটা ভারি সুন্দর।

বাদল কী উত্তর দেবে তা ভেবে পেল না।
